মা বলিয়া ডাক

শৈবাল মিত্র

পরিবেশক

দে বুক স্টোর্স
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

MA BOLIA DAAK

A Collection of Short Stotics

By Saibal Mitra.

প্রথম প্রকাশ

চৌঠা আগস্ট ১৯৪৭

প্রকাশক

মিনতি মুখোপাধ্যায়

কবিপত্র প্রকাশন

২২বি, প্রতাপাদিত্য রোড

কলকাতা-২৬

মুদ্রক

মিলি প্রেস

২৩, যুগলকিশোর দাস লেন

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ

সুবোধ দাশগুপ্ত

ছব্বিশ টাকা

জন্মদিনে সুদেষ্ণাকে

আমাব প্রথম গল্পসংকলন, আতর আলির রাজসজ্জা, ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হযেছিল। তারপব, গত ছ'বছরে নানা পত্রপত্রিকায় কযেক ডজন গল্প লিখেছি। গল্পের সেই বোঝা থেকে এই সংকলনেব আঠাবটি গল্প বাছাই করেছেন আমাব পুবোনো বন্ধু, অধ্যাপক মানস মজুমদার। মানসের সঙ্গে আমার সম্পব সাদামাঠা ধন্যবাদ, বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নয়।

এই সংকলনের ভোটাব বৈরাগীচবণ এবং আবহমান স্বদেশ, গল্পদুটি, শিলাদিত্য ও আজকাল শাবদসংখ্যায় যথাক্রমে হাডিকাঠ এবং ফেরাই নামে প্রকাশিত হয়েছিল। সংকলনে গ্রথিত গল্পগুলিতে প্রথম প্রকাশের কালানুক্রম রাখা সম্ভব হযনি।

শৈবাল মিত্র

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস

অজ্ঞাতবাস

আনন্দের দিন

দেওয়ালের লিখন

রসাতল

অগ্নির উপাখ্যান

হারাবার নেই

গল্পসংকলন

আতরআলির রাজসজ্জা

কিশোর উপন্যাস

ঋষিশৃঙ্গের সেই রাত

প্রবন্ধ সংকলন

বামপন্থার আত্মদর্শন ও অন্যান্য নিবন্ধ

অগ্নিশুদ্ধি

জগন্নাথবাবুকে পাকড়ে ঠিক সময়েই রেবন্ত শ্মশানে এসে ঢুকল। কাঠের চিতায় জগন্নাথবাবুরই সমবয়সী, বছর পঁয়ষট্টির এক মৃতদেহ ঘিরে সহস্রমুখ আগুনের তীক্ষ্ণ শিখাগুলো তখন লকলকিয়ে উঠছে। আগুন তখনো শবদেহ স্পর্শ করেনি। দু'তিনজন যুবক জ্বলন্ত পাটকাঠির গোছা নিয়ে চিতার চারপাশে গুঁজে গুঁজে দিচ্ছে। চিতা থেকে পাঁচ সাত হাত দূরে একজন বিবাহিতা মেয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে দুজন ছেলে, তাদেরও থমথমে মুখ, চোখভর্তি জল। এরা নিশ্চয়ই ওই মৃত মানুষটার ছেলেমেয়ে।

দুচোখে অস্বস্তি আর আশঙ্কা নিয়ে চিতায় শোয়ানো শবদেহটার দিকে তাকিয়ে জগন্নাথবাবু প্রশ্ন করল, কি ঝকমারি, আমাকে এখানে আনলেন কেন ?

রেবন্ত কোন জবাব দিল না। মৃত মানুষটার কপালে আঁকা চন্দনের নক্সা আর নাকের দুটো ফুটোয় লাগানো দুটো তুলসিপাতায় রেবন্তর দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল। চিতার আগুন ক্রমশ ঘন, গাঢ়, ক্ষুধার্ত, সর্বভুক হয়ে উঠছে। শবদেহটাকে সে আগুন এখনি ধীরে ধীরে গিলতে শুরু করবে।

এরকম একটা মোক্ষম মুহূর্তেই জগন্নাথবাবুকে নিয়ে রেবন্ত শ্মশানে আসতে চাইছিল। মামলাবাজ, ধূর্ত, বৈষয়িক বুড়োটা দেখুক যে জীবন এবং পৃথিবী কি অনিত্য, সাময়িক, পদ্মপাতায় জল, বিয়োগ বিচ্ছেদ কান্নায় ভারাক্রান্ত।

জগন্নাথবাবু আবার গলা খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি মুস্কিল, এই শেষবিকেলে আমাকে শ্মশানে ধরে আনলেন কেন ? প্রাইভেট কথা বলার এটাই কি উপযুক্ত জায়গা হল ?

রেবন্ত বলল, কথা বলার জন্যে এমন নিরিবিলি, শান্ত জায়গা কোথায় পাবেন ? এখানে কেউ কারো কথায় কান দেয় না, সাতে পাঁচে থাকে না।

রেবন্তর কথাটা জগন্নাথবাবুর ঠিক পছন্দ হলো না। গোমড়া মুখে জগন্নাথবাবু চিতার দিকে তাকিয়ে থাকল। চিতার মানুষটা এখন পুড়ছে। অজস্র আগুনের ফণা ফোঁসফোঁস করে জড়িয়ে ধরছে মৃত মানুষটাকে। অক্ষত, পরিপূর্ণ এক মানুষের এভাবে ধীরে ধীরে ছাই হয়ে যাওয়ার দৃশ্যটাই জগন্নাথ-বাবুকে দেখাতে চাইছিল রেবন্ত। অর্থগৃধ্নু, ঝাগড়াটে, গোঁয়ার এই মানুষটাকে শ্মশানে আনতে রেবন্তকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি।

আপনার কি বলার আছে বলুন, জগন্নাথ বলল রেবন্তকে।

বলছি, বলছি, রেবন্ত আশ্বস্ত করল জগন্নাথকে। তারপর একটা খালি বেঞ্চি দেখিয়ে বলল, চলুন, ওখানে গিয়ে বসি।

বেশ অনিচ্ছার সঙ্গেই খালি বেঞ্চিটায় রেবন্তর পাশে জগন্নাথ বসল। এই বেঞ্চিটা চিতার ঠিক মুখোমুখি। এখানে বসলে চিতার আগুনে মৃত মানুষটার তিলে তিলে নিঃশেষ হওয়া পরিষ্কার দেখা যায়। চিতা থেকে চোখ তুললে নজরে পড়ে একটা শীর্ণ নিমগাছের ওপাশে অস্তগামী সূর্যের রক্তাক্ত অবসান. কালচে লাল রঙে আকাশ ভেসে যাচ্ছে। আদিগঙ্গার ঘোলা জলে ছায়া ফেলেছে রক্তাক্ত আকাশ। জোলো, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে আদিগঙ্গা থেকে। হাওয়ায় চিতার আগুন মাথা ভেঙে লেপ্টে যাচ্ছে মাটির সঙ্গে। পরক্ষণেই আবার লাফিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শ্মশান জুড়ে এখন তিনটে চিতা জ্বলছে। চারপাশে যে কতো মানুষ কাঁদছে, তা গোনার উপায় নেই। দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে আছে বাতাস।

সাতদিন আগে নিকুঞ্জর বাবাকে শেষরাতে এখানে পোড়াতে এসে রেবন্ত প্রায় একই ছবি দেখেছিল। নিকুঞ্জ আর তার ছোট ভাই মৃত বাবার জলন্ত চিতার পাশে দাঁড়িয়ে হাউহাউ করে কাঁদছিল। আরো জোরালো বাতাস বইছিল সেদিন। কি এক হাহাকার ধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে উঠছিল অন্ধকার। দু'তিন ঘণ্টার মধ্যেই নিকুঞ্জর অমন দশাসই চেহারার তেজী বাবা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এক উদাসীন, ধারালো কষ্টে বোবা হয়ে গিয়েছিল রেবন্ত। নিজেকে বড়ো তুচ্ছ, অসহায় মনে হয়েছিল তার। এই তো মানবজীবন, এই তো তার অহংকার, বড়ো পলকা, খেলো, একমুঠো ছাই ছাড়া আর কিছুই নয়। এক উদ্গত প্রবল কান্নায় তার গোটা অস্তিত্ব ফুলে ফুলে উঠছিল। সেই ভোর রাতে শ্মশানের এই বেঞ্চিতে বসেই রেবন্ত ঠিক করেছিল যে, আজ আর সে কোর্টে হাজিরা দিতে যাবে না। সেদিন দুপুরেই আলিপুরের সেকেণ্ড মুন্সেফের এজলাসে জগন্নাথবাবুর সঙ্গে তার মামলার শুনানি ছিল। ভাড়াটে রেবন্তর বিরুদ্ধে বাড়ীঅলা জগন্নাথবাবুই এই উচ্ছেদের মামলা রুজু করেছিল। রেবন্তর মতো স্বল্প ভাড়ার ভাড়াটেকে জগন্নাথবাবুর পছন্দ নয়। অথচ সাতবছর আগে রেবন্ত যখন ওই দু'কামরার ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছিল, তখন ভাড়া বাবদ তিনশো টাকা দেওয়ার কথা জগন্নাথবাবুই বলেছিল। ইতিমধ্যে বাজার দর বেড়েছে। বাড়িভাড়াও সে অনুপাতে বাড়া উচিত। ভাড়া বাড়াতে রেবন্তও রাজী। কিন্তু জগন্নাথবাবুর এক গোঁ, রেবন্তকে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে হবে।

বছর তিনেক আগে উচ্ছেদের মামলা তখন সবে শুরু হয়েছে, একদিন আদালত থেকে বেরিয়ে জগন্নাথবাবুকে রেবন্ত জিজ্ঞেস করেছিল, কত টাকা ভাড়া পেলে আপনি খুশি হবেন?

রেবন্তর প্রশ্নটা প্রায় অগ্রাহ্য করেই জগন্নাথ চলে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় দফায়,

জগন্নাথের প্রায় পথ আটকে রেবন্ত প্রশ্নটা করতে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে জগন্নাথ বলেছিল, আটশো টাকা ভাড়া, দশ হাজার সেলামি। দিতে পারবেন?

জগন্নাথের জবাবে রেবন্ত স্তব্ধ, নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। হনহন করে কিছুটা হেঁটে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে জগন্নাথ আবার চড়া গলায় বলল, হাজার টাকা ভাড়া দিলেও তোমাকে ফ্ল্যাট দেবো না। তোমাকে উৎখাত না করা পর্যন্ত আ মার শান্তি নেই।

এতো রূঢ়, অভদ্র ব্যবহার জগন্নাথবাবু আগে কখনো করেনি। রেবন্তকে তুমি সম্বোধনও জগন্নাথবাবু সেই প্রথম করেছিল।

সামনের চিতায় ফটাস ফট শব্দ করে একটা কাঠ ফাটতে জগন্নাথবাবু চমকে উঠল। নিজের ত্রস্ত ভাবটা নিমেষে কাটিয়ে রুক্ষ গলায় বলল, আপনার কি বলার আছে, চটপট বলুন। আমার হাতে বিশেষ সময় নেই।

রেবন্তর মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল। পৃথিবীতে মানুষের সময় খুব কম এটা সে জানে এবং জানে বলেই মামলা, মোকদ্দমা এবং ঝগড়ায় সে সময় নষ্ট করতে চায় না। কিন্তু এই কথাটা সে জগন্নাথবাবুকে বলল না। খুব শান্ত গলায় সে প্রশ্ন করল আচ্ছা, আপনি কখনও কাউকে শ্মশানে দাহ করতে এসেছেন?

রেবন্তর প্রশ্নে জগন্নাথবাবু কেমন সিঁটিয়ে গেল। ফ্যাকাসে মুখে বলল, ভর সন্ধ্যেবেলায় শ্মশানে ডেকে এনে এসব প্রশ্ন করার মানে কী?

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, রেবন্ত বলল, একজন বন্ধু বা নিকট-আত্মীয়কে চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখে আপনার কেমন লাগছিল? তখন আপনি কী ভাবছিলেন?

বাইরে রুক্ষ, অভদ্র আচরণ করলেও জগন্নাথবাবু যে ভেতরে ভেতরে চঞ্চল, বিহ্বল হয়ে পড়ছে, মানুষটার দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে রেবন্ত সেটা বুঝতে পারে। চিতার ওপর মোমের পুতুলের মতো গলতে থাকা শরীরটার দিকে জগন্নাথের নজর স্থির হয়ে আছে। মৃত লোকটার নাক, কান, চোখ মুছে গিয়ে গনগনে আগুনের মধ্যে তার মুণ্ডুটা ছাল ছাড়ানো একটা নারকোলের মতো মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে।

পূর্বদিকের চিতার পাশে একটা নারীকণ্ঠ 'বাবাগো তুমি কোথায় গেলে' বলে আর্তস্বরে ডুকরে উঠল। জগন্নাথবাবুর সারা শরীর শিউরে ওঠে।

ভীত গলায় জগন্নাথ বলল, আমায় যেতে দিন রেবন্তবাবু। কথাটা বলেও কিন্তু জগন্নাথ উঠল না।

আপনার বাবাকে কোথায় দাহ করা হয়েছিল? আর আপনার মাকে, রেবন্ত প্রশ্ন করল।

এখানে, এই ক্যাওড়াতলা মহাশ্মশানে, বিড়বিড় করল জগন্নাথ।

আপনি কি কখনো ভেবেছিলেন যে, আপনার বাবা মা একদিন মারা যাবে?

না, আমার ধারণা ছিল, বাবারা অমর, তাঁরা মরেন না।

কি আশ্চর্য! তবু তাঁরা মারা গেলেন। সব মানুষকেই মরতে হয়। আমরাও একদিন মরে যাবো।

রেবন্তের কথাগুলো কানে গেলেও জগন্নাথবাবু কোন জবাব দিল না। বিস্ফারিত চোখে জগন্নাথবাবু তখন চিতার দিকে তাকিয়ে আছে। চিতার বাইরে বেরিয়ে থাকা শবদেহের পা দুটোয় বাঁশ পিটিয়ে একজন শ্মশানযাত্রী আগুনের ভেতরে ঢোকাবার চেষ্টা করছে। দৃশ্যটা দেখে রেবন্তরও কথা বন্ধ হয়ে গেল। পূবদিকের চিতার পাশে দাঁড়ানো দুজন শবযাত্রীর সঙ্গে কাঠওলাদের ঝগড়া বেঁধেছে। ভেজা কাঠে তৈরী তাদের চিতা বারবার নিভে যাচ্ছে। ধোঁয়াও বেরোচ্ছে প্রচুর। কে একজন মন্তব্য করল, শালা, মরেও আরাম নেই। এক বাণ্ডিল শুকনো কাঠ, একটু খাঁটি গাওয়া ঘি পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

জগন্নাথবাবুর দিকে তাকিয়ে রেবন্ত বলল, আপনার কাছ থেকেই শুনেছি যে, আপনার বাবা খুব পরিশ্রমী, কর্মী মানুষ ছিলেন। নিজের অর্থ, সম্পদ, ভাগ্য তিনি নিজের হাতে গড়েছিলেন।

ঠিক তাই। কলকাতা শহরে তিনটে বাড়ি, জমিজমা, ব্যবসা সব তাঁর নিজের হাতে তৈরী।

অথচ এই অর্থ, সম্পদ কিছুই তিনি ভোগ করতে পারলেন না। খাওয়ায়, পোশাকে কি কৃচ্ছ্রসাধনই না তিনি সারাজীবন করে গেলেন!

রেবন্তর কথায় মৌন জগন্নাথবাবুর মুখটা বড়ো, উদাস, আর করুণ হয়ে উঠল।

জগন্নাথের কাছ থেকে শোনা কথাগুলোই রেবন্ত বলে চলল, অসংখ্য মামলা আর দুশ্চিন্তায় সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক একেবারে জেরবার হয়ে গিয়েছিলেন। নিজের দিকে তাকাবার সময় পান নি। ভেবেছিলেন যে, অনন্তকাল তিনি বেঁচে থাকবেন আর মামলা লড়ে যাবেন। কিন্তু সেটা হলো না। হঠাৎ একদিন দুম করে মারা গেলেন! অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক মৃত্যু।

সামনের চিতায় তরল আগুনের ঘন স্রোতে শবদেহটা ডুবে যাচ্ছে। হঠাৎ ঝাপটা হাওয়ায় এলোমেলো আগুনের মধ্যে দগ্ধ শরীরটা সামান্য দেখা গেল। জ্বলন্ত কাঠের মধ্যে মৃতদেহটাও যেন একটা পোড়া কাঠ। ক্রমশ কালো হয়ে উঠছে। অঙ্গার আর মানুষ আলাদা করে চেনা কঠিন।

শূন্য গলায় জগন্নাথবাবু বলে, বাবার কথা ভাবলে আজও আমার মন খারাপ হয়ে যায়। সব থাকতেও ইহজীবনে বাবার একটু ভালো খাওয়া,

ভালো পরা হলো না। অথচ আমরা ভাইবোনেরা চাইতুম, বাবা একটু ভোগ করুক, বিলাসের মধ্যে থাকুক।

এসব জিনিস বোধহয় বলে করানো যায় না, রেবন্ত বলল, একজন মানুষ কী ভাবে বাঁচবে সেটা তার ব্যক্তিগত রুচি আর ইচ্ছের ব্যাপার।

রেবন্তর কথায় জগন্নাথবাবু কোন মন্তব্য করল না।

আপনিও তো প্রায় আপনার বাবার মতো জীবন কাটাচ্ছেন, রেবন্ত এবার সরাসরি জগন্নাথকে বিদ্ধ করল, ব্যক্তিগত সাধ-আহ্লাদ নিয়ে আপনিও ভাবেন না। খাওয়া পরায় আপনারও কার্পণ্যের শেষ নেই। একডজন মামলা আর অসংখ্য ঝামেলার নেশায় আপনি বুঁদ হয়ে আছেন। মাথার মধ্যে রাশিরাশি উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা পুরে রেখে আপনি কী আরাম পান?

সামনের চিতা এখন পূর্ণশক্তিতে জ্বলছে। চিতার চারপাশ থেকে মানুষ-জন সরে গেছে। আগুনের নগ্ন, বাদামি কেশর থেকে ঠিকরে আসা আলো জগন্নাথের মুখের ওপর আঁকিবুকি কাটছে। জগন্নাথ নিস্পন্দ, যেন সমাধি ঘটেছে তার।

আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি, গাঢ় গলায় রেবন্ত প্রশ্ন করল, আমার স্ত্রী এবং ছেলেরই বা কি অপরাধ, কেন আপনারা সপরিবারে আমাদের নির্যাতন করছেন? আপনার দুই মেয়ে মেরে আমার স্ত্রীর হাত কেন ভেঙে দিল?

নিজের অপমান আর লাঞ্ছনার কথা বলতে গিয়ে নিদারুণ কষ্টে রেবন্তর গলা প্রায় বুজে আসে। আবছা অন্ধকারে ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছে চারপাশ। শ্মশানের আলোগুলো এখনো জ্বলে নি। রেবন্ত বুঝতে পারে যে বেঞ্চি থেকে ওঠার জন্যে জগন্নাথ ছটফট করছে। কিন্তু উঠতে পারছে না। চিতার আগুন, জন্ম মৃত্যু, মহাকালের প্রতীক এই জ্বলন্ত বহ্নিশিখার টানে মুগ্ধ পতঙ্গের মতো জগন্নাথ নিশ্চল, মৌন হয়ে বসে আছে।

রেবন্ত বলল, গত তিনবছর গৃহচ্যুত, আশ্রয়হীন হওয়ার দুর্ভাবনা আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে, আমার দিন রাত্রি অবসরকে তছনছ করে দিয়েছে। কিন্তু এখানে এলে আমার আর কোন ভয় থাকে না। মানুষের চরম পরিণতি, শেষ আশ্রয়ের হদিশ পেয়ে যাই। আমার ভয়, দুর্ভাবনা কেটে যায়।

কথা শেষ করে রেবন্ত জিজ্ঞেস করল, আপনার কিছু মনে হয় না?

বিমূঢ়, বিচলিত জগন্নাথ শুকনো গলায় বলল, কি আবার মনে হবে।

কিছু মনে হয় না, খুব ব্যাকুল গলায় রেবন্ত প্রশ্ন করল, আপনার মনে হয় না যে এতো মামলা, এতো ঝামেলা, আপনার মৃত্যুতেই শেষ হয়ে যাবে? আপনার আরব্ধ কাজের ভার কেউ নেবে না, আর নিলে তারাও কষ্ট পাবে? আপনার যাবতীয় নথিপত্র যদি পোকায় না খায় তো সেগুলো আপনার সন্তানসন্ততিদের খেয়ে ফেলবে?

ফ্যালফ্যাল করে জগন্নাথবাবু তাকিয়ে থাকে রেবন্তের দিকে।

রেবন্ত তখনো প্রশ্ন করছে, আপনার নিজের জন্যে করুণা হয় না? নানা বাজে কাজে মত্ত থেকে নিজেকে অবহেলা করার জন্যে আপনার কষ্ট হয় না, কান্না পায় না?

প্রশ্নগুলো শেষ করে রেবন্ত নিজেই হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে। দু'চোখের জলে তার মুখ, চিবুক ভেসে যায়।

যন্ত্রণারুদ্ধ স্বরে জগন্নাথ বলে, চুপ করুন, চুপ করুন রেবন্তবাবু। আমি সংসারী মানুষ, আমার চালচলন সেইরকম। আমার মাথাটা গুলিয়ে দেবেন না। ব্যক্তিগত সুখ আর আনন্দের কথা ভাবতে গেলে আমি শেষ হয়ে যাবো।

জলন্ত চিতার মধ্যে মৃত মানুষটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। গনগনে চুল্লিতে শুধু তালতাল জমাট আগুন। আগুনের আভায় লাল হয়ে আছে চারপাশ। সদ্য জ্বলে ওঠা ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলোকে এই মহাশ্মশানে বড়ো ম্লান, মিটমিটে জোনাকির আলো বলে মনে হয়। গোটা তিনেক শবদেহ চিতা খালি হওয়ার অপেক্ষায় সামনের চাতালে শুয়ে আছে।

দুচোখ মুছে থমথমে গম্ভীর মুখে রেবন্ত কি যেন ভাবছে। শান্ত, ধীর গলায় জগন্নাথবাবু প্রশ্ন করল, আপনি কি আমার সঙ্গে মামলা লড়তে চান না?

না, আর প্রয়োজন নেই।

কেন?

আগামী মাসেই নতুন ফ্ল্যাটে চলে যাচ্ছি। এ্যাডভান্সের টাকা দিয়ে এসেছি।

সে কী, হতচকিত জগন্নাথ প্রশ্ন করল।

জগন্নাথের প্রশ্ন রেবন্তের কানে ঢোকে না। নীচু গলায় সে বলে, শুধু একটা অনুরোধ, আপনার আগে যদি আমি মারা যাই, তাহলে দয়া করে আমার মৃতদেহের সঙ্গে আপনি শ্মশান পর্যন্ত আসবেন। এই বেঞ্চিতে বসে চিতার দিকে তাকিয়ে আমাদের সাত বছরের সম্পর্কের কথা, সুখ, দুঃখ, মামলা, মনোমালিন্যের কথা একটু ভাববেন।

জগন্নাথবাবুর দুচোখের দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে হয়ে গিয়ে লম্বা ঘাড়টা কাঁধের মধ্যে ঢুকে গেছে। আতঙ্কে কঁকিয়ে উঠে জগন্নাথ বলে, বলবেন না, ওসব কথা বলবেন না। বয়সে আমার চেয়ে আপনি ঢের ছোট, আমার আগে আপনি কেন মারা যাবেন?

জগন্নাথবাবু হঠাৎ বলে বসল, তাছাড়া আমার বাড়ি ছেড়েই বা আপনি.... বলতে গিয়েও জগন্নাথ থেমে গেল। রেবন্ত অবাক হয়ে চোখ তুলে তার দিকে তাকাল। রেবন্ত বলল, না, আপনার ওপর কোন রাগ বা অভিমান নিয়ে আমি যাচ্ছি না।

শ্মশানের বুকে গভীর নীরবতা নেমেছে। সামনের চিতাটা প্রায় নিভুনিভু। রাশিরাশি কাঠকয়লার স্তূপের মধ্যে শুধু চিতার মাথাটা ধিকিধিকি জ্বলছে। শুকনো, জলহীন চোখে জগন্নাথ মাঝে মাঝে হিক্কা তুলছে। বড়ো অদ্ভুত, কষ্টকর আওয়াজ। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায় যে, মানুষটা কাঁদছে। এটাই হয়তো ওর কান্নার ধরন, অথবা অনেককাল না কাঁদার ফলে মানুষটা কাঁদতে ভুলে গেছে। রেবন্তর দুচোখ দিয়ে ফের জল পড়ছিল। পাতলা, নরম ছালে ঢাকা একটা টসটসে জলফোসকার মতো তার অস্তিত্ব বড়ো করুণ, বড়ো আর্দ্র হয়ে ওঠে। স্পর্শ করলেই যেন গলে যাবে।

পৃথিবীতে রাত বাড়ে, অন্ধকার গভীর হয়। একসময় রেবন্ত ভাবে, বয়স্ক মানুষটাকে নিয়ে এখন বাড়ি ফেরা উচিত। শ্মশানের বাইরে কোথাও বসে প্রথমে দু'জনে দু'পেয়ালা চা খাবে। চা খাওয়ার পর একটু সুস্থ, তাজা, তেজী হয়ে জগন্নাথবাবু হয়তো আবার ধূর্ত, বৈষয়িক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করবে, কবে ছাড়ছেন ফ্ল্যাটটা ?

তা করুক। মানুষ তো এরকমই করে। শ্মশানবৈরাগ্য নিয়ে বাস্তব, জীবন্ত পৃথিবীতে বাঁচার চেষ্টা করলে সব মানুষই যে মরে ভূত হয়ে যাবে। গোটা পৃথিবীটাকেই তখন শ্মশান বলে মনে হবে। তবু চিতার আগুনের সামনে বসে এই শক্ত, ধুরন্ধর মানুষটা যে কিছুক্ষণ কেঁদেছিল, মহৎ, উদার হয়ে উঠেছিল, এটাও তো কম কথা নয়॥

———

ভোটার বৈরাগীচরণ

হেই বাপ, তোরা আমায় লুচি বোঁদে খাওয়াবি তো ?

শ্লেষ্মা জড়ানো, খনা গলায় ডুলিতে বসা বুড়োটার এই প্রশ্নে ডুলির দুই বেহারা বা সঙ্গী ছেলেরা, কেউ কোন জবাব দিল না। জবাব দিয়ে কোন লাভ নেই। কেননা ইতিমধ্যে বার চারেক বুড়ো এই প্রশ্ন করেছে। প্রতিবার ছেলেরা জবাব দিয়েছে। মলিন একবার বলল, শুধু লুচি, বোঁদে নয়, বরাত ভালো থাকলে আলুর দমও জুটে যেতে পারে।

শুনে লোভা বুড়ো মহাখুশি। নোলায় চলকে ওঠা জল গলায় টেনে নিয়ে বলেছিল, আহা, লুচি বোঁদে, কতকাল যে খাইনি রে বাপ !

কিন্তু ব্যস, এই পর্যন্ত। একটু পরেই সব কথা ভুলে গিয়ে বুড়ো আবার প্রশ্ন করে, হেই বাপ, লুচি বোঁদে খাওয়াবি তো ?

ছেলেরা এখন চুপচাপ। তারা বুঝেছে, লোভ বা অবিশ্বাস নয়, বুড়োটা আসলে স্মৃতিভ্রংশ, শোনার কিছু পরেই ভুলে যাচ্ছে সব কথা।

জ্যৈষ্ঠের মধ্য দুপুরে খাঁ খাঁ উদোম মাঠ আগুনের হল্কা ছাড়ছে। সূর্য ঠিক মাঝ আকাশে। নির্জন বিশাল প্রান্তরে একজন মানুষ নেই, গরু, ছাগল, পাখি নেই, গাছ নেই, গাছের ছায়া নেই, শুধু দু-একটা হাড় জিরজিরে বাবলা গাছ ইতস্তত দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাদের ছায়া পড়ে না, ছায়ারা মরে গেছে।

ঘোষাল বাড়ির গৃহকর্তা, সাতষট্টি বছরের বৃদ্ধ ভোটার ফণীভূষণ ঘোষালকে আনার জন্য একটা ডুলি নিয়ে কাঞ্চন আর মলিন বেলা এগারোটা নাগাদ সাঁজুয়াতে এসেছিল। ঘোষাল বাড়ি গিয়ে শুনল, ফণীবাবু অন্য একটা ডুলিতে দশটার আগেই ভোট-কেন্দ্রের দিকে রওনা হয়েছেন। খবরটা শুনে দুজনেই হতাশ হয়েছিল। ফণীবাবু তাদের বাঁধা ভোটার। সাতসকালে কাদের ডুলিতে চেপে ফণীবাবু হাতছাড়া হয়ে গেল, সেটা মলিন বা কাঞ্চন, কেউই বুঝতে পারল না। খালি ডুলি নিয়ে ফেরার পথে গাঁয়ের এক বাড়ির দাওয়ায় হাত-পা গুঁজে বসে থাকা বুড়োটাকে ওরা ডুলিতে তুলে নিয়েছে। ভোটার তালিকায় বুড়োর নামটাও মলিন খুঁজে বার করল। বৈরাগীচরণ দাস, বয়স সাতানব্বই, বাবার নাম, শ্রীনিবাস দাস।

কাঞ্চন হিসেব কষে বলল, পাঁচ বছর আগে এই লিস্ট তৈরী হয়েছিল, এখন এর বয়েস একশো দুয়ের কম নয়।

আগুনে ঝলসানো আলপথ দিয়ে ডুলি চলেছে। দুই বেহারার গলায় মৃদু

গুঞ্জন। ডুলির মধ্যে বসে চোখ পিটপিট করে বৈরাগীচরণ চারপাশ দেখছে। হঠাৎ বৈরাগীচরণ বলল, আমি মুতবো।

তার ভাঙা গলার জড়ানো কথা কেউ শুনতে পেল না। বুড়ো এবার সামান্য গলা তুলে ফের বলল, হেই বাবারা, আমি মুতবো।

কাঞ্চন বলল, ভালো বিপদ হলো দেখি।

মলিন বলল, কোনো উপায় নেই, ভোটার বলে কথা।

মাঠের মাঝখানে বেহারারা ডুলি নামাল। কাঞ্চন আর মলিন হাত লাগিয়ে বুড়োকে তুলতেই পাশে দাঁড়ানো একজন বেহারা চেঁচিয়ে উঠল, শালার বুড়ো, ডুলির ভেতরেই কম্ম সেরে রেখেছে।

ডুলিতে বিছোনো ভিজে খড়ের দিকে তাকিয়ে দুই বেহারা তারপর অকথ্য গালাগাল শুরু করল।

বৈরাগীচরণ নির্বিকার, উদাসীন, কোন কথাই যেন সে শুনতে পাচ্ছে না।

এক বেহারা বলল, শালা ঘাটের মড়া।

অন্যজন বলল, শালার ভীমরতি ধরেছে।

তারপর দুই বেহারা প্রচুর আপশোস করতে লাগল। আজ রাতে একটা বিয়ে বাড়ির বায়না আছে। বর নিয়ে তিন ক্রোশ দূরে নাদাভাঙায় যাওয়ার কথা। মোটবমান বর। তা হোক, তবু তাদের পয়সা আছে। ভালো ভাড়ার সঙ্গে কিছু বকশিসও মিলবে। অলক্ষুণে বুড়োটা সব ভাসিয়ে দিল।

একটু দেরিতে হলেও নিজের অপকর্মের কথা বৈরাগীচরণ বুঝতে পেরেছে। বুঝে লজ্জা এবং ভয়ে সে কাঁপছে। খানিকটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গীতে সে বলল, এই আমার দোষ, গত দু কুড়ি বছর আমার শরীরে সাড় নাই। কোথা থেকে যে কী হয়ে যায়, টের পাই না।

রোগটা কী, মলিন প্রশ্ন করল।

রোগ কিছু নাই। তখন ডাবের কারবার ছিল, ডাব বেচতাম। এইরকম ঝাঝা দুপুরে একদিন ডাব গাছের মাথা থেকে পড়ে গেলাম।

হঠাৎ পড়ে গেলে?

হঠাৎ নয় রে বাপ। ডাব গাছের মাথায় বসে অনেক দূরে বিড়লাপুরের চটকলের চোঙা দেখতে দেখতে মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। ব্যস! তারপর আর মনে নাই। কী কষ্ট যে পেয়েছিলাম, পা দুটো পেটের ভেতরে সেঁধিয়ে গিয়েছিল।

বলিরেখা জড়ানো ঝোলা চামড়ায় ঢাকা বৈরাগীচরণের মুখে অবশ্য আজ কোন যন্ত্রণা বা সঙ্কোচের অভিব্যক্তি জাগল না। করুণ গলায় বুড়োটা হঠাৎ প্রশ্ন করল, হেই বাবারা! আমাকে মাঠে ফেলে দিয়ে যাবি না তো?

কাঞ্চন আর মলিন তার প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। দুই বেহারা বৈরাগীচরণকে আর ডুলিতে তুলতে রাজী নয়। এই ঝকমারির কাজ ছেড়ে তারা তখনই চলে যেতে চায়। কাঞ্চন আর মলিন অনেক বোঝাল তাদের। এক পণ নতুন খড়ের দাম আর বাড়তি দু'টাকা বকশিষের লোভে শেষ পর্যন্ত তারা ডুলি তুলল।

দাঁতে দাঁত টিপে কাঞ্চন ভাবল, মুচিশায় পৌছে তোমাদের মজা দেখাবো। হুম না, হুম না শব্দ তুলে তপ্ত ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে ডুলি আবার এগিয়ে চলল। কয়েক আঁটি ভিজে খড় শুকনো মাঠে পড়ে রইল। পায়ের নিচে উঁচু নীচু উষ্ণ মাটি, বড়ো রুক্ষ আর কঠিন, ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল, কাঞ্চন আর মলিন লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। দুই যুবকের শব্দহীন, গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাব জমাবার জন্যে বুড়ো বৈরাগীচরণ আবার কথাটা পাড়ল। জিজ্ঞেস করল, মুড়ি আর বোঁদে আমাকে খাওয়াবি তো?

নিশ্চয়ই। কথা যখন দিয়েছি খাওয়াতেই হবে।

মলিনের জবাব শুনে বুড়োটা ভারী খুশি হলো। তারপর শুরু হলো তার একটানা বকবকানি। প্রশ্ন করল, ভোট কী বাপ?

মলিন বলল, ভোট একটা গণতান্ত্রিক অধিকার। কারা দেশ শাসন করবে, সেটা তুমি ঠিক করে দেবে।

মলিনের কথায় বুড়োটা কী বুঝল কে জানে। নিজের মনে সে বিড়বিড় করল, তা বেশ, তা বেশ।

তুমি কখনো ভোট দাওনি?

না বাপ, দু' কুড়ি সন হলো, পঙ্গু হয়ে আছি। মাজা ভেঙে দুটো পা পড়ে গেছে। পাছা ঘষে ঘষে ঘর বার করি, পুকুরে যাই। কে আমাকে অদ্দূরে নে যাবে?

তোমার বাড়ীর লোকজন কোথায়?

তারা গেছে তোমাদের ঐ ভোট দিতে।

মলিন আর কথা বাড়াল না। গরমে, রোদে তার শরীর আইঢাই করছে। ডুলির সঙ্গে তাল রেখে এই বেয়াড়া রাস্তায় হাঁটা মুশকিল।

বৈরাগীচরণ কিন্তু বকে চলল, রোজ কোন কাকভোরে দারুণ ক্ষিধেতে ঘুম ভেঙে যায়। তারপর চাট্টি মুড়ি আর একটু জল চেয়ে চেয়ে মুখের ফেকো বেরিয়ে আসে। কেউ কান দেয় না। অথচ বাড়ি ভর্তি লোক, তিন ছেলে, তাদের বউ, নাতি-নাতনী, নাতবউ। কিন্তু এই বুড়োটাকে দেখার কেউ নেই।

মলিনের কানে কানে কাঞ্চন বলল, ভোট দিতে গিয়ে বুড়োটা ডোবাবে দেখছি!

মলিন কোন কথা বলল না ।

বুড়োটার স্মৃতি আর একবার ঝালিয়ে নেওয়ার জন্যে কাঞ্চন প্রশ্ন করল, তোমার নাম কী ?

বৈরাগীচরণ দাস ।

বাপের নাম কী ?

প্রশ্নটা শুনে বুড়ো বৈরাগীচরণ সত্যি অথৈ জলে পড়ল। তার কপালের লোল চামড়া আরো কুঁচকে গেল। একটা অতি পরিচিত নাম মনে করার জন্যে ঘোলাটে, শূন্য চোখে দিকচিহ্নহীন দিগন্তের দিকে সে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু কিছুতেই বাবার নামটা তার মনে এলো না।

মনে করো, মলিন বলল।

দারুণ চটে গিয়ে কাঞ্চন বলল, তোমার বাবার নাম খগেন।

কাঞ্চনের কথা বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে অবাক বৈরাগীচরণ তাকিয়ে থাকে।

শ্রীনিবাস দাস।

মলিন নামটা বলে দিতেই শিশুর মতো আহ্লাদে ঘাড় নেড়ে বুড়ো বলল, ঠিক, ঠিক।

কোন ছবিতে ছাপ দেবে, কাঞ্চন প্রশ্ন করল।

বৈরাগীচরণ আবার বিপদে পড়ল। সাতপাঁচ চিন্তায় দিশাহারা হয়ে গেল তার দু চোখের দৃষ্টি।

ধান জমি ছেড়ে ডুলি উঠছে উঁচু ডাঙ্গা জমিতে। বৈরাগীচরণ পেছনে বেঁকে ডুলির মধ্যে প্রায় শুয়ে পড়েছে। এই উঁচু জমিতে কিছু ছোট বড় গাছ এবং গাছের তলায় সামান্য ছায়া আছে। একটা তালগাছের কালো শরীরে সাদা রঙে আঁকা একটা প্রতীক চিহ্নের সামনে ডুলিটা থামিয়ে মলিন প্রশ্ন করল, এটা কিসের ছবি ?

নিমেষে বৈরাগীচরণের স্মৃতি সজাগ হয়ে উঠল। ফোকলা মুখে মস্ত হাসি ছড়িয়ে সে বিড়বিড় করল, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে।

দারুণ বিরক্তিতে তেতো গলায় কাঞ্চন মন্তব্য করল, ঘোড়ার ডিম, বুড়োটা ডোবাবে।

কাঞ্চন আর মলিনকে ছেড়ে ডুলিটা সামান্য এগিয়ে গেছে। দুই বন্ধু এখন তাদের দলের প্রার্থীর সাফল্য নিয়ে আলোচনা করছে। তাদের পার্টি যে জিতবেই এ বিষয়ে তারা নিঃসন্দেহ। ভোটের ফারাক নিয়েই দুজনের হিসেবে কিছু তফাৎ হচ্ছে। কাল সারারাত দুজনের ঘুম হয়নি। তার ওপর সেই ভোর থেকেই ছুটোছুটি শুরু হয়েছে। দূর, দুর্গম সব গাঁয়ের অচল, অক্ষম, পঙ্গু ভোটদাতাদের ভোটকেন্দ্রে জড়ো করার দায়িত্ব ওদের দুজনের ওপর

পড়েছে। সংখ্যায় এই ভোট খুব বেশী নয়। তাই অধিকাংশ দলই এগুলো নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। তাই এই বাণ্ডিল, অকেজো ভোটগুলোও খুব মূল্যবান হয়ে উঠেছে। ভোর থেকে এরকম প্রায় ত্রিশজন উপেক্ষিত, হিসেব বহির্ভূত ভোটারকে মলিন আর কাঞ্চন ভোটকেন্দ্রে হাজির করেছে। নিদারুণ ব্যস্ততার জন্যেই ফণী ঘোষালের বাড়িতে যেতে তাদের একটু দেরী হয়েছিল। ফলে ফণী ঘোষালের বদলে জুটেছে বুড়ো বৈরাগীচরণ। এই বুড়োটাকে মুচিশার ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে এখনি আবার দুজনকে দু'তল্লাটে ছুটতে হবে। ডুলি নিয়ে কাঞ্চন যাবে চকমানিক, আর ভ্যান রিক্সা নিয়ে মলিন যাবে বাওয়ালি।

গভীর আরাম অথবা ক্লান্তিতে দু চোখ বুজে বৈরাগীচরণ মেজাজে ঢুলছে। ডাঙ্গা জমি ছেড়ে ডুলি আবার নীচু মাঠের আলপথ ধরেছে। বাঁ পাশের ভাগাড়ে একটা মৃত গরুকে ঘিরে এক দঙ্গল শকুন ভোজসভা বসিয়েছে। রুক্ষ, তৃণহীন, ধুধু প্রান্তরের মধ্যে ভাগাড়ের এই টুকরো জমিটাই সবুজ ঘাসে ঢাকা। ঝাঁকড়া একটা অশ্বত্থ গাছে কিছু পাতা আছে। অশ্বত্থের পাশে দুটো ঢ্যাঙ্গা শিমুল গাছে পাতা না থাকলেও কয়েকটা লাল ফুল ফেটে সাদা তুলো বেরিয়ে পড়েছে। শিমুলের মগডালে তীক্ষ্ণ গলায় একটা শকুনছানা ককিয়ে উঠতে বৈরাগীচরণের তন্দ্রা ছুটে গেল। চোখ পিটপিট করে চারপাশ দেখে সে বুঝতে চাইল, ব্যাপারটা কী, তারপর প্রশ্ন করল, হেই বাপ, আমাকে মুড়ি আর বোঁদে খাওয়াবি তো?

মলিন কোন সাড়া করল না। জামার পকেট থেকে ময়লা রুমাল বার করে কাঞ্চন কপালের ঘাম মুছল। মেঠো পথে এখন দু-চারজন মানুষ দেখা যাচ্ছে। ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরছে তারা। ডুলির মধ্যে বৈরাগীচরণের কাত হয়ে বসে থাকার ভঙ্গী দেখে পথচলতি একজন প্রশ্ন করল, ও দাদু, কোথায় চললে গো? প্রশ্নকর্তার সঙ্গী আর এক রসিক জবাব দিল, বিয়ে করতে।

কাদের কুলের মেয়ে গো?

প্রশ্ন শুনে বৈরাগীচরণ ফিকফিকিয়ে হাসল।

মাঠ, প্রান্তর ছেড়ে ডুলি এখন লোকালয় ধরেছে। এখানেও মাটির রাস্তা। কিন্তু এ রাস্তায় মানুষজন আছে। ভেঁপু বাজিয়ে, ধুলো উড়িয়ে দুরন্ত গতিতে যাতায়াত করছে সাইকেল রিক্সা। মাটির পথ যেখানে খোয়া বাঁধানো সড়কে মিশেছে, সেই মোড়ে হোগলার ছাউনির তলায় একটাতে মিষ্টির দোকান বসেছে। একটা কাঠের বারকোসে ডাঁই করা জিলিপি, আর একটাতে বোঁদের স্তূপ। দুটো বারকোসের ওপর ভনভন করছে সবুজ ডুমো মাছি। ঝাপটা হাওয়ায় এক পশলা ধুলো উড়ে গেলে জিলিপি আর বোঁদের ওপর এক পরত ধুলোর সর পড়ে। মিষ্টির দোকানের পাশে হলুদ বাক্স ভর্তি আইসক্রীম নিয়ে

একজন দাঁড়িয়েছে। এ যেন এক মেলার আবহাওয়া। ডুলির বাইরে ঘাড় বার করে মুগ্ধ, বিহ্বল চোখে জিলিপি আর বোঁদের দিকে বৈরাগীচরণ তাকিয়ে আছে। এতো জিলিপি, এতো বোঁদে! আহা! ভোঁতা হয়ে যাওয়া ঘ্রাণ-যন্ত্র দিয়ে একটা জোরালো নিশ্বাস টানে সে। এক পুরোনো স্বপ্ন আর স্মৃতিতে সে যেন বুঁদ হয়ে ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ঠিক তখনই এক দল নারী পুরুষ ঘিরে ধরল ডুলিটা। ডুলির ভেতরে বসা বুড়োকে দেখে হাসি রহস্যে গড়িয়ে পড়ে তারা।

ও দাদু কোথায় চললে, এক বাচ্চা প্রশ্ন করল।

ভোট দিতি।

কথাটা বলে বুড়ো একগাল হাসল। একজন বলল, বুড়োর কোমরের কসি যে খুলে গ্যাছে গো!

এরা সকলেই বুড়োর পরিবারের লোক। হঠাৎ এতোগুলো চেনা মুখ দেখে বৈরাগীচরণ খুশীতে ডগমগ।

বৈরাগীচরণের মেজছেলে এখন সংসারের কর্তা। ডুলির মধ্যে বাপকে দেখে সে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর কাঞ্চনকে বলল, ঘরে পৌঁছে দেবেন কিন্তু।

নিশ্চয়ই, জবাব দিল মলিন।

আরো পোয়াটাক গেলে পাকা পিচ রাস্তা, তারপর সামান্য এগিয়ে ডান হাতে মুচিশা স্কুল। সেখানে ভোট কেন্দ্র। বেহারাদের কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। বুক আর পেট বেয়ে সেই ঘাম গড়িয়ে পড়ছে ক্রমাগত।

ছেলের কথাটা বুড়োর মনে গেঁথে গেছে। সে প্রশ্ন করল, হেই বাবারা, আমাকে ফের ঘরে পৌঁছে দিবি তো?

মলিন আর কাঞ্চন চাওয়াচাওয়ি করল। ওরা দু'জনে বৈরাগীচরণের ছেলের কথাগুলো একটু আগে স্পষ্ট শুনেছে। যাওয়ার আগে বাপের কানে কানে ছেলে বলল, ভোট দিয়েই ডুলিতে চেপে বসবে। এসব ভোটবাবুরা কাজ ফুরোলে আর চিনতি পারবে না।

কথাটা শুনে দু'জনেই খুব অপমানিত হয়ে না শোনার ভান করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। এখন বৈরাগীচরণের প্রশ্নে কাঞ্চনের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল। কিন্তু কাঞ্চনকে কথা বলতে না দিয়ে মলিন জবাব দিল, নিশ্চয়ই পৌঁছে দেবো।

মলিনের জবাব শুনে বুড়ো আশ্বস্ত হলো।

মাথার ওপর সূর্য সামান্য পশ্চিমে হেললেও দাউদাউ আগুন ঢালার বিরতি নেই। পায়ের তলায় গরম, গলা পিচ। খালি পায়ে এই পিচের ওপর দিয়ে হাঁটার বদলে দৌড়লে কম তাপ লাগে। ডুলি কাঁধে দুই বেহারা তাই প্রায় দৌড়োচ্ছে। তাদের সঙ্গে তাল রেখে মলিন আর কাঞ্চন ছুটছে।

বুড়ো বৈরাগীচরণ প্রশ্ন করল, হেই বাপ, ফি সনে কেন তো'দের ভোট হয় না, তাহলে একটু ডুলিতে চড়া যায়।

কাঞ্চন মলিন কোন কথা বলল না।

বুড়ো বললো, হেই বাপ, ফি সনে কেন তোদের ভোট হয় না, তাহলে বেশ মুচি আর বোঁদে খেতে পারি।

দুই বন্ধু নির্বাক।

পরের বার ভোটের সময় আমায় নে আসবি তো?

কাঞ্চন আর মলিন এই প্রশ্ন শুনে পরস্পরের মুখের দিকে এক লহমা তাকাল। কী জবাব দেবে ভাবতে থাকল। ফণীভূষণ ঘোষালের বদলে এক অদ্ভুত ভোটারকে আজ তারা সংগ্রহ করেছে। লোকটা গেঁয়ো, মুখ্যু এবং অস্বস্তিকর।

খর রোদে জ্বলে যাচ্ছে চরাচর। গলা বুক শুকিয়ে তেষ্টায় ঠাঠা করছে মলিনের ছাতি।

বুড়ো আপন মনে বকে চলেছে, আমার তখন জোয়ান বয়স। গায়ে ছিল অসুরের শক্তি, খেতেও পারতাম খুব। বাবুদের বাড়ির বিশ্বকর্মা পুজোয় সেবার দেড়শো মুচি আর দেড় সের বোঁদে খেয়েছিলাম। আহ্ কি সুন্দর বোঁদে, যেমন স্বাদ, তেমন বাস। লাল, সবুজ, হলুদ রসে জবজব করছে, বড়ো বড়ো আশফলের মতো দানা, আজও মুখে লেগে আছে। রোজ বিশ প'চিশটা গাছের ডাব কাটতাম। দুটো হাত আর বুকের ছাল গাছে ঘষে ছিঁড়ে যেত। সে কী জ্বালা। তারপর রাতে বউয়ের পাশে শুলে, বউটাও তখন নতুন, সব জ্বালা জুড়িয়ে যেত।

বউ অথবা বোঁদের স্মৃতিচারণার জন্যেই বোধহয় বৈরাগীচরণের ঘোলা দুটো চোখে স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসে। এক ঝাঁক সাইকেল রিক্সা রাস্তা কাঁপিয়ে হুড়মুড় করে বাথরাহাটের দিকে চলে গেল। সেই বিয়ের সময় একবার ডুলি চেপেছিলাম, বৈরাগীচরণ বলল, সেই প্রথম, সেই শেষ, তবে ডুলিতে বসে বড়ো আরাম রে বাপ!

একটা সিগারেট ধরিয়ে কাঞ্চন ঘনঘন টানে। ভুসভুস ধোঁয়া ওড়ে। সিগারেটের গন্ধ নাকে যেতে বৈরাগীচরণ বলল, আমাকে একটা সিগারেট দে বাপ!

দ্বিতীয় সিগারেট না থাকায় কাঞ্চন নিজের সিগারেটটাই বুড়োকে দিল। দারুণ খুশিতে সিগারেটটা মুঠোয় বাগিয়ে ধরে বৈরাগীচরণ একটা লম্বা টান লাগালো। অনেকদিন পর ও সিগারেট টানছে। ওর খুকখুক কাশীর সঙ্গে তাল রেখে ডুলিটা নাচতে থাকায় বেহারারা বিরক্ত হলো। একটু পরে ডুলি এসে থামল মুচিশা স্কুলের সামনে। সেখানে তখন বিপুল ভীড়, বেজায় ব্যস্ততা।
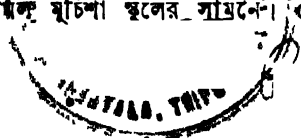
ডুলি নামিয়ে গামছায় মুখ মুছে বেহারারা সেই গামছাতেই হাওয়া খাচ্ছে। কাঞ্চন আর মলিন পাঁজাকোলা করে বৈরাগীচরণকে তুলে স্কুলের সামনে বটতলার বাঁধানো চাতালে বসাল। এক মিনিটের মধ্যে বুথ কমিটির গোপালবাবুর জিম্মায় বৈরাগীচরণকে রেখে নতুন ভোটার সংগ্রহের জন্যে কাঞ্চন আর মলিন দুদিকে চলে গেল। যাওয়ার আগে গোপালবাবুকে মলিন বলল, ভোট দেওয়ার পর বুড়োটাকে লুচি বোঁদে খাইয়ে ডুলিতে করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

সে তোমায় ভাবতে হবে না, গোপালবাবু বলল

কাঞ্চন আর মলিন চলে যাওয়ার পরেও বৈরাগীচরণ কিন্তু বুঝতে পারল না যে, তার দুই যাত্রাসঙ্গী বিদায় নিয়েছে। গোপালবাবু এবং তার সঙ্গী, আর এক স্বেচ্ছাসেবক, বাসুকে বৈরাগীচরণ ভাবতে থাকল মলিন আর কাঞ্চন বলে। ভোট দেওয়ার পর সেই বটতলার চাতালেই দুই সেচ্ছাসেবক বৈরাগীচরণকে আবার বসাল। বৈরাগীচরণকে ঘিরে তখন খুব ভীড় এবং হৈচৈ। এলাকার একমাত্র শতায়ু ভোটার বৈরাগীচরণের নাম প্রিসাইডিং অফিসার নথিভুক্ত করেছে। দৈনিক সংবাদপত্রের এক ফটোগ্রাফার বৈরাগীচরণের তিন চারটে ছবি তুলল। তাকে ঘিরে যে কী ঘটছে, বৈরাগীচরণ বুঝতে পারল না।

খিদেতে সে বড়ো কাতর হয়েছিল। গাছতলার চাতালে বসে সে গোঙাতে থাকল, হেই বাপ, আমায় কখন লুচি বোঁদে দিবি? আমার যে বড্ড খিদে লেগেছে।

বৈরাগীচরণের কাছাকাছি তখন কেউ ছিল না। একটু আগে পার্টি অফিস থেকে জরুরী তলব আসায় গোপালবাবু এবং বাসু চলে গেছে। যাওয়ার আগে অবশ্য বুড়োটাকে খাইয়ে বাড়ি পাঠানোর কথা গোপালবাবু দলের এক সেচ্ছাসেবক দিলীপকে বলে গেছে।

দিলীপ বলেছিল, আপনি কিছু ভাববেন না গোপালদা, সব দায়িত্ব আমার।

দিলীপ দায়িত্ব পালন করেছিল। 'বুড়ো' বলতে মুচিশা স্কুলের উল্টোদিকে সাইকেলের দোকানে বসে থাকা ফণীভূষণ ঘোষালের কথাই সে বুঝেছিল। অত্যন্ত পরিপাটি করে ফণীবাবুকে লুচি বোঁদে জল খাইয়ে একটা খালি ডুলিতে দিলীপ তুলে দিল। বটতলার বাঁধানো চাতালে বৈরাগীচরণের ওপর দু-একবার নজর পড়লেও বুড়োটার পোশাক এবং চেহারা দেখে তাকে লুচি বোঁদে খাওয়াবার মতো যোগ্য মানুষ বলে দিলীপের মনে হয়নি। ডুলিতে চেপে ফণী ঘোষাল যখন বাড়ি ফিরছেন, গাছতলায় তখন প্রচণ্ড খিদেতে বৈরাগীচরণের পেট আনচান করছে। খিদের জ্বালায় কাতার বুড়োর দুচোখের কোল বেয়ে শুকনো, শীর্ণ মুখে কয়েক ফোঁটা নোনা জল গড়িয়ে পড়ল।

কয়েক ফোঁটা মাত্র। কিছু পরে সেই জল শুকিয়ে বুড়োর মুখের খরখরে চামড়ায় জেগে উঠল সাদা সরু দাগ। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে কয়েক দফা হস্তান্তরের ফলে শেষ পর্যন্ত বুড়োকে দেখার জন্যে আর কাউকেই পাওয়া গেল না। অনাথ বৈরাগীচরণ বটতলার চাতালে একা পড়ে থাকল। বৈরাগীচরণের ট্যাঁকে গোঁজা একটা ভোটপত্র। ভোট দেওয়ার ঘরে ঢুকে ব্যালেট্ বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক চেষ্টাতেও ব্যালট্ বাক্সের ফুটো খুঁজে না পেয়ে ভোট-পত্রটা বৈরাগীচরণ সযত্নে ট্যাঁকে রেখে দিয়েছে। মলিনের হাতে কাগজের টুকরোটা সে তুলে দেবে।

তখন সূর্য ডুবছে। একটু আগে ভোটপর্ব সেরে বাক্সটাক্স গুছিয়ে নির্বাচন কর্মীরা মুচিশা স্কুল ছেড়ে চলে গেছে। যাওয়ার আগে চাতালের ওপর ঘুমিয়ে থাকা বুড়ো বৈরাগীচরণকে তারা দেখেছে। বৈরাগীচরণের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা রাস্তার একটা ঘেয়ো কুকুরকেও তারা নজর করেছিল।

একজন বলেছিল, সেই বুড়োটা না?

দ্বিতীয়জন জানতে চেয়েছিল, কোন বুড়ো?

সবচেয়ে বয়স্ক ভোটার।

দূর, ওটা ভোটার নয়, ভিখিরী।

তারপর ভোটার এবং ভিখিরীর মধ্যে পার্থক্য কী, এই নিয়ে আলোচনায় মশগুল হয়ে তারা জেলা সদরের দিকে চলে গেল।

স্কুল চত্বর এখন ফাঁকা, জনমানবহীন। ধীরে ধীরে ঘন অন্ধকার মিশে যাচ্ছে গাছপালা, নিসর্গপ্রকৃতি। এক আকাশ তারা অন্ধকার আকাশে ঝিকমিকিয়ে ওঠে। বটতলার চাতালে একজন অচল, অক্ষম, আধমরা মানুষের গন্ধ পেয়ে একদল ক্ষুধার্ত শিয়াল ভাগাড় ছেড়ে অন্ধকার ঝোপজঙ্গল ধরে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসতে থাকে।

মুচিশা স্কুলের অদূরে পার্টি অফিসের মধ্যে কুপির আলো ঘিরে নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে কর্মীরা তখন জল্পনা কল্পনা করছে।

হঠাৎ মলিন প্রশ্ন করল, বুড়োটাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তো?

কোন বুড়ো, কাঞ্চন জানতে চাইল।

সাঁজুয়ার বৈরাগীচরণ।

নিশ্চয়ই হয়েছে, কাঞ্চন বলল, বুড়ো খুব সেয়ানা, রাস্তায় পড়ে থাকার লোক নয়।

লুচি বোঁদে খেয়েছিল?

আগামী নির্বাচনের আগে সেটা জানা যাবে না,-কাঞ্চন বলল।

কাঞ্চনের কথা শুনে ঘরের সকলে খুব একচোট হাসল। মুচিশা স্কুলের

ঠিক পেছনের ঝোপে কয়েকটা শিয়াল চোখ জ্বেলে ওৎ পেতে বসে আছে। মুঠো মুঠো জোনাকি উড়ছে তাদের ঘিরে। পৃথিবী শব্দহীন। বাতাস স্তব্ধ। আকাশ যেন মাটির কাছাকাছি নেমে এসেছে অনেকটা। বৈরাগীচরণের পাশে শুয়ে থাকা রুগ্ন, ঘেয়ো কুকুরটা কী এক ভয়ে চাতাল ছেড়ে বাজারের দিকে চলে গেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে বৈরাগীচরণ স্বপ্ন দেখছে, তার সামনে পেছনে লুচি বোঁদের পাহাড়। হাওয়ায় ভুরভুর করছে গরম লুচি আর বোঁদের গন্ধ। বৈরাগীচরণ জানে না, এক পাল উপোসী শিয়াল ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

———

শূন্যের মধ্যে একশো

বড়ো মেয়ে রিনি বলল, বাবা, আজ রাত্তিরে আমি খড় খাবো।

ছোট মেয়ে ঝিনি বলল, আমি রাত্তিরে খড় খাই না, ছাই খাই।

অতনু বুঝল, তার শুরু করা খেলাটা এখন এক বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁচেছে। এবার এ খেলা শেষ করা উচিত। কিন্তু খেলার নেশা তার দুই মেয়েকে তখন পেয়ে বসেছে। এতো সহজে তারা খেলা শেষ করতে রাজী নয়।

অন্ধকার আকাশে কৃষ্ণপক্ষের একফালি ফ্যাকাসে চাঁদ উঠেছে। খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রিনি বলল, সূর্য উঠছে।

ঝিনি বলল, সূর্য নয়, পদ্মপিসি হ্যারিকেন জ্বেলেছে।

দুই মেয়ের দিকে অতনু তাকাল। একটু আগে বাড়ীর কাজের মেয়েটা, নাম পদ্মী, ঘরের মধ্যে একটা হ্যারিকেন রেখে গেছে। হ্যারিকেনের আবছা আলোয় ভ্যাপসা, গুমোট অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিজের দুই আত্মজাকে কেমন অচেনা লাগল অতনুর। রিনির বয়স, আট, ঝিনির পাঁচ।

আজ বেশ তাড়াতাড়ি, সন্ধ্যের একটু পরেই অতনু বাড়ি ফিরেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার বিপদ আছে। একটু আগেভাগে অতনু বাড়ী ফিরলেই তার দুই মেয়ে গল্প শোনার বায়না ধরে। তার ওপর যদি লোডশেডিং, অন্ধকার থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। লেখাপড়া শিকেয় ওঠে। দিদির চেয়ে গল্প শোনার জন্যে ঝিনির তাগিদই বেশী। কেননা, সে তার দিদির মতো গড়গড় করে গল্পের বই পড়তে পারে না।

আবছা আলোয় দুই মেয়ে অতনুর গা ঘেঁসে বসল। মেয়েদের মা রান্নাঘরে, আর দিদা ঠাকুরঘরে ব্যস্ত। কী গল্প যে বলা যায়, অতনু ভেবে পেল না। ছেলেবেলায় যে ক'টা গল্প ও শুনেছিল, কটাই বা, খুবই অল্প, তার অধিকাংশই আজ অতনুর মনে নেই। যে ক'টা মনে ছিল, বলা হয়ে গেছে। তাই মেয়েরা আজকাল গল্প শুনতে চাইলে, অতনু খুব অসহায় বোধ করে। সে লেখক, গল্পকার নয়, তার কল্পনাশক্তিও কম, অনেক চেষ্টাতেও সে একটা গল্প বানাতে পারে না। গল্প ভাবতে গেলেই নানা ব্যাভিচার আর দুর্নীতির ঘটনা তার মনে পড়ে। কিন্তু সে সব ঘটনা বা বিশ্লেষণ প্রাপ্তবয়স্কদের বলা যায়, শিশুদের শোনানো যায় না। তখনই তার মনে হয়, এই নিষ্ঠুর, কঠিন পৃথিবীতে শিশুদের কোন জায়গা বা তাদের মনোরঞ্জনের কোন উপকরণ নেই।

অতনুর নীরবতা দুই মেয়েকে অধৈর্য করে তুলতে তারা আবার তাগাদা দিল, কী হলো ? গল্প বলো।

গল্প ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা মজার খেলা অতনুর মাথায় এসে গেল। দুই মেয়েকে লক্ষ্য করে সে বলল, আমি তোমাদের কয়েকটা প্রশ্ন করবো। প্রতি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তরের জন্যে পাঁচ নম্বর, না পারলে শূন্য। যার নম্বর বেশী হবে, সে একটা প্রাইজ পাবে।

দুই মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাবার ওপর হামলে পড়লো, কী প্রশ্ন ? কী প্রশ্ন ?

প্রশ্ন খুব সোজা, তবে জবাবটা হবে একটু অদ্ভুত, উল্টো, মাথা খাটিয়ে বুঝতে হবে। আর একবার বুঝতে পারলে চটপট জবাব দিতে অসুবিধে হবে না।

অতনুর কথা শুনে ছোট মেয়ে ঝিনি একটু বিপন্ন বোধ করলেও দিদিকে টেক্কা দেওয়ার জন্যে সে জোর গলায় বলল, ঠিক আছে।

অতনু প্রশ্ন করল, শিয়াল কোথায় ?

অবাক হয়ে রিনি বিড়বিড় করল, শিয়াল ? কোন শিয়াল ?

ঝিনি জবাব দিল, শিয়াল তো জঙ্গলে থাকে।

মুচকি হেসে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অতনু বলল, মাথা খাটাও, উল্টো করে ভাবো।

রিনিই দুম করে জবাব দিল, শিয়াল ঠাকুর ঘরে, দিদার কাছে।

মেয়ের বুদ্ধি দেখে খুশি হয়ে অতনু বলল, কারেক্ট, ঠিক জবাব।

বিস্মিত ঝিনি একপলক বাবা এবং দিদিকে দেখে নিমেষে ব্যাপারটা ধরতে পারল। অতনু ফের প্রশ্ন করল, ইঁদুর দুটো কোথায় ?

ঝটিতি ঝিনি বলল, শোবার ঘরে, খাটের তলায়।

অতনু বলল, কারেক্ট্।

বাড়ীর পোষা কুকুর এবং বেড়ালদুটো এভাবে যখন শিয়াল এবং ইঁদুরে রূপান্তরিত হয়েছে, ঠিক তখনই বাইরের অন্ধকার নর্দমার দিকে আঙুল তুলে ছোট মেয়ে, পাঁচ বছরের ঝিনি চেঁচিয়ে উঠল, সিংহ, সিংহ।

একটু ভয় পেয়ে অতনু আঁতকে উঠেছিল। কিন্তু ইঁদুরটাকে দেখে সামলে নিল নিজেকে। ভাগ্য ভালো, অন্ধকার ছিল, তাই তার কেঁপে ওঠা দুই মেয়ে টের পেল না। তাছাড়া ঝিনির রসিকতায় দিদি আর বোন তখন হেসে গড়িয়ে পড়ছে। একটু পরে হাসি থামিয়ে রিনি বলল, এটা হবে না।

ঝিনি বলল, হবে।

মতামতের জন্যে দুই মেয়ে বাবার দিকে তাকাল। কোন নিয়মে ইঁদুর সিংহকে মেলানো যায়, অতনু ভাবতে লাগল। রোজ অনেক সিংহকে ইঁদুর,

এবং ইঁদুরকে সিংহ সে হতে দেখে, কিন্তু সে সব কথা ছোটরা বুঝবে না। না বোঝাই ভালো।

বাবার মনের কথা কিছুটা আন্দাজ করে ঝিনি বলল, ঘুমন্ত সিংহ মশাই-এর নাকের গর্তে ইঁদুর ঢুকে গিয়েছিল। সিংহ মশাই তখন কী রাগই না করেছিল! তারপর ফাঁদে পড়া সেই সিংহ ভয়ে ইঁদুর হয়ে গেলে, সেই ইঁদুরটা তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

ঠিক কথা, রায় দেওয়ার ভঙ্গীতে অতনু বলল, সিংহকে ইঁদুর এবং ইঁদুরকে সিংহ বললে পাঁচ নম্বর পাওয়া যাবে।

একতলার খোলা জানালা দিয়ে দেখা গেল, রাস্তার ওপারে একজন বুড়ি ভিখিরী অন্ধকার আবর্জনায় স্তূপ লণ্ডভণ্ড করে কী যেন খুঁজছে।

সেটা দেখে রিনি বলল, মহারানী ভিক্টোরিয়া মাথার মুকুট খুঁজছে।

দিদির সঙ্গে তাল রেখে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারে ছাপা এক বিখ্যাত সাধকের আবছা ছবিটা দেখিয়ে ঝিনি বলল, চোর চোর, চোরটা অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে।

অতনুর বুকটা তখন থেকেই ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছিল। তারপর ভাত এবং ময়দার বিকল্প হিসেবে দুই মেয়ে যখন খড এবং ছাই-এর কথা বলল, তখনই অতনু বুঝতে পারল যে, খেলা বড়ো বিপজ্জনক জায়গায় চলে যাচ্ছে, আর নয়। এখনই দুই মেয়েকে থামানো উচিত। তা না হলে খেলার তোড়ে দুই মেয়ে যাবতীয় চেনা জানা মানুষ, ঘটনা এবং মূল্যবোধকে ভাসিয়ে দেবে। কিন্তু কীভাবে সে থামাবে! এখনো আলো আসেনি, চারপাশ অন্ধকার, অন্ধকারের মধ্যে রিনি, ঝিনির দাদামশাই, যিনি চোখের ডাক্তার, পড়াশোনা নিষেধ করেছেন। এখন বিদ্যুৎ এলে, আলো জ্বললে, পাখা ঘুরলে তবেই এই খেলা শেষ করা সম্ভব।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপক্ষের ঘেয়ো চাঁদ মলিনতর হচ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে রিনি বলল, আজ সূর্যের বড়ো তেজ।

ঝিনি যোগ করলো, সত্যি কী রোদ, চোখ খোলা যাচ্ছে না।

রিনি বলল, কাল আমাদের জেলখানা বন্ধ।

ঝিনি বলল, আমাদের খোলা।

তারপর যোগ করল, আমাদের জেলখানায় যে ছাগলটা বাংলা পড়ায়, তাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

রিনি বলল, আমিও তাই, আমাদের জেলখানার অঙ্কের ছাগলটা হাড়পাজী। তবে খুব তাড়াতাড়ি একটা পাঁঠার সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

অতনু বুঝতে পারছিল, খেলার দান দ্রুত তার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। এখন ইচ্ছে করলেও এই খেলা সে থামাতে পারবে না।

কথা ঘোরাবার জন্যে অতনু রিনিকে বলল, এককাপ চা নিয়ে এসো তো মা।

অন্যদিন হলে বাবার চা আনার জন্যে দুই বোনের মধ্যে এতোক্ষণ প্রতিযোগিতা লেগে যেত। আজ কারো ওঠার লক্ষণ দেখা গেল না। ঘোলাটে অন্ধকারে তারা ক্রমশই অবছা হয়ে যাচ্ছিল।

রিনি বলল, কতোক্ষণ হলো মা অফিস থেকে ফিরেছে, অথচ রান্নাঘর ছেড়ে বাবার আসার নাম নেই।

ঠিক হলো না, দিদির কথায় আপত্তি করে ঝিনি বলল, আমাদের মেয়েটা কতক্ষণ হলো রান্নাঘর থেকে ফিরেছে, কিন্তু আমাদের ছেলেটা অফিসে বসে বাঁধছে তো রাঁধছেই। কী যে ছাইপাশ রান্না!

আমাদের নাতনীটা কোথায়, রিনি জানতে চাইল।

নাতনী ঠাকুর ঘরে পুতুল পুজো করছে। নাতনীর যতো বয়েস কমছে, পুতুলদের ওপর ভক্তি ততো বেড়ে যাচ্ছে, ঝিনি জানাল।

ঠাকুরঘর না খেলাঘর?

ঠিক, খেলাঘর।

না, আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়, অতনু ভাবল, এখনি ওদের থামাতে হবে। কিন্তু কে কাকে থামায়! তার মনে হলো, সে নিজেই যেন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি শিশুতে রূপান্তরিত হয়েছে। এক হাজার অশ্বশক্তির পিচকিরি তার অন্তঃস্থলের কথাগুলো শুষে নিয়ে সহস্র ধারায় ছড়িয়ে দিচ্ছে।

অন্ধকার রাস্তায় হরিধ্বনি শোনা যেতে রিনি বলল, একদল ভূতের কাঁধে চেপে একটা জ্যান্ত মানুষ শ্মশানে চলেছে।

শ্মশানে নয়, ঠাকুরঘরে, ঝিনি শুধরে দিল দিদিকে।

ভূতগুলোর গায়ে কী বিচ্ছিরি গন্ধ, ঝিনি বলল।

খাটিয়ায় শোয়ানো জ্যান্ত মানুষটার শরীরে কী সুন্দর গন্ধ।

ঠাকুর ঘরে যাওয়ার সময় সব মানুষের শরীর থেকে সুন্দর গন্ধ বেরোয়।

আর জ্যান্ত মানুষটাকে ঠাকুর ঘরে রেখে যারা শ্মশানে ফিরে আসে, তাদের গা থেকে পচা গন্ধ বেরোয়।

বাবার কথা ভুলে দুই বোন খেলার মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছে। পৃথিবী ও প্রকৃতির সব দৃশ্য এবং ঘটনাকে তছনছ করে দেওয়ার জন্যে তারা যেন এখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুন্দর পোশাক পরা কয়েকজন যুবক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের দেখিয়ে ঝিনি বলল, ঐ দ্যাখ দিদি, কতোগুলো গোরু যাচ্ছে।

গোরু না ভূত!

দিদির প্রশ্নে ঝিনি একটু থতমত খেয়ে যেতেই দিদি বলল, ওরা গোরুও নয় ভূতও নয়, ওরা গোভূত।

তারপরে দুজনে হাততালি দিয়ে হাসতে থাকল।

কখন রাত হবে, রিনি হঠাৎ স্বগতোক্তি করল।

কেন রাতের কী দরকার? কী সুন্দর দিন। চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় রাস্তার পিচ গলে যাচ্ছে।

তা ঠিক। কিন্তু রাত না হলে যে সূর্য উঠবে না। সূর্য না উঠলে লেখাপড়া করবো কী করে?

লেখাপড়া করে কী লাভ?

অনেক লাভ। লেখাপড়া না শিখলে কেউ আমাদের মুখ্যু বলে খাতির করবে না।

মুখ্যু হয়েই বা কী লাভ?

মুখ্যু না হলে কেউ পণ্ডিত বলবে না আমাদের। যে যতো বড়ো মুখ্যু, সে ততো বড়ো পণ্ডিত। সত্যিকারের পণ্ডিতমুখ্যু হতে পারলে তখন আমরা মানুষকে গরু, গরুকে মানুষ, দিনকে রাত, রাতকে দিন, সাদাকে কালো, কালোকে সাদা, পৃথিবীকে শ্মশান এবং শ্মশানকে পৃথিবী বলতে পারবো।

তারপর?

—রোজ খড়ের পোলাও আর ছাই এর লুচি খাবো।

তারপর? তারপর কী হবে?

বোনের প্রশ্নের যুৎসই জবাবের জন্যে রিনি অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াতে থাকল। গল্প বলার হাত থেকে রেহাই পেয়েও কী এক অলৌকিক সম্মোহনে মেয়েদের গল্পের সঙ্গে অতনু জড়িয়ে পড়েছিল। রিনির মুখের জবাব কেড়ে নিয়ে অতনু বলল, তারপর একদিন যে মানুষকে গরু, দিনকে রাত, সাদাকে কালো, পৃথিবীকে শ্মশান নাম দিয়েছিলে, তাদের আসল নামগুলো ফিরিয়ে দেবে।

দুই মেয়ে একসঙ্গে প্রশ্ন করল, কবে, কেমন করে?

অন্ধকারে মিশে থাকা দুই মেয়ের দিকে তাকিয়ে অতনু বলল, সে আর একটা খেলা, সেটাও খুব মজার খেলা, সে খেলায় তোমাদের শূন্যের মধ্যে একশো পেতে হবে॥

পুরুষকার

নদীর চরে একটুকরো জমি কিনে লোকটা মাথা গুঁজে পড়ে থাকল। জায়গাটা শহর থেকে কিছু দূরে, নতুন একটা জনবসতি এখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। হু হু করে আসছে মানুষজন, একতলা, দোতলা, ছোট বড়ো নানারকম বাড়ি তৈরী হচ্ছে। যার যেমন পুঁজি, তার তেমন বাড়ি। কিন্তু জমি কিনেই লোকটা ফতুর, বাড়ি বানাবার সামর্থ্য তার নেই। প্রতিবেশীরা, অনেকেই লোকটার চেনা, একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছে, অবসর নেয়নি, এখনও চাকরি করছে, এরকমও কয়েকজন আছে। পরিচিত যাদের বাড়ি উঠছে, তাদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে এসে লোকটাকে প্রশ্ন করে, কী সরকারমশাই, কবে হাত দিচ্ছেন কাজে?

টাক মাথায় গামছা জড়ানো, রোগা, কালো, আদুল শরীর লোকটা ভিজে মাটির ওপর বসে অল্প হেসে জবাব দেয়, কাজ তো শুরু হয়ে গেছে।

তারপর নিজের হাতে তৈরী চার পাঁচটা কাঁচা ইট দেখিয়ে বলে, এই-তো ইট বানাচ্ছি।

জবাব শুনে, যারা প্রশ্ন করেছিল, মুচকি হেসে চলে যায়। সরকারমশায়ের মাথাটা যে একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, এই নিয়ে আড়ালে আলাপ আলোচনা করে। লোকটা একমনে নিজের কাজ করে যায়। নরম মাটি, সযত্নে ফর্মায় ভরে একটার পর একটা ইট গড়তে থাকে। অদূরে রাস্তায় লরির শব্দ, লোহা, সিমেন্ট, ইট স্টোনচিপস্ আসার কামাই নেই। লোকজনের কথা, গুনগুন আলোচনা, কিছুই সরকারের কানে ঢোকে না, সরকারের মাথায় শুধু একটাই ভাবনা, ছিমছাম, সুন্দর ছোট্ট একটা বাড়ি বানাতে হবে। জৈষ্ঠের সূর্য মাঝ আকাশে ওঠার আগেই নদীর চর, চারপাশের পৃথিবী তেতে আগুন, নদীর তপ্ত বাতাস কেশর নেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পৃথিবীর ওপর। জনহীন চারপাশ, কাক, কুকুর পর্যন্ত ছায়া খুঁজে লুকিয়ে আছে। ভারা বাঁধা বাড়িগুলো চুপচাপ, রাজমিস্ত্রী আর মজুরেরা বিশ্রাম নিচ্ছে। সরকার কিন্তু নির্বিকার, অচঞ্চল, গামছায় কপাল, বুক, পিঠের ঘাম মুছে ইটের ফর্মায় নরম মাটি ভরছে। কয়েক ডজন ইট তৈরী হলেই সরকার সেগুলো পুড়িয়ে নেয়। গ্রীষ্ম ফুরোলে বর্ষা, তখন কাজের ভারী অসুবিধে। বর্ষায় ভিজে জমির এক কোণে খড়ের ঝুপড়িটার মধ্যে সারাদিন বসে থাকা, ওখানেই খাওয়া, শোওয়া, জলের ছাট বাঁচিয়ে ধীর চালে সাবধানে দু' চারটে ইট বানানো। ইট গড়ার গতি তখন কমে যায়, রোজ বিশ, পঁচিশ, খুব বেশী হলে ত্রিশটার বেশী ইট

তৈরী হয় না। খড়ের এই ঝুপড়ি একচালাটার মধ্যে জায়গাও কম, পাশাপাশি ত্রিশটার বেশী ইট রাখা যায় না, চালার বাইরে রাখলে কাঁচা ইট বৃষ্টির জলে গলে যায়। তাছাড়া ঘরের মধ্যে আছে দুটো পোষা জীব, একটা কানা বেড়াল, আর একটা মেটে সাপ। বছর দুয়েক আগে এক বর্ষার রাতে এ দুটো জীব এখানে এসেছিল, তারপর থেকে গেছে। কানা বেড়াল আর মেটে সাপটা সরকারের খুব ন্যাওটা, সরকারের চারপাশেই জীবদুটো সারাদিন ঘুর-ঘুর করে, সরকার গভীর স্নেহে পোষা প্রাণীদুটোর দিকে তাকায়, তাদের সঙ্গে কথা বলে।

এটা আমার একটা চ্যালেঞ্জ, কানা বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে সরকার বলল, জীবনে সব কাজই নিজের হাতে করেছি, কারো দয়া, সাহায্য চাইনি, আজও চাই না, নিজের হাতে আমি নিজের বাড়ি বানাবো।

জনবসতির একেবারে শেষ প্রান্তে, পিছনের জমিটা সরকারের। যাদের বাড়ি তৈরী হচ্ছে, এদিকে তাদের কেউ বড়ো একটা আসে না। আসবেই বা কেন? সরকার লোকটা ছিটিয়াল, সব সময়ে গোঁজ হয়ে আছে, কথাবার্তা বিশেষ বলে না। পাঁচজনের এই ধারণাটা ঠিক। সরকার চিরকালই খুব মিতভাষী, আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে খেই হারিয়ে যায়। কী এক লজ্জা আর সংকোচ তাকে অভিভূত করে। কিন্তু সরকার যে কথা বলে না, এটা ঠিক নয়, দুই পোষা প্রাণীর সঙ্গে ছাড়াও সরকারের কথা নিজের সঙ্গে, নিঃশব্দে। একা একা সে কথা বলে, বলে স্বস্তি পায়। মাথার মধ্যে নানা কথা আর শব্দের অবিরাম গুঞ্জন চলে। বুঝলে সরকার, আপন মনে সে বিড়বিড় করে, লোভ ক'রো না, কারো ক্ষতি নয়, সৎভাবে জীবনটা কাটানোই বড়ো কথা। আরো একটা জিনিস, আত্মসম্মান, কারো কৃপা, করুণা নয়, নিজের কাজটুকু নিজে করো।

কানা বেড়াল, মেটে সাপ আর নিজের সঙ্গে কথা বলার নেশায়, সরকার এতো বুঁদ আর আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, যে প্রতিবেশী বা বন্ধুরা সেটা টের পায় না, বিরক্ত হয়ে বিরস মুখে ফিরে যায়।

সরকার ইট গড়ে, আর পুরোনো দিনের কথা ভাবে। কতো নাম, কতো মুখ আর স্মৃতি। ঝাঁঝা রোদে সরকারের মুখ, শরীর ঝলসে যাচ্ছে, চিমসে, কালো শরীর থেকে ঘাম বেরোচ্ছিল দরদর করে, একফালি ধারালো রোদ আছড়ে পড়েছে চোখের ওপর, একটু ঘুরে বসে মেটে সাপটার দিকে তাকিয়ে সরকার বলল, পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও আমি নড়বো না। রোদ, তাপ, অনেক বছর আমায় সেঁকেছে, শেষ করে দিতে চেয়েছে, কিন্তু করেনি, এটাও একটা পরীক্ষা। মানুষ বহুকাল ধরে এই পরীক্ষায় পাস করে এসেছে, আমি ফেল করবো কেন?

পিটপিটে চোখ মেলে মেটে সাপটা তাকিয়ে আছে সরকারের দিকে। কানা বেড়ালটা ঘরের বাইরে, হয়তো এখনি নদীর ধারে মাছের খোঁজে যাবে। সেই ভোর থেকে নরম ভিজে মাটি আর ফর্মা নিয়ে সরকার বসেছে। মাঝখানে মিনিট দশেক বিশ্রাম, পান্তা ভাত, পেঁয়াজ আর একঘটি জল খেয়েছে সরকার। মাথার মধ্যে ভনভন করছিল, শরীরটাও বেজুত, বাঁশের চাঁচোর দিয়ে ফর্মার বাড়তি মাটি নিপুণ হাতে কেটে সরকার ফর্মা উপুড় করল। আর একটা নতুন ইটের জন্ম হলো। আজ সকাল থেকেই সরকার খুব ক্লান্ত, মনে মনে বলল, বয়স হয়েছে আগের মতো আর খাটতে পারি না।

বুক ফুঁড়ে একটা ঘন, গভীর নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। একটু আনমনা, উদাসীন হয়েই সরকার সামলে নিল নিজেকে। মেটে সাপটাকে বলল, এত্তো সব বাজে চিন্তা। অন্যের সাহায্য, কৃপা পাওয়ার জন্যে দুর্বল, রুগ্ন সাজা একটা অজুহাত, চালাকি। আমি এমন ভাববো না। কেন ভাববো? আমার আট বছর বয়সে বাবা মারা গিয়েছিল, ঘরে বিধবা মা, দুটো ছোট বোন নিয়ে আট বছরের সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে। সে পথ ভার। নিঠুর আর কঠিন, সে পথে অনেক দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা, কিন্তু আমি কখনো মাথা নোয়াইনি, বিকিয়ে দিইনি নিজেকে। সেদিন আমি যা ছিলাম, বয়স বাড়লেও আজও আমি তাই।

চাকরি জীবনের নানা টুকরো ঘটনা সরকারের মনে পড়ে। চাকরিটা ছিল খুব মামুলি, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, চেক লেখার কাজ, রোজ ত্রিশ, চল্লিশটা চেক খাতাপত্র মিলিয়ে লিখতে হতো। বাড়তি আয়ের এতো সুযোগ ওই দপ্তরে আর কারো ছিল না। অল্পবয়সী সহকর্মী, বিভূতি প্রায়ই বলতো, সরকারদা, আমাদের একটু দেখবেন।

বিভূতির কথা সরকার বুঝতে পারতো না, দু একবার ওদের চেক ওপরে তুলে লিখে দিয়েছে। অফিস ঘরের পিছনের বারান্দায় এক দুপুরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সরকারের হাতে একটা খাম দিয়ে বিভূতি বলেছিল, এটা রাখুন।

এটা কী, সরকার জানতে চেয়েছিল।

আপনার বখরা, পাঁচশো টাকা...।

কথাটা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠে বিভূতির একটা হাত, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সরকার বলেছিল, ভাইটি, আমি গরিব মানুষ, খেটে খুঁটে খাই, আমাকে মারবেন না।

ফেরত দেওয়া টাকার খাম হাতে বিভূতি হতবাক, একটু রাগও হয়েছিল তার, বলেছিল, এভাবে ডিপার্টমেণ্টের সকলের আপনি ক্ষতি করবেন, পেটে লাথি মারবেন?

কী বলবে, ভেবে না পেয়ে সরকার বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে

বিভূতির মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সেদিন বিকেলে অফিসের কর্তৃপক্ষকে আবেদন করেছিল, অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে আমাকে বদলি করুন।

সরকারের আবেদন নাকচ হয়ে গিয়েছিল। এরকম বহু ঘটনা, যার জন্যে সরকারকে যথেষ্ট হেনস্তা হতে হয়েছে, সহকর্মীরা পাগল বলেও তার নামে প্রচার করে দিয়েছিল।

আমি পাগল নাকি রে, মেটে সাপটার দিকে তাকিয়ে সরকার প্রশ্ন করল। তারপর নিজের মনে বলল, আমি কি করবো, জীবনের কাছে একজন মানুষের কিছু দায় তো আছে, সেগুলো তো তাকে করতে হবে। সকলেই যদি দায় এড়িয়ে যায়, তাহলে সমাজ, সংসার তো ভেসে যাবে। কিন্তু তা কী হয়? আজ পর্যন্ত কিছু কী ভেসে গেছে?

আকাশের দিকে তাকিয়ে সরকার সময় বোঝার চেষ্টা করল। সূর্য পশ্চিমে হেলেছে, তবু রোদের তেজ, তার কমেনি। একটু দূরে রাস্তার ধারে একটা নতুন তেতলা বাড়ি, চারপাশে ভারা বাঁধা, বাড়ির কাজ শেষ এখন রঙ হচ্ছে। বাড়িটা বিভূতির, একটা নামী ঠিকেদারী সংস্থা বিভূতির বাড়িটা বানাল।

মাঝে মাঝে বিভূতি সপরিবারে গাড়ি চেপে এসে তদারকী করেছে। আরো দশ বছর বিভূতির চাকরী আছে। বিভূতি এখন অফিসের অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টের বড়োকর্তা। প্রমোশন পেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে গেছে। সরকার রিটায়ার করার আগেই তার ওপরওলার চেয়ারে বিভূতি বসেছিল।

আমি কী বিভূতিকে হিংসে করি, সরকার প্রশ্ন করল নিজেকে। এক মুহূর্ত ভেবে নিজের মনেই সরকার বলল, না হিংসে নেই, আমার কোনো অভিযোগও নেই বিভূতির বিরুদ্ধে। কেন থাকবে? আমার চেনাজানা ছকের বাইরে কতো কিছু ঘটছে, কিন্তু সেগুলো যে ছকের বাইরে, এমন কথা আমি বলবো কী করে? আমার জানাটাও একটা ছক, না জানাটাও একটা ছক, দুটো মিলেই জীবন, হয়তো তার চেয়েও জীবন ঢের বড়ো, তা'পর'স' আমি হিংসে বা অভিযোগ করতে যাবো কেন?

নদীর ধার থেকে ভেসে আসছে মেয়েলি গলার খিল খিল হাসি, দুই যুবতী স্নানে নেমেছে। একজন উঠে আসছে নদী থেকে। ভিজে শাড়ীতে ঢাকা, পুষ্ট সুডৌল শরীর মেয়েটাকে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে তার সখী হাত ধরে টানছে। প্রথম জনের স্নান শেষ, তার সখী হয়তো আরো কিছুক্ষণ জলে থাকতে চায়। একদল স্বাস্থ্যবতী কালোকুলো মেয়ে নানা ঠিকেদারের মজুর হয়ে এখানে কাজ করতে এসেছে। এরা দু'জন সেই দলেরই মেয়ে। সরকারের দু চোখের ধূসর জমি চিকচিকিয়ে ওঠে। এক মুহূর্তের জন্যে। সরকার নিজেকে ধিক্কার দেয়, বলে, ছি ছি, বুড়ো বয়সে তোমার ভীমরতি ধরেছে নাকি?

মেয়েদের একজন হাঁক দিল, ও বাবু চ্যান করবে নি?

আবার খিলখিল হাসি। মেটে সাপটা হঠাৎ নড়ে ওঠে, কান খাড়া করে মেয়েদের হাসি শুনছে যেন।

এক মুহূর্ত হাতের কাজ থামিয়ে সাপটার দিকে তাকিয়ে সরকার বলল, টোপ, ফাঁদ, পুরাণে এরকম অনেক গল্প আছে। বড়ো বড়ো মুনি ঋষিদের ধ্যান ভাঙাবার জন্যে স্বর্গের দেবতারা সুন্দরী মেয়েদের পাঠাতেন, এখনও সেটা হয়। আমার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কিন্তু নাহ্, আমি কাঁচা লোক নই, কেউ টলাতে পারবে না আমাকে। সব মানুষকেই একটা কিছু আঁকড়ে বাঁচতে হয়, আমি নিজেকে আঁকড়ে, নিজের দুটো হাত আর বুক আঁকড়ে বেঁচে আছি। বুকের ভেতর একটা জিনিস আছে, কেমন তার রঙ, লাল, সবুজ, অথবা হীরের মতো আলোকিত, দীপ্তিময়, ভারী সুন্দর আর পবিত্র তার গন্ধ, সে বলে, সরকার, সাবধান, পথ বড় পিছল, একটু অসতর্ক হলেই পিছলে, তলিয়ে যাবে, একদম নিখোঁজ। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও কতজন তলিয়ে যায়। কিন্তু তলিয়ে গেলেও তাকে অবহেলা, অপমান করো না। মানুষ বড় দুঃখী, অসহায়, সুন্দর, করুণাময়, তার দোষ, দুর্বলতা, পাপ, সাময়িক, গুণগুলো স্থায়ী, একদিন মানুষ সব দোষ, দুর্বলতা কাটিয়ে পরিষ্কার, শুদ্ধ, বিবেকবান হয়ে উঠবে।

বিশ, পঁচিশ গজ দূরে তিনটে ছোট ভাটি, পাকা ভাটায় পনেরো, কুড়িটা ইঁট পুড়ছে। একটা ভাটির পোড়া প্রায় শেষ, লাল হয়ে উঠেছে ইট, সরু সুতোর মতো ধোঁয়া উড়ছে, বাকি দুটো ভাটি চেপেছে গতকাল বিকেলে, সে দুটো থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরচ্ছে। জনবসতির ডানদিকে নদীর ধারে একটা জঙ্গল। ভাটায় আগুন জ্বালার জন্যে কয়লা কেনার ক্ষমতা সরকারের নেই। তাই ওই জঙ্গল থেকে কাঠকুটো কুড়িয়ে সরকার ভাটি জ্বালায়। ভাটি জ্বলে, ইট পোড়ে, কাঠকয়লা হয়। সেই কয়লায় তৈরী হয় নতুন ভাটির জ্বালানি। ভাটি তিনটের পাশে, থরে থরে সাজানো পোড়া ইট, হাজার তিনেক তো হবেই, নিজের হাতে তৈরি ওগুলো, যেন ইট নয়, সরকারের শরীরের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বসন্তে শরীর থেকে খুঁটে খুঁটে বার করে আনা হয়েছে। দুচোখে অগাধ মায়া আর তৃপ্তি নিয়ে ইটের পাজাটার দিকে তাকিয়ে সরকার প্রথমে নিজেকে, তারপর ছিমছাম, সুন্দর ছোট্ট একটা বাড়ি দেখতে পেল।

দুপুর শেষ হয়ে আসছিল। ধূসর এক ছায়া আড়াআড়িভাবে নদীর জলের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। নদীর ওপর দিয়ে টিমে তালে উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক বক। সেদিকে তাকিয়ে এক আবছা দুঃখ আর বিষাদে সরকারের মন ভারি হয়ে ওঠে। বাড়ি দেখার জন্যে যার আগ্রহ আর তাগিদ ছিল সবচেয়ে বেশি, সেই মানুষটা আর পৃথিবীতে নেই। মৃত মায়ের মুখটা সরকার ভাবার চেষ্টা

করল। মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে, মাকে নিয়ে সরকার এলাহাবাদ, বৃন্দাবন, মথুরা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। কাঁধে লোহার পাতে তৈরি একটা জগদ্দল ট্রাঙ্ক, হাতে বেডিং, স্টেশন থেকে ট্রেনের কামরা, ট্রেন থেকে রিকশা, সরকার নিজে বয়েছিল, একবারও কুলি মজুর ডাকেনি। মা রাগারাগি করেছে, বলেছে, এরকম জানলে তোর সঙ্গে আসতুম না। কেন এতো কার্পণ্য?

হেসে মাকে সান্ত্বনা দিয়ে সরকার বলেছিল, কার্পণ্য নয় মা, আমার জিনিস আমি বইব, কষ্ট হবে কেন? বরং কষ্ট তো ওই বেচারি কুলিদের, পেটের দায়ে ওরা সারাজীবন ভূতের বোঝা বইছে। আমি আর ওদের কষ্ট বাড়াই কেন?

মা বলেছিল, এটা ওদের রোজগার, পেটের দায়।

তা ঠিক, সরকার সায় দিয়ে বলেছিল, কিন্তু ক'জনের পেটের দায় আমি মেটাতে পারি? সে মেটানো অনেক শক্ত কাজ। সে কাজ নিয়ে ভাবার সাহস, সময়, কিছুই আমার নেই।

মায়ের সঙ্গে বেশ প্রাণ খুলে গল্প হত। মা মারা যাওয়ার পর, কথা বলার মানুষটা চলে গেল, সরকার আরও একা, চুপচাপ হয়ে গেছে।

দু' মেয়ের বিয়ের পর, ছেলের বউ আর নাতিনাতনিদের মুখ দেখার জন্যে মা ভারী ব্যস্ত হয়েছিল। গোড়ায় সরাসরি বলত, এবার তোর বিয়ে দেবো, মেয়ে দেখছি।

খাওয়াবো কী, প্রশ্ন করতো সরকার।

আমাদের একমুঠো জুটলে ঘরের বউ, ছেলেমেয়েদেরও জুটবে, মা বলত।

হেসে মায়ের কথা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে সরকার বলত, আমাকে কেউ বিয়ে করবে না।

কেন?

আমার মাথায় অ্যাতো বড় টাক, দাতে পায়োরিয়া...

যতো সব বাজে কথা, চটে গিয়ে মা বলত, মেয়ে আমি ঠিক করব।

একবার মায়ের চাপাচাপিতে সরকার একটা মেয়ে দেখতে গেল। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার, দু'ঘরের ছোট বাসা। বাইরের ঘরে মেয়ের বাবা, মা, দাদা, বোনেদের সঙ্গে মাকে নিয়ে সরকার বসেছিল। পাশের ঘরে দিদির সঙ্গে মেয়ে, তখনও সাজ শেষ হয়নি, দিদি সাজাচ্ছে। খুব বিরক্ত আর বিব্রত হচ্ছিল সরকার। হঠাৎ সরকার বলল, আমার একটা কথা আছে।

পাত্রীর বাবা তটস্থ হয়ে জানতে চাইল, কী কথা?

অ্যাতো সাজগোজের দরকার নেই, সরকার বলেছিল, যদি অনুমতি দেন, মেয়ের সঙ্গে আমি একা দু' মিনিট কথা বলব।

পাত্রীপক্ষ খুব অবাক হলেও রাজী হয়েছিল। পাশের ঘরে ঢুকে সরকার দেখল, দিদি খুব পরিপাটি করে বোনের খোঁপা বাঁধছে। বাড়ির একজন ঘর

থেকে দিদিকে বাইরে ডেকে নিয়ে যেতেই নিজের ঠিকানা লেখা একটা পোস্টকার্ড মেয়ের হাতে দিয়ে সরকার বলল, আমার বয়স আটত্রিশ, আমি খুব গরিব, দুশো টাকা মাইনের চাকুরে, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, মাথায় টাক তো দেখতেই পাচ্ছেন, দাঁতে পায়োরিয়া, সেটা দেখা না গেলেও এমন দুর্গন্ধ যে বন্ধুরা কেউ আমার সঙ্গে মেশে না, এসব শুনেও যদি আমাকে বিয়ে করতে আপনি রাজী থাকেন, তাহালে আমার ঠিকানা লেখা ওই পোস্টকার্ডে শুধু হ্যাঁ লিখে পাঠিয়ে দেবেন। রাজী না থাকলে, শুধু না লিখবেন।

দু মিনিটের আগেই কথা শেষ করে পাশের ঘরে এসে মাকে বলেছিল, চলো, হয়ে গেছে।

মেয়ের বাড়ির লোকেরা হাঁ হাঁ করে উঠেছিল, একটু চা, মিষ্টি, জল, গৃহস্থের অকল্যাণ ..

কোনো কথা কানে না তুলে মাকে নিয়ে সরকার রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল।
মা হতবাক। বাসে ওঠার আগে ছেলেকে প্রশ্ন করেছিল, কী ব্যাপার ?
পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই জানতে পারবে, গম্ভীরমুখে সরকার বলেছিল।

ঠিক তাই। পাঁচ দিনের মাথায় হ্যাঁ লেখা পোস্টকার্ড ফিরে এসেছিল। পোস্টকার্ড পেয়ে মহা ফাঁপরে পড়েছিল সরকার। কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা, পিছিয়ে যেতে পারেনি। তারপর ফের কথা, যোগাযোগ, বিয়ের দিন পাকা হয়েছিল একমাস পরে। কিন্তু বিয়ে হল না। বিয়ের দিন পনেরো আগে খবর এলো মেয়ের জণ্ডিস, হপ্তা না ঘুরতেই মেয়েটি মারা গেল। খবরটা শুনে সরকার গুম হয়ে গিয়েছিল, মনে হযেছিল, মেয়েটি ভারী ভাগ্যবতী। এমন সরকারের নিজেকেও ভাগ্যবান মনে হয়। তার পরেও বিয়ের জন্যে মাঝে মাঝে মা ঘ্যানঘ্যান করত। বলত, আমি বুড়ো হয়েছি. আর পারি না ।

দুই বোন আর ভগ্নীপতিও বেশ কয়েকবার বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু সরকার সেই যে বেঁকে বসল, আর বিয়ে করল না।

অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে সরকার নিজের মনে বলত, খুব বেঁচে গেছি. আমি নারীবিদ্বেষী নই, বিয়ের বিরোধীও না, কিন্তু ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনিদের জন্যে কী রেখে যাব ? আরো কিছু দুঃখী, অসহায় মানুষকে পৃথিবীতে টেনে এনে কী লাভ ? একদিন হয়েতো মানুষের এতো দুঃখ, কষ্ট, অসহায়তা থাকবে না, সুখ, শান্তিতে ঝলমল করবে পৃথিবী, সংসার, সেটা হবেই, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি নয়, এখনো সামনে দীর্ঘ, অন্ধকার পথ, সব জেনে আমি এমন ঘোর অন্যায় কেন করব ? এটা নিষ্ঠুরতা, পাপ।

সরকার দেখল, সামনে ইট তৈরির নরম মাটির স্তূপটা প্রায় শেষ, আবার মাটি আনতে হবে।

এখনো দশ পনেরোটা ইটের মাটি আছে। আজ বেশ ভালই, প্রায় শ' তিনেক ইট বানিয়েছে।* পেছন থেকে কে যেন ডাকল, সরকার ?

ফর্মা থেকে চোখ তুলে সরকার দেখল, পরিমল রায় আর দিবাকর সামন্ত পিছনে দাঁড়িয়ে পরিমলের পোশাক, পাটভাঙা ধুতি, ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি, সামন্ত পরেছে ট্রাউজার্স আর বুশশার্ট। পরিমল আর দিবাকর দুজনেই সরকারের সহকর্মী, সমবয়সী, দু'এক বছর আগে পরে অবসর নিয়েছে। এখানে রাস্তার ওপর দিবাকর আর পরিমলের মুখোমুখি বাড়ি। শেষ বিকেলে ওরা দুই বন্ধু রোজ নদীর ধারে হাওয়া খেতে আসে। কখ-ও সখনও সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে মামুলি গল্পগুজব করে।

পরিমল প্রশ্ন করল, কাজ কতদূর ?

সরকার কোনো জবাব দিল না।

দিবাকর বলল, এভাবে এগোলে নিজের বাড়িতে আর তোমায় বাস করতে হবে না।

এখনও ভিত হলো না, পরিমল বলল, সেটাও কী তুমি নিজে গাঁথবে ?

হ্যাঁ, সরকার বলল।

মরে যাবে, সামন্ত মন্তব্য করল।

সরকার চুপ। পরিমল আর সামন্ত আরো দু'তিন মিনিট দাঁড়িয়ে কয়েকটা ফুট কেটে নদীর দিকে এগিয়ে গেল। গোটা নদী জুড়ে তখন ঘন ছায়া, বাতাস হঠাৎ শীতল, মন্থর হয়ে উঠেছে। এক পলক দুই সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে সরকার উঠে দাঁড়াল। ব্যথায় টনটন করছে শরীর, দু চোখ ঝাপসা, কানা বেড়ালটাকে সরকার বলল, একটা কিছু গড়তে গেলে কষ্ট তো হবেই। সহজে যা পাওয়া যায়, তার দাম কম, বেশি দিন টেঁকে না, দুঃখ, কষ্টের মধ্যে দিয়ে যা হয়, তা বহুকাল থাকে। যেখানে শ্রম নেই, দুঃখ নেই, সেখানে যা হয়, তার বেশীটাই গলদ আর গোঁজামিলে ভর্তি।

মেটে সাপটা পায়ের পাশ দিয়ে সরসর করে চলে গেল। তার দিকে তাকিয়ে সরকার বলল, আমি যে কাজে ফাঁকি বা গোঁজামিল দিই নি, তোরা দু'জন তার সাক্ষী।

নদীর তীরে দাঁড়িয়ে পরিমল হা হা করে হাসছে। সামন্ত হাত পা নেড়ে কি যেন বোঝাচ্ছে পরিমলকে।

অনেককাল আগের একটা ঘটনা সরকারের মনে পড়ল। অফিসে তখন পরিমল আর সামন্তের মধ্যে কথা বন্ধ, একই ঘরে মুখোমুখি ওদের টেবিল, দুজনে দুটো আলাদা ইউনিয়নের নেতা, তাই বাক্যালাপ নেই। পরিমল আর সামন্তকে ঘিরে অফিসে সব সময়ই একদল সহকর্মীর ভীড় হতো। তাদের মধ্যেও সম্পর্ক ভাল ছিল না। সরকার বসত পরিমল আর সামন্তের মাঝখানে

অন্য একটা টেবিলে। দু'পাশের আলোচনাই সরকারের কানে যেত। পরিমল যখন রাজনীতি নিয়ে কথা বলত, সামন্ত তখন আলোচনা করত ধর্ম নিয়ে। আবার সামন্তর টেবিলে যখন রাজনীতির কথাবার্তা তুঙ্গে, নিজের লোকজনের সঙ্গে পরিমল তখন ছায়াছবির আলোচনা জুড়ে দিয়েছে। দাঁতে দাঁত দিয়ে পরস্পরের বিরোধিতা করার জন্যেই যেন ওরা অফিসে আসতো। বেশ কয়েকবছর এটা চলেছিল। একদিন হঠাৎ দেখা গেল অফিস ক্যান্টিনের উত্তর দিকের বারান্দায় রেলিং-এ ভর দিয়ে পরিমল আর সামন্ত খুব ঘনিষ্ঠভাবে নিচু গলায় কী যেন আলোচনা করছে। প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেল, আলোচনা শেষ হলো না। দু'তরফের অনুগামীরা অবাক, সরকারও কম অবাক হয়নি। রাজনীতি, দর্শন ছায়াছবি নিয়ে কোনো আলোচনা সেদিন জমলো না।

তারপর রোজ একই ঘটনা, টিফিনের পরেই পরিমল আর সামন্ত বারান্দায় দুটো চেয়ারে পাশাপাশি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফিসফিস কথা, ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারল না। দু'জনের কেউই, চেলাদের তেমন আমল দিচ্ছে না। বেশ কিছুদিন দারুণ মনমরা হয়ে থাকল চেলারা। পরিমল আর সামন্তর কিছু কথা এক দুপুরে খানিকটা শুনে সরকারের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল রহস্যটা। কাছাকাছি কোনো একটা জায়গায় দু'জনেই জমি কিনেছে, এখন বাড়ি বানাবে। লোহা, সিমেণ্ট, ইট, চুন, সুরকি, কতোটা লাগবে, কোথায় দাম সস্তা, মগরা থেকে বালি আনালে খরচ কম, না রেলের সাইডিং থেকে নিলে সাশ্রয়, এইসব বিষয়েই খুব নিবিষ্ট হয়ে কথা বলছিল দু'জনে। পাশের টেবিলে সরকার যে চা খাচ্ছে, এটা দেখেও ওরা আমল দেয়নি। শুধু ওরা নয়, অফিসের প্রায় সকলেই ভাবতো সরকার ছিটিয়াল, মেণ্টাল কেস. কেউই আমল দিত না সরকারকে। ওদের আলোচনার কথা সরকারও তাই বলেনি কাউকে।

কানা বেড়াল আর মেটে সাপটা গায়ে গা লাগিয়ে ঝুপড়ির মুখে শুয়ে আছে। তাদের দিকে তাকিয়ে সরকার বলল, মানুষ এমনিতে খারাপ নয়, নানা ফেরে কিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলে। আসলে, মানুষকে আরো সহজ সরল, নদীর এই স্রোতের মতো, সন্ধ্যের ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ার মতো হতে হবে। এই স্রোত, বাতাস, এরা ভারী সরল, নিরীহ, মানুষকে সবসময় বলছে, সহজ হও, সরল হও, মা গৃধ, লোভ কোরো না, তোমাদের সব দরকারে আমরা আছি, আমাদের ভুলে যেও না।

সন্ধ্যের ঠিক পরেই কাঠকুটোর একটা বড়ো বোঝা মাথায় নিয়ে সরকার জঙ্গল থেকে ফিরল। বিকেল শেষ হবার আগেই আকাশে মেঘ জমেছিল। ঝুপড়ির সামনে বোঝা নামিয়ে সরকার মিনিট দুই তিন জিরোবার পরেই আকাশ কালো করে তুমুল ঝড় উঠল। খড়ের পলকা একচালাটা দামাল হাওয়ায় থরথর করে কাঁপছে। সামনে রাখা শুকনো কাঠের স্তূপ থেকে

কয়েকটা টুকরো হাওয়ায় উড়ে যেতে সেটার ওপর সরকার ঝাঁপিয়ে পড়ল। সারা সন্ধে বনবাদাড় হাতড়ে সংগ্রহ করা এই কাঠ, খুবই মূল্যবান, হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে, সেটা হয় না। বুক দিয়ে আগলে রাখতে হবে। ঝড়ে জ্বালানি উড়ে গেলে কাল নতুন ভাটি জ্বলবে না। কাঠের বোঝাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সরকার বলল, তা হবে না, ঝড়ের জোর আমার চেয়ে বেশী, কিন্তু আমারও একটা জোর আছে। একটা কুটোও আমি উড়ে যেতে দেবো না।

একচালায় মডমড় আওয়াজ, এখনি যেন ওটা মুখ থুবড়ে পডবে। বিকট শব্দে একটা বাজ ভেঙে পডল নদীতে, আলোর তীক্ষ্ণ, তির্যক একটা রেখা জল থেকে আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠল। কাল সকালেই ভিত খোঁড়ার কাজ শুরু হবে। ঝুপড়ির ভেতর কোদাল, শাবল, ঝুড়ি, সব জোগাড় আছে। গোটা জনবসতি এখন শব্দহীন, ধুধু ফাঁকা, অন্ধকার নদীর চরে তিনটে প্রাণী জেগে আছে। কাঠের বোঝার ওপর থেকে সরকার দেখল, কানা বেড়ালের একটা চোখে পীতাভ আলো, চোখ জ্বলছে। জলজলে পীতাভ আলোটাকে লক্ষ্য করে সরকার বলল, আমার পরীক্ষা চলছে, সারা জীবন সব মানুষকে এই পরীক্ষা দিতে হয়। রোদ, ঝড়, বজ্র, বৃষ্টি, এরা সকলেই পরীক্ষক, বারবার মানুষকে পরীক্ষা করে, কিন্তু এরা মানুষের বন্ধু, শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ ছাত্রটিকে বাজিয়ে বেছে নেয়, বলে, সাহসী হও, লড়াই দাও, লড়াই না করে জিতবে কেন? সে জেতায় আনন্দ নেই।

সরকার নিজের মনেই সংলাপ সাজায়, ঠিক কথা, অনায়াসে কোনোদিন আমি কিছু পেতে চাইনি। আজও চাই না।

গ্রীষ্মের পর বর্ষার মাঝামাঝি একচালাটার পাশে ইটের চারটে দেওয়াল দেখা গেল। চারটেই অসম্পূর্ণ, আধখানা গাঁথা হয়েছে। দারুণ বর্ষা, ঝুপড়ির মধ্যে সরকার, পাশে দুই পোষ্য, তিনজনেই হাতমুখ গুঁজে বসে আছে। কাজ এগোচ্ছে না, দারুণ অস্বস্তিতে সরকার ছটফট করে। কানা বেড়ালটাকে লক্ষ্য করে বলে, মানুষের পরমায়ু বড়ো কম, হাতের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। সারা জীবনে অন্তত একটা কাজ মানুষকে শেষ করতে হয়। আমারও কাজ এই বাড়িটা করা, এটা শেষ না করে আমি মরবো না।

ঘসা কাচের মতো থমথমে ধূসর আকাশ। গত তিনদিন, একটানা, দিগন্ত কাঁপিয়ে বৃষ্টির পর আজ একটু ধরেছে। কিন্তু আকাশের চেহারা ভালো নয়, যে কোনো মুহূর্তে ফের ভেঙে পড়বে। কানায় কানায় নদী, ঘোলা জলের স্রোত ফুলে ফেঁপে উঠছে। সরকার বলল, বৃষ্টি বাদলও দরকার, মাটি নরম হবে, চাষ আবাদ হবে, সবই ঠিক, কিন্তু আমি যে ডুবে যাচ্ছি। আরো পাঁচ,

সাত হাজার ইট না গড়লে পাঁচিল চারটে পুরোপুরি গাঁথা হবে না। রোদ না উঠলে আমি কাজে লাগবো কী করে?

সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে কানা বেড়ালটা হাই তুলল। উনুনের ধারে শুয়ে মেটে সাপটা ঘুমোচ্ছে।

এ বছর বৃষ্টিও হচ্ছে খুব বেশী, সরকার বিড়বিড় করল, আমাকে ভাসাবার জন্যেই হয়তো এই ঘোর বর্ষা। কিন্তু এভাবে কী আমাকে ভাসানো যাবে? ছেলেবেলায় পদ্মার ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছিল আমার পৈতৃক ভিটে, তবু আমি মরি নি। কতো বন্যা, খরা, মহামারী হলো, সব হজম করেও আমি বেঁচে আছি। কীভাবে বাঁচলুম? সবটা পরীক্ষা, প্রকৃতির পরীক্ষা। মানুষ দুঃখী, অসহায়, কিন্তু পরীক্ষায় মানুষই জেতে, মরে না। কারণ, মানুষ গড়তে চায়, তার এই আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নের জোর, মৃত্যুর চেয়ে ঢের বেশী।

আকাশের অনেক গভীরে বাজ ডাকল গুড়গুড় করে। কানা বেড়ালটা সেই শব্দে ভয়ে কেঁপে উঠতে তাকে বুকে তুলে নিল সরকার। নদীর চর থেকে এখনই ইটের মাটি আনা দরকার। ঘরে বসেও দু'দশ পিস ইট রোজ তৈরী হচ্ছে। একটা চটের থলিতে কানা বেড়াল আর মেটে সাপকে পুরে সরকার ঝুপড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। বৃষ্টির জন্যে এই দুটো অবোধ প্রাণী গত চারদিন ঘরে বন্দী, কোথাও বেরোতে পারেনি। খোলা আকাশের নিচে আলো হাওয়ায় ওরা একটু খেলে বেড়াতে চায়। গত দু'বছর, হপ্তায় অন্তত একদিন, পোষা প্রাণী দুটোকে চটের থলিতে ভরে, সন্ধের পর নদীর ধারে অথবা জঙ্গলে সরকার বেড়াতে নিয়ে গেছে। বেড়াতে পেলে ওরাও খুব খুশী হয়, চটের থলির মধ্যে দুটিতে ঘেঁষাঘেঁষি বসে, গায়ে গা, জুলজুল চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একচালার বাইরে জলে ভেজা পৃথিবী, আকাশ, গাছপালা, আবছা, ধোঁয়াটে, মাটি আর বনজ গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। চারটে অসম্পূর্ণ পাঁচিলের দিকে সরকার অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। তৃপ্তিতে বুক ভরে যায়। নিজের হাতে এ বাড়ির ভিত আর এই অসম্পূর্ণ চারটে দেওয়াল সে গেঁথেছে। আগামী বছরের মধ্যেই দেওয়াল চারটে পুরো তৈরী হয়ে যাবে। তারপর পুব, দক্ষিণে জানলা আর পশ্চিমে দরজা বসাবে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে সামনে এক চিলতে জমি, ফুলের বাগান, আর সব্জির ক্ষেত হবে। বিকেল ফুরোবার আগেই দরজার বাইরে বকের ওপর জলচৌকিতে এসে বসবে। শেষ বিকেলের আলোয় আকাশ, নদী আর নিজের জমির চাষবাসের দিকে তাকিয়ে থাকার কথা ভেবে সরকারের শরীর শিহরন ওঠে।

কাজ শেষ হতে সময় লাগছে, আপন মনে সরকার বলল, সে তো লাগবেই, একা হাতের কাজ, তাছাড়া যে কোনো জিনিস বানাতেই সময় লাগে। এটাও গড়ে তোলার একটা নিয়ম। চোখের পলকে, চটপট যা গড়ে ওঠে, মানুষ

তাকে ভালো চোখে দেখে না, সন্দেহ করে। সে গড়ায় মানুষের গৌরব নেই, মহত্ত্ব বাড়ে না। এ পাড়ার সবকটা বড়ো বাড়ি খুব তাড়াতাড়ি গজিয়ে উঠল, দেখতে ঝকঝকে, চমৎকার, আধুনিক, কিন্তু তাতে কী আসে যায়? পায়ে হেঁটে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার গৌরব, হেলিকপ্টার থেকে টুপ করে শিখরে নেমে পড়ার চেয়ে অনেক বেশী। ওই বড়ো বাড়িগুলোর শরীরে মানুষের দেহের গন্ধ, তাপ, কিছুই নেই।

থলির ভেতরের জীব দুটোকে লক্ষ্য করে নানা কথা বলতে বলতে সরকার নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। বর্ষার নদী, দু'কূল ভাসিয়ে হুহু করে ছুটে চলেছে। জলে ভাসছে গাছের ডাল, পাতা, আরো নানা জিনিস। খেপা নদী ভাঙছে, গড়ছে। ঠাণ্ডা বাতাস। অবিরল জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে সরকার চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

নদীর চরে, সেই নতুন জনপদের ওপর দিয়ে আরো তিনটে ঋতু চলে গেল। তখন বসন্তকাল, দক্ষিণের হাওয়ায় পৃথিবীর চেহারা বদলে গেছে, গাছে গাছে নতুন পাতা। অদূরে বনভূমির আকাশ কৃষ্ণচূড়া আর পলাশে টকটকে লাল। গতকাল সরকারের বাড়ির কাজ মোটামুটি শেষ হয়েছে, যেটুকু বাকি, ধীরে ধীরে শেষ হবে, সময় লাগবে। এক কামরার ছিমছাম, ছোট বাড়ি, স্বয়ংসম্পূর্ণ, সামনে তিন ফুট চওড়া, বেশ লম্বা একটা বারান্দা, তারপর বাগান, বাগান এখনও ফাঁকা, বারান্দার ছাতও আঢাকা, বাঁশের ফ্রেমে টালি লাগানো হয়নি, ফ্রেমের চৌকো ঘরগুলো হা করে আছে। আগামী বর্ষার আগেই বারান্দা ঢাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিকেল শেষ হয়েছে। বাগানে দাঁড়িয়ে বাড়িটা দেখে সরকারের কিছুতেই আশ মিটছিল না। বাড়ি নয়, যেন এক রূপবতী নারী, আকাশ থেকে নেমে এসেছে। সদরের সামনে কানা বেড়াল আর মেটে সাপটা পাশাপাশি শুয়ে আছে। আজ পূর্ণিমা, একটু পরে চাঁদ উঠবে। দিন কয়েক আগে, সরকার তখন ঘরের ছাতে টালি লাগাচ্ছিল, বাগানে পরিমল আর সামন্ত দাঁড়িয়ে, পরিমল বলল, সামনে পূর্ণিমা, খুব ঘটা করে ঐদিন গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠানটা করো।

ঘরের ছাতে বসে, সারা দুপুর রোদে পুড়ে পঁয়ষট্টি বছরের মানুষটার দু চোখ তখন ধাঁধিয়ে আছে, তবু সে বলল, কী করতে হবে?

বিশেষ কিছু নয়, সামন্ত জবাব দিল, একজন পুরুত ডেকে হোম, যজ্ঞ, গীতা পাঠ, পড়শীদের জলযোগ...।

একটু ভেবে সরকার বলল, পুজোটুজো নয়, ওই দিন সন্ধেতে আপনারা দুজন আসবেন, আপনাদের নেমন্তন্ন রইল।

আমরা কি নিজেরা খাবো বলে বললুম, সামন্ত খেঁকিয়ে উঠেছিল।

ছি ছি, সংকোচে এতোটুকু হয়ে গিয়ে সরকার বলেছিল, আমি সে কথা বলিনি। আপনারা আমার সহকর্মী, আপনারা এলে... ।

সরকার কথা শেষ করার আগেই পরিমল দেখতে পেয়েছিল মেটে সাপটাকে॥ এক লাফে দু'পা পিছিয়ে সামন্তকে বলেছিল, চলো যাই।

পরিমল আর সামন্ত আসবে কি না বুঝতে না পারলেও তাদের জন্যে সরকার আজ জলযোগের আয়োজন করেছে। খুবই সামান্য আয়োজন, দুধ, খই, মুড়কি, বাতাসা আর কলা। ঘরে সব রাখা আছে। সরকারের মনের মধ্যে এখন পুলকের ঢেউ, ছলাৎ ছল শব্দ। আমি পেরেছি, আমি পেরেছি। মানুষ পারে.... ।

বাড়ির চারপাশে ঘুরে, আরো কি কি কাজ বাকি সরকার হিসেব করছে। বারান্দার ছাদে টালি ছাড়াও দরজা আর দুটো জানলার পাল্লা বর্ষার আগেই লাগাতে হবে। কাঠ যোগাড় হয়েছে, একটা করাত আর কয়েকটা কব্জা কিনলেই দরজা, জানলা হয়ে যাবে। তারপর আনবে ইলেকট্রিক লাইন, অন্তত একটা আলো. না জ্বললে ঘরের জৌলুস ফুটবে কী করে? খরচ যাই হোক, একটা আলো চাই। তারপর আছে বাগান। বর্ষার আগেই বেল, জুঁই, দোপাটি আর গোলাপ ফুটবে। কিছু শাকসব্জির জায়গাও করতে হবে।

বাড়ি সাজানোর চিন্তা, এক অলৌকিক স্বপ্নের মতো মশগুল করে রাখে সরকারকে। দিন শেষ হয়ে কিছু আগে অন্ধকার নেমেছে পৃথিবীতে। আকন্দ গাছের পিছন থেকে ঢাউস একটা চাঁদ আকাশে লাফিয়ে উঠল। নদীর জল, জনবসতি বনভূমি চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। জলের শীতলতা মেখে ছুটে আসছে হুহু ঠাণ্ডা, নিবিড় বাতাস। একটা টগর গাছের পাশে দাঁড়িয়ে সরকার বলল, ভারী চমৎকার জ্যোৎস্না।

তখনই মনে পড়ল, ঘরে একটা বাতি জ্বালানো উচিত। দূর থেকে অন্ধকার ঘর দেখে দুই পুরোনো সহকর্মী হয়তো ফিরে যাবে। ঘরে বাতি আছে কী? জোরালো কাশির হিক্কা, খানিকটা কফ উঠলো বুক থেকে। মুখ থেকে কফের দলা মাটিতে ফেলে সরকার দেখল, সবটাই লাল, ঘন থকথকে রক্ত। অসম্ভব রকম অবাক হলো সরকার। আবার একদমক কাশির সঙ্গে এক পশলা রক্ত বেরোল। চল্লিশ বছর আগের সেই রোগটা ফিরে এলো নাকি, সরকার ভাবল।

চাঁদের আলোয় কোমল, নরম সামনের বেলেমাটি অনেকটা লাল, ভ্রূ কুঁচকে সেদিকে একপলক তাকিয়ে সরকার নিজের মনে বলল, এখন রক্ত পড়লে আমার আর কিছু যায় আসে না। আর সামান্য কাজ বাকি, মাস দুয়েক সময় পেলে শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু সেটুকু না হলেও মূল কাজ শেষ। একটা বড়ো

কাজের পর মানুষের মরতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। তাছাড়া মৃত্যুরও তো একটা সম্মান আছে। কতোদিন তাকে বাইরে দাঁড করিয়ে রাখা যায়। সে দিকটাও মানুষকে দেখতে হবে। জীবন মূল্যবান, মৃত্যুও সম্মানীয়। যার যা সম্মান, তা আমি মিটিয়ে দেবো।

ধীর পায়ে বারান্দায় এসে সরকার দেখল, কী আশ্চর্য, চাঁদ যেন কখন বারান্দার ঠিক মাথার ওপরে ভেসে এসেছে, ন্যাড়া বারান্দায় লুটিয়ে আছে কাশফুলের মতো একরাশ জ্যোৎস্না। শুধু বারান্দা নয়, ঘরের মধ্যেও চাঁদের আলো। কী এক গভীর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল সরকারের বুক। পোষা জীবদুটোকে লক্ষ করে সরকার বলল, ছাখ, ঘরে মোমবাতি নেই বলে আকাশ থেকে একটা কতো বড়ো বাতি আমার বারান্দায় নেমে এসেছে। এই আলোটা দেখার জন্যেই আমার এতোকাল লড়াই, বাঁচা।

কথাটা শেষ করার আগেই হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল, সরকারের মনে হলো, পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে, আকাশ থেকে চাঁদটা যেন আরো অনেক নেমে এসেছে। সরকার ধীরে ধীরে রকের ওপর বসল, তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। আরো কয়েক ঝলক রক্ত বেরোল মুখ থেকে। দু'হাতে বাঁধানো রকের মেঝেটা সরকার খামচে ধরার চেষ্টা করল, দুটো পা সামান্য কাঁপল, তারপরেই নিথর, নিস্পন্দ হয়ে গেল সরকারের শরীর। পোষা জীবদুটো কী বুঝল কে জানে। নিমেষহীন চোখে প্রিয় মানুষটার দিকে দু'জনে কয়েক মিনিট তাকিয়ে থাকার পর কানা বেড়ালটা সরকারের পায়ের পাতা ছুঁয়ে বসল আর মেটে সাপটা গিয়ে বসল মাথার পাশে।

রাত বাড়ছে, দুই নিমন্ত্রিতের কেউ এখনো আসেনি। চাঁদের আলোয় মৃত লোকটার মুখ ভারী স্নিগ্ধ, শান্ত দেখাচ্ছে। দুটো মজবুত হাত শরীরের দু'পাশে লুটিয়ে আছে। তারায় ভরা, অবনত, নীল আকাশ যেন মৃতবৎসা মা, দু'হাতে চাঁদের প্রদীপ ধরে নিষ্প্রাণ সন্তানের মাথার কাছে জেগে আছে। নদী থেকে ছুটে আসছে বাতাস, গাছ পাতার মর্মরধ্বনি, এখানে একজন মানুষ ছিল........একজন মানুষ ....।

ইলিশের রাত

ইলিশের দুটো বড়ো টুকরো কড়ার গরম তেলে ছাড়তেই ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে দুবার শব্দ হলো। নিপুণ হাতে খুন্তির ডগা দিয়ে টুকরো দুটো কড়ার দু'পাশে সামান্য সরিয়ে দিলেন আভারাণী। কয়েক সেকেণ্ড যেতেই গঙ্গার টাটকা ইলিশ থেকে হু-হু করে তেল বেরোতে লাগল।

অন্ধকার ঘুপচি রান্নাঘর, খুবই হতশ্রী. বাঁশের বাতায় ঝুল কালি, চুন, সুরকির দেওয়ালে পোঁতা পেরেকে ঝুলঝুলে ন্যাতা, কাঠের পুরোনো দুটো তাকে এ্যালুমিনিয়ম আর কাঁসার কিছু বাসন, বেশীরভাগ ট্যারাবাঁকা, ফুটো, ফাটা। কেরোসিনের ষ্টোভের সামনে একটা ছোট জলচৌকির ওপর একটা কুপি জ্বলছে। বাড়ীর দুটো ঘরে ইলেকট্রিক আলো থাকলেও রান্নাঘরে সে ব্যবস্থা নেই। বিয়ের পর আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেল, কুপির আলোতেই আভারাণী রাতের রান্না সেরেছেন। কুপির শিখাটির দিকে একবার তাকিয়ে সনতের ওপর নজর ফেললেন আভারাণী। রান্নাঘরের বাঁদিকে একটা তাকের তলায়, ওখানটায় বেশ অন্ধকার, হাটু মুড়ে কিম্ভূতের মতো সনৎ মেঝেতে বসে আছে। সনতের সামনে একটা কাঁসার থালা, ঘোলাটে অন্ধকারে শূন্য থালা আর সনতের দুচোখের দৃষ্টি সমান তীব্র, ঝকঝকে আর ধারালো। এই রাত সাড়ে দশটায় বর্ষা বাদল, অন্ধকারে কলোনীর কোথাও কোনো সাড়া নেই। চারপাশ এমন চুপচাপ যে মনে হয়, রাস্তার কুকুরগুলোও ঘুমিয়ে পড়েছে। শব্দহীন, ভিজে রাতের বাতাসে শুধু মাছ ভাজার শব্দ ছ্যাঁক ..কলকল........ ছ্যাঁক।

খুন্তির ডগায় দুটো ভাজা মাছ পর পর তুলে আভারাণী ছেলের থালায় দিলেন। ভাজা মাছের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে চাপা গলায় সনৎ মাকে বলল, বেশী আওয়াজ ক'রো না, রাবণের গুষ্টি জেগে উঠবে।

ছেলের কথা যেন আভারাণীর কানে ঢুকল না। আবার দু'টুকরো মাছ তিনি কড়ায় ছাড়লেন।

রান্নাঘরের পাশে এক চিলতে উঠোন, তারপর গায়ে গায়ে লাগানো দুটো ঘর। একটায় তক্তাপোষের ওপর সনতের বাবা শোয়, মেঝেতে আভারাণী আর দুই মেয়ের বিছানা। পাশের ঘরে থাকে সনৎ এবং তারই দুই ছোট ভাই, সুকুমার আর সন্দীপ। স্কুল মাষ্টার সনতের একার আয়ে জীর্ণ, আধমরা সংসার ধুঁকতে ধুঁকতে চললেও কোথায় যে চলেছে, বলা খুব শক্ত।

সংসার যেখানেই যাক, তার চাকায় তেল দেওয়ার জন্য হপ্তায় ছ'দিন সনৎকে গঙ্গা পেরিয়ে সালকিয়া যেতে হয়। সেখানেই একটা স্কুলে সনৎ পড়ায়।

চোখের পলকে দুটো মাছভাজা সাবাড় করে সনৎ এখন আঙুল চাটছে। আঙুলে লাগা মাছের তেল আর গুঁড়ো চাটতে চাটতে আর একজোড়া গরম মাছ ভাজার জন্যে সে অপেক্ষা করছে। কড়া, খুন্তি আর গরম তেলে ঠুং ঠাং কুলকুল আওয়াজ।

কড়া করে ভাজা মাছের টুকরো দুটো পাতে পড়ার পর সনৎ বলল, আস্তে, বেজায় শব্দ হচ্ছে।

বিষণ্ণ ঘুম জড়ানো গলায় অভারাণী বললেন, আমি আর পারি না বাপু!

সনৎ বলল, ডিমটা এবার ভেজে ফেল। এক বিঘৎ লম্বা একজোড়া ইলিশের ডিম আভারাণীর হাত ঘুরে তেলের কড়ায় পড়ার আগে লোলুপ চোখে সনৎ একবার দেখে নিল। আহা, কী সরেস চেহারা! অনেকদিন পরে একটা আস্তো ইলিশ আজ ও একা খাবার সুযোগ পেয়েছে। এমন সুযোগ জীবনে বেশী আসে না।

স্কুলের ছুটির পর হাজা, মজা, কাদা প্যাচপেচে সালকিয়ার রাস্তা ধরে বাঁধাঘাট থেকে লঞ্চ ধরার আগে রোজকার মতো আজও নফর কুণ্ডুর চায়ের দোকানে এককাপ চা খাওয়ার জন্যে সনৎ ঢুকেছিল। বাইরে জোর বর্ষা, সকাল থেকে মুষলধারে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, তখনও থামেনি, ঝিপঝিপ করে পড়েই চলেছে। একটা বিস্কুট আর এক কাপ চা নিয়ে বসতে নফর বলল, আজ গঙ্গায় বিস্তর ইলিশ উঠেছে। পরাণজেলে এক ঝাঁকা মাছ আমার দোকানে রেখে বরফ আনতে গেছে। আমি নিয়েছি একজোড়া, আপনিও একটা নিয়ে যান'। দাম বেশ সস্তা!

পকেটে দেড় দু'টাকার বেশী নেই জেনেও সনৎ প্রশ্ন করেছিল, মাছের ঝাঁকাটা কোথায়?

দোকানের পেছনের ঘরে দাঁড়িয়ে, চটের ঢাকা তুলে ঝাঁকাটার ওপর দৃষ্টি রেখে সনৎ কেমন অভিভূত হয়ে গেল। কী রং আর চাকচিক্য, যেন ঢালাই রূপোর মোটা পাত, সুগন্ধে ম'ম করছে ঘরের বাতাস। ঝাঁকার মধ্যে প্রায় দু'ডজন মাছ, সবচেয়ে ছোটটার ওজনও দেড় কেজির কম নয়। এমন একটা মাছ বহুকাল সে তারিয়ে তারিয়ে খায় নি। অথচ খেতে যে তার কী ভালোই লাগে! নেমন্তন্ন বাড়ীতে আজও সে খেতে বসলে হৈহৈ পড়ে যায়। এক, দেড় কেজি মাংস, পঁচিশ, ত্রিশ, পিস্ মাছ, এক হাঁড়ি দৈ, চার পাঁচ গণ্ডা সন্দেশ, রসগোল্লা অবলীলায় সে খেয়ে ফেলে। বছরখানেক আগে এক সন্ধ্যেতে, পর পর তিনটে বাড়ীতে সনৎ নেমন্তন্ন খেয়েছিল। আত্মীয়, বন্ধু মিলে একদিনে যদি তিনজনেরই বিয়ে বা বৌভাত পড়ে যায়, এবং তিনজনেই যখন সমান

ঘনিষ্ঠ, তখন কাকে রেখে কাকে ছাড়বে! অবশ্য তিন জায়গায় খেয়েও সনতের কোনো কষ্ট বা রোগটোগ হয়নি।

তিন চার বছর আগে এক বন্ধুর বৌভাতে কেলেঙ্কারি হয়েছিল। গোটা ব্যাচ খেয়ে উঠে পরার পরেও সনতের পাতে তখনো একগাদা সন্দেশ, রসগোল্লা, সামনে দৈ-এর হাঁড়ি, তার খাওয়া দেখতে ভীড় জমে গিয়েছিল। সকলের সামনে সেই বন্ধুর ক্ষিপ্ত ছোট কাকা বকরাক্ষস বলে গাল দিয়েছিল সনৎকে। খুব লজ্জা পেয়েছিল সনৎ।

ইলিশ মাছের ঝাঁকার দিকে সনৎকে তাকিয়ে থাকতে দেখে নফর কুণ্ডু আবার বলেছিল, একটা নিয়ে যান মাষ্টারমশাই, এমন জিনিস আপনাদের কলকাতায় পাবেন না।

নফর কুণ্ডুর কথা যে ষোলআনা সত্যি, এটা সনৎ বুঝেছিল। খুব বেশী হলে তিন চার ঘণ্টা আগে মাছগুলো ধরা হয়েছে। কিন্তু সব বুঝেও সনৎ চুপ, বিহ্বল চোখে নফরের দিকে তাকিয়ে সে কিছু বলতে যেতে নফর বলল, দাঁড়ান, আমি বেছে দিচ্ছি।

ঝাঁকার ভেতর থেকে কেজি দেড়েকের একটা মাছ খুঁজে বার করে নফর বলল, একেবারে সেরা মাছ, ওজনটোজনের দরকার নেই, পঁচিশ টাকা আমাকে দিয়ে দেবেন, আমি পরাণকে দিয়ে দেবো।

সনৎ এতোক্ষণে নিজের অসহায়তার কথা প্রকাশ করল। বলল, এখন তো আমার সঙ্গে টাকা নেই কুণ্ডুমশাই।

নফর কথাটা যেন গায়েই মাখল না। বলল, কাল, পরশু বা সামনের মাসে দিয়ে দেবেন।

সনৎ দ্বিতীয়বার ভাবল না, বলল, ঠিক আছে।

নিজেরই একটা চটের ব্যাগে মাছটা ভরে নফর দিয়েছিল সনৎকে। তাকে কেন যে নফর এতো খাতির করছে, কারণটা কী, বুঝতে সনতের অসুবিধে হয়নি। নফরের ছেলে, কীর্তিমান কুণ্ডু, সনতের স্কুলের ক্লাস সিক্সের ছাত্র। সিক্সের ক্লাসটিচার হলো সনৎ, সামনে পরীক্ষা, সুতরাং..। সব জেনে বুঝেও চটের থলিটা নিয়ে সনৎ লঞ্চে এসে উঠেছিল। স্যাঁতসেঁতে, সিক্ত, মেঘলা বিকেলটা হঠাৎ বড়ো মায়াবী লাগল সনতের চোখে। লঞ্চের চাকার শব্দ, ভরা গঙ্গায় ঘোলা জলের ছলাৎছল ঢেউ, ধূসর দিগন্তরেখায় দুপাশের শহর, গঙ্গার বাঁক, সবকিছুই যেন অপরূপ, বারবার দেখেও আশ মেটে না। মনমরা, ফ্যাকাসে বিকেলটার আকাশ, বাতাস, পরিবেশকে একটা ইলিশ বদলে দিয়েছে। আজ কয়েক বছর ধরেই নানা সময়ে, বাজারে দুশো চুনো বা চিংড়ি কিনে বা কোনো বড়ো লোকের বাড়ীর রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা রান্নার দমকা সুঘ্রাণে কিংবা কারো হাতে দড়িতে বাঁধা জোড়া ইলিশ

দেখে, একটা আস্তো ইলিশ একা খাওয়ার ইচ্ছে সনতের মনে বারবার চাগাড় দিয়েছে। বিয়ে বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে গিয়ে আজকাল সনৎ আর বেশী খেতে ভরসা পায় না। কে যে কী বলে বসবে, ভয় হয়। হোটেল, রেস্টুরেন্টে দমভোর খাওয়ার মতো গাঁটের জোর তার নেই। বাড়ীতে মাকে বাদ দিয়ে তারা পাঁচ ভাইবোন আর বাবা, মোট ছ'জন, যেন ছ'টা বয়লার, দিনরাত দাউ-দাউ জ্বলছে, যা পাচ্ছে গিলে নিচ্ছে, তবু আগুন নিভছে না। সনৎ জানে, শুধু মৃত্যুই এ আগুন নেভাতে পারে।

জেটিতে নেমে বাসষ্ট্যাণ্ডের দিকে যেতে যেতে সনৎ ঠিক করেছিল, রাত দশটার পর, খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ীর সকলে ঘুমোলে, শুধু মা জেগে থাকবে তার খাবার নিয়ে, তখন, পা টিপে টিপে সে বাড়িতে ঢুকবে। বাড়িতে একটা আস্তো ইলিশের আবির্ভাবের খবর মা ছাড়া আর কেউ জানবে না।

ইলিশের ডিমটা খুন্তির ডগা দিয়ে আলতো করে কড়াব তেলে উল্টে দিলেন আভারাণী। তাজা মাছ, তেল বেরিয়ে কড়া ভরে উঠছে। খানিকটা তেল ঢেলে রাখতে হবে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে গুড়গুড় করে বাজ ডাকল। বৃষ্টি এখনো থামে নি। ঠাণ্ডা হাওয়ায় আলোর কম্পিত শিখা, আলো আর কালো শিসের ধোঁয়া, স্পষ্ট আলাদা হয়ে যাচ্ছে। পাশের দুটো ঘরে, একজন বয়স্ক মানুষ, আরো চারজন, সকলেই আভারাণীর খুব আপন, একটু আগে শুকনো রুটি আর আলুবেগুনের তরকারী খেয়ে এখন ঘুমোচ্ছে। বড়ো ছেলের কথামতো মাছ কোটা, ভাজার কাজ নিঃশব্দে করতে হচ্ছে আভারাণীকে। কিন্তু ঘুমের মধ্যে, গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে, ভাজা ইলিশের গন্ধ কি ওদের নাকে ঢুকছে না? মাথা বাদ দিয়ে প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ পিস মাছ, মোটে চারটে ভাজা হয়েছে, এখনো অনেক বাকী। ঘুমন্ত মানুষগুলোর জন্যে একটা করে মোট পাঁচ পিস মাছ রাখলে কেমন হয়। আড়চোখে আভারাণী ছেলের দিকে একবার তাকালেন। রাত দশটার সময় ইলিশ নিয়ে চুপিচুপি চোরের মতো ছেলেকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে অবাক হয়েছিলেন আভারাণী। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করার আগেই সনৎ ফিসফিস করে বলেছিল, চুপ, কোনো কথা নয়, রান্নাঘরে চলো।

অন্ধকারে বসা ছেলের ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে আভারাণী দেখলেন, সনতের পাত খালি, মুড়মুড় করে মাছের পিঠের কাঁটা চিবোচ্ছে সে। ভাঙাচোরা বিবর্ণ চেহারা। কী এক কঠিন অসুখে ছেলেটা যেন ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে আর কিছু নয়, ছেলেটার একটু ভালোমন্দ খাওয়ার সখ। কিন্তু সংসারের এই পরিত্রাহি অবস্থা, ডালভাত ছাড়া কিছু জোটে না। অথচ সকাল থেকে নাজেহাল খাটনি, স্কুলের চাকরি, টিউশনি, টাকা উপায়ের আরো নানা ফিকির। দুই বোন, অনিমা আর প্রতিমার বিয়ে দেওয়ার দায়ও সনতের। আভারাণী জানেন, বোনেদের বিয়ের

জন্যে সংসারকে লুকিয়ে সনৎ কিছু কিছু টাকা জমাচ্ছে। যোগাযোগ করে দু' একটা ছেলেও দেখেছে। এই শ্রাবণে অনিমা বাইশ পেরিয়েছে। প্রতিমার উনিশ হয়েছে ছমাস আগে। আর দুটো ছেলের, অন্ততঃ একজন, সুকুমারের তো পঁচিশ হ'লো, সে কিছু রোজগার করলেও সংসারের সামান্য হিল্লে হতো। কিন্তু গত দু' তিন বছরে সুকুমার কিছুই করে উঠতে পারে নি। না চাকরি, না ব্যবসা, দু' একটা টিউশনি হয়তো করে, কিন্তু সে পয়সার মুখ বাড়ীর কেউ দেখে নি।

আভারাণী দেখলেন, সনতের থালা পরিষ্কার। এক কণা মাছ, মাছের কাঁটা বা তেলের দাগ থালায় নেই, ঝকঝকে পরিষ্কার থালা দেখে মনে হয়, এখনি মেজে আনা হয়েছে। সনৎ নিঃশব্দ, স্থির, তার মুখ, চোখ, কিছুই আভারাণী ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন না।

পঞ্চাশ সালের সেই মহামারি দুর্ভিক্ষের সময় যখন রাস্তায় ভিখিরীর মিছিল, ফ্যান দাও মা কান্না, তখন, বোধহয় আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি, সনতের জন্ম হয়েছিল। বাগবাজারের গলির মধ্যে একটা পুরোনো বাড়ির একতলায়। সেটাই ছিল আভারাণীর বাপের বাড়ি। মায়ের কাছে তখন আভারাণী ছিলেন। শুধু সনৎ নয়, আভারাণীর সব ক'জন ছেলেমেয়েই ও বাড়ীতে জন্মেছে। একতলায়, রাস্তার ধারে আঁতুড়ঘরে, এক দুপুরে, সনৎ তখন চার-দিনের, চারপাশ নিঃশব্দ, নিঝুম, ঘুমন্ত ছেলেকে পাশে রেখে আভারাণী একা বসেছিলেন। কিছু আগে এক বাটি গরম দুধ মা দিয়ে গিয়েছিলেন আভারাণীকে। ঠাণ্ডা করার জন্য দুধ আঢাকা, অপেক্ষা করছিলেন আভারাণী। হঠাৎ জানলার ওপর নজর পড়তে তাঁর শরীর শিউরে উঠেছিল। জানলার লোহার গরাদ ধরে এক হাড়গিলে কঙ্কাল, বছর পঁচিশ, ত্রিশের এক মেয়ে, কোলে একটি বাচ্চা, পাট করা, ময়লা ভিজে গামছার মতো মেয়েটার কাঁধের ওপর বাচ্চাটা লেগে আছে। বাঁহাতে বাচ্চাকে ধরে, ডান হাতে জানলার লোহার গরাদ আঁকড়ে সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি তীব্র চোখে দুধের বাটির দিকে তাকিয়ে আছে। আভারাণী ভয়ে পাথর, চেঁচাতে গিয়ে গলা থেকে আওয়াজ বেরোল না। এক মুহূর্ত বসে, একবার নিজের ছেলে আর একবার সেই মেয়েটার কোলের বাচ্চাটাকে দেখে, বাটির দুধটা জানলার গরাদ দিয়ে মেয়েটার হাতের এ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ান থালায় আভারাণী ঢেলে দিয়েছিলেন। সে হতভাগিনীর তর সইছিল না। দুধ ঢালা শেষ হতেই এ্যালুমিনিয়মের কানাওঠা থালাটা মুখে তুলে চুমুক লাগাল। কোলে, কাঁধে লেপ্টে থাকা ছেলেটা যেন নেই, নিজের সন্তানের কথা সে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু মাত্র একমুহূর্ত। খানিকটা দুধ খেয়েই হঠাৎ থমকে গিয়েছিল সে। ছেলেটাকে কোলে শুইয়ে শরীরে জড়ানো ময়লা কাপড়ের আঁচলখানা দুধে

ভিজিয়ে ছেলেটাকে খাওয়াতে গিয়ে সে ডুকরে উঠল। ঘরের মধ্যে জানলার গরাদের ওপাশে দাঁড়িয়ে আভারাণী দেখছিলেন সব। এক পলক নজর করেই বুঝেছিলেন, বাচ্চাটা মরে গেছে। মাথা ঘুরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতে যেতেও নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন আভারাণী। একটু পরে, উঠে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন, জানলার পাশের গলিটা ফাঁকা, কেউ নেই, শুধু একটা এ্যালুমিনিয়ামের থালায় খানিকটা ওলানি দুধ। আতঙ্কে, ভয়ে আভারাণী থরথর করে কাঁপছিলেন। বড়ো ধূ-ধূ শূন্য হয়ে গিয়েছিল বুকের ভেতরটা। চারদিনের সন্তানকে কাঁথা, বালিশে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরেও সেই ভয়ার্ত শূন্যতাকে তিনি কাটাতে পারছিলেন না। ঘটনাটা যেন সারা জীবনের দুঃস্বপ্ন, বুকে গেঁথে গেছে। জেগে, ঘুমিয়ে, আবছা তন্দ্রার মধ্যে, প্রায়ই ওই দৃশ্যটা, ক্ষিধেতে মরে কাঠ হয়ে যাওয়া একটা বাচ্চাকে বুকে চেপে ধরে এক দুর্ভাগিনী মা ছুটে পালাচ্ছে, আভারাণী দেখতে পান। নিজের ছেলেমেয়েদেরও তখন আভারাণীর কেমন অচেনা লাগে।

ভাজা ডিমটা খুন্তিতে তুলে সনতের ওপর চোখ পড়তেই আতঙ্কে আভারাণীর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠে। সামনে থালা নিয়ে কে বসে আছে ও? ও কী সনৎ অথবা সেই মরা ছেলেটা? আটাশ বছর পরে বর্ষার এই অন্ধকার রাতে এ কার ছায়ামূর্তি? ভোজবাজি অথবা ইলিশের গন্ধে সেই মৃত বাচ্চাটা আবার ফিরে এলো নাকি?

হাত কেঁপে গিয়ে খুন্তির ওপর থেকে ভাজা ডিম আবার কড়ায় পড়ে যেতে দু'এক ফোঁটা গরম তেল ছিটকে উঠল। নিজেকে সামলে সাঁড়াশিতে ধরে কড়াটা স্টোভ থেকে মেঝেতে আভারাণী নামিয়ে নেন। তখনই দরজার কাছে কার যেন ছায়া পড়ে। আভারাণী ভয় পান, সনৎ আঁতকে ওঠে। এতোক্ষণ সে যা আশঙ্কা করছিল, তাই হয়েছে। দরজার চৌকাঠ ধরে রোগা, লম্বা, কঙ্কালসার একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আবছা আলোয় লোকটার শরীর স্পষ্ট দেখা না গেলেও, ঠিকরে বেরিয়ে আসা তার দুচোখের ঘোলাটে মণিতে লোভের চিকুর। একাত্তর বছরের এই লোকটা সনতের বাবা, একটা সামান্য চাকরি থেকে বছর দশ হলো রিটায়ার করেছে। চাকরী জীবনে লোকটার অসুখবিসুখের কামাই ছিল না, কিন্তু অবসর নেওয়ার পর থেকে সে সবের বালাই নেই, একেবারে সুস্থ, নীরোগ। গত দশ বছরে একবারও জ্বর হয় নি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খিদেও অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে।

চৌকাঠের বাইরে সলজ্জ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে লোকটা যখন ভেতরে ঢুকবে কিনা ভাবছে, তখন সনৎ প্রশ্ন করল, এতো রাতে আপনি আবার উঠে এলেন কেন? ইলিশের গন্ধে ঘুম ভেঙ্গে গেল, লোকটা বলল।

মুখের মধ্যে ইলিশের সুস্বাদু ডিম, তবু বাবার কথা শুনে সনতের মুখটা

বিস্বাদ হয়ে গেল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে মনের ছমছমে অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলে আভারাণী বললেন, ভেতরে এসে একটা ভাজা মাছ খাও।

দ্বিতীয়বার বলতে হলো না। লোকটা সুড়ুৎ করে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। তারপর একটা এ্যালুমিনিয়মের বাটি হাতে আভারাণীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বাপের দিকে তাকিয়ে রাগে, বিরক্তিতে সনৎ জ্বলছিল। একটা গোটা ইলিশ খাওয়ার পরিকল্পনা বানচাল হতে বসেছে। একাত্তর বছরের এই হ্যাংলা বুড়োটা, কম করে তিন চার পিস না খেয়ে উঠবে না। কিন্তু নাঃ, এতোগুলো মাছ বাবাকে খাওয়ার সুযোগ সনৎ দেবে না। জোড়া ডিম গপগপ করে খেয়ে ফেলে সে দেখল, তার আগেই বাবার খাওয়া শেষ, সকাতর চোখে কড়ার দিকে তাকিয়ে বাবা বসে আছে। দুটো ভাজা মাছ সনতের থালায় দিয়ে আভারাণী বললেন, পেটিটা তোর বাবাকে দে।

বুড়ো লোকটা জুলজুল করে সনতের থালার দিকে তাকিয়ে আছে। খাওয়া শেষ হলেও বুড়োর মুখের কামাই নেই, পাকলেই চলছে মুখ, চোয়াল থেকে গলা পর্যন্ত নেমে আসা হলুদ কাগজের মতো স্বচ্ছ, ঝুলঝুলে চামড়া, যেন সাপের খোলস, যে কোনো মুহূর্তে খসে পড়বে।

নুন, হলুদ মাখানো মাছের দুটো টুকরো আবার কড়ায় চেপেছে। মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে পেটির বদলে মাছের গাদাটা, ফন্দী করে বাবার বাটিতে সনৎ চালান করে দিল। হতাশায় ঝাঁঝা করছিল তার বুক। তবুও সনৎ ভাবছিল, গাদায় কাঁটা ভর্তি, একটা যদি বাবার গলায় বিঁধে যায়, তাহলে কম্ম শেষ, বুড়োর খাওয়ার সখ, আজ রাতের মতো মিটে যাবে।

দ্রুত হাতে, সনতের সঙ্গে যেন প্রতিযোগিতা, বুড়ো লোকটাও গপগপ করে খাচ্ছে। হতাশ, ক্ষুব্ধ সনৎ বলল, এতো রাতে আপনি আর খাবেন না, শরীর খারাপ করবে।

সনতের দিকে একবার তাকিয়ে বাবা বলল, শরীর আর কী খারাপ হবে? বয়স হয়েছে, মরতে যখন একদিন হবেই, তখন খেয়ে মরাই ভালো।

জবাব শুনে রাগে, ঘেন্নায় সনতের পিত্তি জ্বলে গেলেও সে চুপ করে থাকল।

বাবা বলল, ভারী চমৎকার মাছ। তবে পদ্মার ইলিশের জাত আলাদা। আমরা খেয়েছি চার আনায় চারটে। অবশ্য তখন ভালো চালের মন ছিল পাঁচ সিকে, বিশুদ্ধ গব্যঘৃত, দু'আনা সের।

দরজায় আবার একটা ছায়া এসে দাঁড়াতে সনৎ দেখল সুকুমার। মাছের কড়ায় সুকুমারের চোখ। কারো ডাকের পরোয়া না করেই রান্নাঘরে ঢুকে একটা কলাই-এর থালা মায়ের সামনে বাড়িয়ে দিল সুকুমার। সুকুমার খাওয়া শুরু করতেই আরো একজোড়া মূর্তি, অনিমা আর প্রতিমাকে এবং তাদের পেছনে

ছোটভাই সন্দীপকে রান্নাঘরের সামনে সনৎ দেখতে পেল। বর্ষার রাতে, ইলিশ ভাজার গন্ধে বাড়ীর সকলের ঘুম ভেঙে গেছে। শুধু গন্ধ নয়, খুন্তির ঠুংঠাং, গরম তেলের কলকল শব্দে অন্ধকার গর্ত থেকে উপোসী শিয়ালের মতো পিলপিল করে বাড়ীর মানুষগুলো বেরিয়ে এসেছে। সনতের বুকের মধ্যে এখন সব কিছু হারানোর হায় হায় ধ্বনি, তিক্ত বিদ্বেষ।

রান্নাঘরের মধ্যে এখন ইলিশ খাওয়ার মেলা, সকলের সামনে ভাজা ইলিশ। কুপির কাঁপা কাঁপা আলোয় কারো মুখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও দেওয়াল জুড়ে বড়ো বড়ো হামুখের ভুতুড়ে ছায়া, স্পষ্ট। কী এক পরাজয় আর ব্যর্থতায় বিধ্বস্ত সনৎ ক্লান্ত চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল, মায়ের মুখে অগাধ তৃপ্তি আর প্রশান্তি, স্বামী, ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে এভাবে খাওয়াতে পেরে মায়ের মুখের সব অবসাদ, বিষণ্ণতা মুছে গেছে। আবেগ আর তৃপ্তিতে টলমল করছে মায়ের দুটো চোখ।

সনৎ বলল, মা, তুমি এক পিস খাও।

রক্ষে কর, খুসিতে মুখর হয়ে মা বলল, আমি অনেক খেয়েছি, তাছাড়া রাতে আমি মাছ খাই না।

আজ তোমাকে খেতেই হবে, সনৎ বলল।

বাবা আর ভাই, বোনেদের খাওয়ার প্রতিযোগিতা হঠাৎ থেমে গেছে। বাবা বলল, ছেলেমেয়েরা যখন বলছে খাও এক পিস্।

সনৎ এটাই চাইছিল, মাকে খাইয়ে ভাইবোনদের ঠকাতে চাইছিল সে।

আভারাণী কিন্তু মাছ ছুঁলেন না বললেন, ইলিশের মাথা দিয়ে কাল কচু-শাক রেঁধে একটু খাবো।

মায়ের গলার চাপা বেদনা আর অভিমান আর কেউ টের না পেলেও সনৎ বুঝতে পারল যে, মায়ের কাছে সে ধরা পড়ে গেছে।

সঙ্কোচে, লজ্জায় মায়ের দিকে সনৎ চাইতে পারল না।

অনিমা বলল, এ তোমার ভারী অন্যায় মা, খাওয়ায় তোমার সব-সময়ে অনিচ্ছে........।

তোমরা খেলেই আমার খাওয়া, আভারাণী বললেন।

কিন্তু কী এক জেদ তখন সনৎকে পেয়ে বসেছে। থালায় করে একটা ভাজা পেটি মাকে দিয়ে সনৎ বলল, এটা তোমায় খেতে হবে, এখনি....।

সনতের দিকে এক পলক তাকিয়ে আভারাণী খেতে শুরু করলেন। ইলিশ মাছ নিয়ে এতোক্ষণ যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছিল, এখন তা স্তব্ধ, সকলে দেখছে একজন মানুষের খাওয়া, তার শীর্ণ, সরু আঙুলের তৎপরতায় ধীরে ধীরে কাঁটা আর মাছ আলাদা হয়ে যাচ্ছে। সম্মোহিতের মতো মায়ের দিকে তাকিয়ে সনৎ ভাবে, মাঝরাতে একটা গোটা ইলিশ একা খাওয়ার ভয়ঙ্কর লজ্জা থেকে আজ মা তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

মা বলিয়া ডাক

নক্কিরানীর পিত্রালয়ে যাত্রা

উনিশশো পঁচাত্তর সালে ভারতবর্ষে রেকর্ড পরিমান শস্য উৎপাদন হয় এবং সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ও বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে খাদ্যে দেশের স্বয়ম্ভরতার খবর বিপুল আড়ম্বরের সহিত দেশবাসীকে জানানো হয়। কিন্তু নবজাতের কান্না, মাতালের খিস্তি, জননেতার গর্জন ও শেষযাত্রার হরিধ্বনির মতো এই প্রচার দেশবাসীর মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে না। অজ্ঞ ভারতবাসী, মুচি, মেথর, চণ্ডাল ভারতবাসী, কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া প্রতিবারের মতো, খরার পর বন্যা, এবং বন্যার পর খরার প্রতীক্ষা করিতে থাকে। ইহারা আজন্ম জানে, যে, ভারতবর্ষে দুটি ঋতু, খরা এবং বন্যা, খরায় জলাভাব এবং বন্যায় জলাধিক্যের দরুণ এই দুই ঋতুতেই তাহারা অভুক্ত, বেকার থাকে। তাই এই দুই ঋতুই তাহাদের প্রধান শত্রু! কিন্তু ইহা প্রকৃতির মার, মানুষ কী করিবে। ফলে সারা বছরই পেটে গামছা বাঁধিয়া 'মনরে কৃষি কাজ জান না' গানটি গাহিতে গাহিতে গ্রামীন মানুষ নানা ধান্দায় শহরাভিমুখে পাড়ি দেয়। যাইবার আগে সমুদয় বিবাহিত পুরুষ নিজ নিজ স্ত্রীকে গর্ভিনী করে। কেননা স্ত্রীর গর্ভ শূন্য রাখায় তাহাদের ঘোরতর অবিশ্বাস এবং আপত্তি আছে। তাহাদের ধারনা, বিবাহিত নারীর খালি পেট হইল পেঁচোর আড্ডা। পেঁচো নামক অপদেবতা গৃহবধুর খালি উদর পাইলেই সুরুৎ করিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। তাই নক্কিরানীর স্বামী হলধর হাজরা তাহার তেইশ বছরের যুবতী স্ত্রীকে তৃতীয় দফায় গর্ভবতী করিয়া এক আকালের সকালে পাতাল রেলের মাটি কাটিতে কলিকাতায় চলিয়া গেল। হলধর ঈশ্বরবিশ্বাসী। সুতরাং স্ত্রীর গর্ভসঞ্চারের দায়িত্বটুকু নিজে লইয়া বাকী দায়িত্ব ঈশ্বরে সমর্পন করিতে তাহার কোনো অসুবিধা হইল না। ঈশ্বরও অপার করুনাময়, তিনি হলধরের প্রথম সন্তান মেয়ে বুঁচকিকে হলধরের সংসারে রাখিয়া, দ্বিতীয় সন্তান, দুই বছরের ছেলে বোঁচকাকে, এক বৎসর পূর্বে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া, হলধরের সাংসারিক চাপ কিঞ্চিৎ লাঘব করিয়াছেন। ফলে, নক্কিরানী ঈশ্বরের উপর চটিলেও হলধরের ঈশ্বর বিশ্বাস আরো গভীর এবং গাঢ় হইয়াছে।

হলধরের কলিকাতা গমনের প্রায় সাত মাস পরে নক্কিরানীর প্রসবকাল সমুপস্থিত হইল। নক্কিরানীর সংসারে হলধরের বুড়ি বিধবা পিসি, মেয়ে

ঢেঁকি, একটি ছাগল, দুটি হাঁস, তিনটি মুরগি ছাড়া আর কোনো বয়স্ক প্রাণী নাই। প্রসবের সময়ে সাহায্যের জন্য উহাদের কাহাকেও নক্কিরানীর উপযুক্ত মনে হইল না। বুড়ি পিসশাশুড়ি নির্ভরযোগ্য হইলেও রাতকানা। দিন শেষ হইলেই সে চোখে কিছু দেখে না। ছাগল আনিতে কুকুর ধরিয়া আনে। সুতরাং রাতে প্রসববেদনা চাপিলে এই বুড়ি কোনো কাজে লাগিবে না। তিনপাড়া হইতে দাইকে ডাকিয়া আনা এই বুড়ির কর্ম নহে। তাই নক্কিরানী গ্রামের লোক মারফৎ স্বামী হলধরকে গৃহে ফিরিবার সংবাদ পাঠাইল। অশিক্ষিতা নক্কিরানী প্রেমপত্র লিখিতে পারে না। তবু হৃদয়ের উজাড় করা আবেগ স্বামীকে বুঝাইবার জন্য সংবাদদাতার সহিত একজোড়া মুরগির ডিম ও একঠোঙা মুড়ি পাঠাইল। নক্কিরানীর সিধা হলধর পাইল কিনা কে জানে, কিন্তু সে ফিরিল না। নক্কিরানী আবার খবর পাঠাইল। প্রায় বারচারেক তাগাদার পরও হলধর যখন সাড়াশব্দ করিল না, তখন নক্কিরানী বুঝিল যে, তাহার কপাল পুড়িয়াছে। লোকমুখে হলধর সম্পর্কে কিছু কানাঘুসা ইতিপূর্বে শুনিলেও নক্কিরানী বিশ্বাস করে নাই। এখন করিল। হলধর যে নতুন মেয়েছেলেতে মজিয়াছে, এ বিষয়ে নক্কিরানী নিঃসন্দেহ হইল। স্বামীর প্রকৃতি নক্কিরানীর ভালোই জানা আছে। মানুষটা শরীরের কুটকুটানি একদম সহ্য করিতে পারে না, এবং দিনে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিলে রাতে এই কুটকুটানি প্রবলতর হয়। অন্ধকার বিছানায় তখন নক্কিরানীকে বুকে পেষন করিতে করিতে হলধর গোঙায়, আমাদের জীবনে আর কিছু নাই। এটুকুই সাধ আহ্লাদ!

আরো একটি কারণে সংসার সম্পর্কে হলধরের অবহেলা নক্কিরানী টের পাইল। কলিকাতা হইতে প্রথম তিন, চার মাস সামান্য কিছু টাকা পাঠাইয়া হলধর হাত গুটাইয়া লইয়াছে। গত পাঁচ মাসে একটি আধলাও সে ঠেকায় নাই। হলধরকে পাকড়াইবার জন্য অসহায় নক্কিরানী তাই একটি ফন্দি আঁটিল। হাওড়া জেলার আন্দুলের এক গ্রামে নক্কিরানীর পিত্রালয়। নক্কিরানীরা পাঁচ ভাই, এক বোন। অভাবের সংসার হইলেও একমাত্র মেয়ে বলিয়া পরিবারে নক্কিরানীর যথেষ্ট খাতির আছে। সে জানে যে, দুঃসময়ে বাপের বাড়ীর লোকেরা তাহাকে দেখিবে। সেজদাদা মাখনের উপরে আবার নক্কিরানীর অগাধ বিশ্বাস। মাখন বাউড়িয়া চটকলের শ্রমিক, বেশ বণ্ডাগণ্ডা, সাহসী লোক। দেশগাঁয়ে অনেকে তাহাকে খাতির করে। মাখনকে লইয়া কলিকাতায় যাইতে পারিলে হলধর সুড়সুড় করিয়া ফিরিয়া আসিবে। হলধরকে একবার মুঠায় পাইলে ঘরজ্বালানী পরভোলানি সেই ছেনাল মাগীটার বিষ নক্কিরানী ঝাড়িয়া দিবে। এই সব ভাবিয়া আসন্নপ্রসবা নক্কিরানী একদিন দুপুর দুইটা নাগাদ পিত্রালয় যাইবার জন্য বালিচক রেল

স্টেশন হইতে একাকী ট্রেনে চাপিয়া বসিল। বাগ্নিচক হইতে আন্দুল, ট্রেনে ঘণ্টাখানেকের পথ।

বাণিজ্যে বসতি নক্কি

অর্থনীতির নিয়ম কানুন, অর্থাৎ উৎপাদন, চাহিদা, বণ্টন সংক্রান্ত নীতিগুলি নক্কিরানীর জানা ছিল না। জানা থাকিবার কথাও নয়। কেননা জাতীয় অর্থনীতি, যোজনা, পরিকল্পনা, বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ইত্যাদি নানাবিধ মহৎ কর্মকাণ্ডের মধ্যে নক্কিরানীর কোন জায়গা নাই। এইসব লইয়া সে মাথাও ঘামায় না। তাই ট্রেনের কামরায় গন্ধকালীকে দেখিয়া সে যারপরনাই বিস্মিত হইল। গন্ধকালীর বয়স অনধিক ত্রিশ। মাজা শ্যামবর্ণ, আঁটোসাঁটো গড়ন। শরীরে শক্তি এবং যৌবন দুইই আছে। বছর দেড়েকে হইল তাহার স্বামী কিসান দাস বেঘোরে মারা গিয়াছে। গন্ধকালী এখন জগাই নস্করের রক্ষিতা। রক্ষিতা রাখিলেও জগাই খুব বড়োমানুষ নহে। সম্প্রতি খড়্গপুর হাওড়া লাইনে নিজস্ব পেশায় জগাই বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছে। জগাইয়ের পেশা হইল বেআইনী চাল পাচার। মেয়ে, পুরুষ মিলাইয়া তাহার দলে প্রায় পঞ্চাশজন কর্মী আছে। বছর দশেক আগে জগাইও ছোকরা কর্মী হিসেবে কিসান দাসের পাচারকারী দলে যোগদান করিয়াছিল। তখন তাহার নাম ছিল জগৎ নস্কর বয়স সতেরো, আঠারো। শারীরিক শক্তি ও কর্মকুশলতায় জগৎ খুব দ্রুত কিসানের পয়লা নম্বর সাকরেদ হইয়া উঠিল। এই পর্বেই তাহার নাম ক্রমাগত বদলাইতে থাকিল। জগৎ হইতে হইল জগু, তাহার পর জগ্‌গু এবং সবশেষে জগাই। জগ্‌গু পর্বে তাহার সহিত গোপনে গন্ধকালীর মাখামাখি শুরু হয়। অতঃপর একদিন রাতের শেষ ট্রেনে পাচারকারীদের উপর পুলিসের হামলার পর, সকালে, বাগনানের অদূরে, রেললাইনের ধারে কিসানের গলাকাটা লাশ পাওয়া যায়। গলার ওপর দিয়া ট্রেনের চাকা চলিয়া গিয়াছিল। খবরের কাগজে সংবাদ বাহির হয়, দুর্ঘটনায় চাল চোরাচালান দলের পাণ্ডার মৃত্যু।

গন্ধকালী কিছুদিন মনমরা থাকিবার পর জগাইয়ের কণ্ঠলগ্না হয়। জগাই খুব প্রগতিশীল লোক। তাই প্রেমিকা বা রক্ষিতা গন্ধকালীকেও সে ব্যবসায়ে টানিয়া লয়। সেই হইতে খড়্গপুর লাইনের ট্রেনে গন্ধকালীকেও নিয়মিত দেখা যায়। চালের লেনদেন ছাড়াও ব্যবসায়ের জনসংযোগের কাজটিও গন্ধকালী করে। জনসংযোগের কাজে গন্ধকালী পুরাপুরি সফল। পুলিস, প্রশাসন এবং অন্যান্য প্রতিকূল শক্তিকে সে বেশ ভালোই বাগ মানাইতে পারে। রেলপুলিস ও হোমগার্ডের লোকে গন্ধকালীকে দেখিলে বিগলিত হইয়া দাঁত বাহির করে।

নক্কিরানী না জানিলেও জগাই, গন্ধকালী এবং তাহাদের দলবল রেকর্ড পরিমান খাদ্য উৎপাদনের খবরটি যথাসময়ে পাইয়াছে। এই খবরে তাহাদের

উল্লাসের সীমা নাই। তাহারা জানে, রেকর্ড খাদ্য উৎপাদন মানেই দেশ জুড়িয়া রেকর্ড পরিমান খাদ্যসংকট। অভাব, অনাহার, কালোবাজার এবং অজন্মা হইলে খাদ্য সংকট কম হয়। কেননা, যাহারা কালো টাকার মালিক, অল্পস্বল্প উৎপাদন হইলে তাহারা টাকা লাগাইতে উৎসাহ বোধ করে না। বিপুল পরিমান কালো টাকাকে সক্রিয় রাখিতে বিপুল উৎপাদন এবং দেশজোড়া বাজারের দরকার হয়। জগাই বুঝিল যে, এই বৎসর তাহাদের রমরমা ব্যবসা হইবে। রাতে বিছানায় গন্ধকালীকে আদর করিতে করিতে জগাই বলিল, এবছর ভাল লাভ হলে সামনে বছর একটা নতুন কারবার ফাঁদবো কিসের কারবার ?

নকিরানীর প্রশ্নে রসিকতা করিয়া জগাই জবাব দিল, এটমবোমার।

জগাইয়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া হাসিতে হাসিতে গন্ধকালী বলিল, ধ্যুস, ও ব্যবসা চলবে না।

কেন ?

ত্বনিয়ায় কোন যুদ্ধই হচ্ছে না। সকলেই শান্তি শান্তি করে চেঁচাচ্ছে। এখন কে তোমার বোমা কিনবে ?

ঠিক কিনবে। শান্তির সময়েই বেশী বোমা কেনাবেচা হয়, মজুদ কর হয়। এই কেনাবেচা, লেনদেন করার জন্যেই কিছুকাল শান্তি থাকে।

জগাইয়ের সব কথা গন্ধকালী বুঝিতে পারে না। কিন্তু এটমবোমার ব্যবসা তাহার পছন্দ নয়। সে বলিল, ওসব বোমাটোমার ব্যবসা ভালো নয়। তার চেয়ে বরং আলপিনের ব্যবসা করো।

অন্ধকারে গন্ধকালীর কোমল বক্ষে একটি জম্পেশ চিমটি কাটিয়া জগাই বলিল, কোথায় এটমবোমা, আর কোথায় আলপিন !

চিমটির সুখে গন্ধকালী গোঙাইতে লাগিল।

অতঃপর আর ব্যবসায়িক কথাবার্তা চলে না। রাত বাড়িলে, অন্ধকার গভীরতর হইলে গন্ধকালী বলিল, এবারে ঘুমোও, কাল অনেক কাজ আছে।

কথাটা ঠিক। কাল সারাদিনে প্রায় তিনশো কুইন্টাল চাল চালান করিতে হইবে। তিনশো কুইন্টাল কম কথা নয়। এই বৎসর মাত্র একদিনে এতো বড়ো কাজ আর হয় নাই। শান্ত মাথায় হিসাব কসিয়া কাজ করিতে হইবে। হিসাবে একটু ভুল হইলেই মহা বিপদ। জেলা পুলিসের পুরাতন কর্তা বদল হইয়া নতুন একজন আসিয়াছে। তিনি খুব কড়া লোক। কড়া মানে যে সৎ বা ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, তাহা নয়। কিন্তু নতুন একজন কর্তা আসিলেই জেলার পুলিসী ব্যবস্থায় প্রথম প্রথম সামান্য কড়া ভাব ফুটিয়া উঠে। তখন বুঝিতে হয়, যে, পুরানো চুক্তির রদবদল করিয়া নতুন চুক্তি করিতে হইবে। নতুবা কড়াত্ব কমিবে না।

নতুন কর্তার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের আগেই এই বড়ো অর্ডারটি চলিয়া আসিয়াছে। ক্যাশ টাকা। এমন একটি দাঁও ছাড়িবার অর্থ, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া দেওয়া। চালকল মালিক এবং জগাইয়ের মহাজন, গুণধর মান্না বলিল, ভয় নেই, পুলিসের সেজকর্তাকে আমি বলে দেবো, চালের ব্যাপারটা এখনো সেজোই দেখছে।

সেজকর্তার সঙ্গে গুণধর কথা বলিয়া জগাইকে সবুজ সংকেত পাঠাইল। সেই সঙ্গে জানাইল যে, সেজকর্তা বলিয়াছে যে, অফিসটাইম বাদ দিয়া দুপুর বারোটার পর যাত্রা শুভ। তারপর বিকালটা ছাড়িয়া রাত সাতটার পরের ট্রেনগুলি ব্যবহারে কোন অসুবিধা নাই।

গুণধরের পরামর্শ মতো কর্মসূচী বানাইয়া দুপুর বারোটা পঞ্চান্নর খড়্গপুর লোকালে দলের অর্ধেক লোক লইয়া বমাল সমেত জগাই হাওড়া অভিমুখে রওনা হইয়াছে। বাকী অর্ধেক কর্মী ও চাল লইয়া কিছু পূর্বে গন্ধকালী দুইটা পাঁচ মিনিটের ট্রেন ধরিয়াছে। মাল নামিবে রামরাজাতলা ও হাওড়ার মাঝখানে। মালপত্র ট্রেনে চাপাইয়া দারুণ ব্যস্ততা ও উত্তেজনার মধ্যেও গন্ধকালী ভাবিল যে, হয়তো পথে কোন স্টেশনে জগাইয়ের সহিত দেখা হইবে। মাল খালাস করিয়া জগাই নিশ্চয় এতোক্ষণে ফিরতি গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে। জগাইয়ের কথা মনে হইতেই আবেশ ও উত্তেজনায় গন্ধকালী শিহরিত হইল। কি দস্যি ছেলে! হয়তো গন্ধকালীর অপেক্ষা বয়সে ছোট হইবার জন্যই জগাইয়ের এতো তেজ, এতো তাপ। জগাইয়ের উপর প্রেমের সহিত কিছুটা অপত্যস্নেহও গন্ধকালী অনুভব করিল।

ঠিক তখনই গুরু নিতম্ব ও দশাসই উদরসহ সিটের উপর বসিয়া থাকা নক্কিরানীর সহিত তাহার দৃষ্টি বিনিময় হইল। নক্কিরানীর পেটের দিকে তাকাইয়া গন্ধকালী ফিক করিয়া হাসিল। নক্কিরানীও হাসিল। কেননা গন্ধকালীর পেটও জয়ঢাক। নক্কিরানীর পাশে কয়েক মুহূর্ত বসিয়া ট্রেন ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই গন্ধকালী উঠিয়া দাঁড়াইল। বসিবার মতো অবসর তাহার ছিল না। দরজার মুখে ডাঁই করা কয়েকটি নানা আকারের বস্তাকে অবিলম্বে লুকাইতে হইবে। দুপুরের গাড়ীতে বিশেষ যাত্রী নাই। দশ, বিশজন মানুষ, যাহারা ছড়াইয়া ছিটাইয়া বসিয়া আছে, এই ব্যবসার সঙ্গে তাহারা সম্যক পরিচিত। তাহারা কেহই এই ব্যবসার আইন, বেআইন লইয়া প্রশ্ন করে না। প্রশ্ন করাটাও অবান্তর। একজন ত্যাঁদোড় যাত্রীকে কামরা হইতে ছুঁড়িয়া ফেলা ইহাদের কাছে কোন কঠিন কাজ নয়।

তিনু, কেষ্ট এবং ভজার হাতে হাতে চালের বস্তাগুলি কামরার ছাল ছাড়ানো দেওয়ালে এবং বিভিন্ন সিটের তলায় চালান করাইয়া গন্ধকালী তিনুকে বলিল, এই তিনে, গোপালভোগের বস্তাটা আমার সিটের নিচে রাখ।

তিনে অর্থাৎ তিনকড়ি বারিক হইল জগাইয়ের মাসতুতো ভাই, জগাইয়ের ডান হাত। কেজি দশ বারো চালের একটি ছোট বস্তা, গন্ধকালীর সিটের তলায় সে চোখের নিমেষে ঢুকাইয়া দিল। এই বস্তাটি কলিকাতার রামলগন শেঠের পৌত্রের অন্নপ্রাশনের জন্ত স্বয়ং শেঠের অনুরোধে গন্ধকালী নিজে বহন করিতেছে। বস্তাটিকে ছোট এবং হাল্কা করিবার জন্তে কিছুটা চাল বস্তা হইতে বাহির করিয়া গন্ধকালী পেটে বাঁধিয়াছে। রামলগন শেঠের অনুরোধ ফ্যালনা নয়। শেঠজী কলিকাতার নামজাদা ব্যবসায়ী। পোস্তা এবং কাশীপুরে তাঁহার চাল, চিনি, গম ও সিমেণ্টের তুইটি বিরাট আড়ত আছে। রামলগন হইল গুনধর মান্নার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আজ সকালে এই বস্তাটি গন্ধকালীর ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া গুণধর বলিয়াছে যে, রামরাজাতলা স্টেশনে বস্তাটি লইবার জন্ত রামলগন বাবুর ড্রাইভার গাড়ী লইয়া হাজির থাকিবে।

নক্কিরে হারাবো যদি

তুই পাশে ধুধু ফাঁকা প্রান্তরের মধ্য দিয়া ট্রেন দ্রুতবেগে হাওড়ার দিকে ছুটিতেছে। জুলাইয়ের মধ্যতুপুরে পৃথিবীজোড়া ঠাঠা রোদ। উত্তাপে চরাচর জলিয়া যাইতেছে। গরম লু হাওয়া, বুকফাটা শূন্য মাঠের অন্তরাত্মা পর্যন্ত যেন লেহন করিয়া লইতেছে। লাইনের তুই পাশের তারে বা নাবাল জমিতে একটি ফিঙে, ল্যাজবোলা, এমন কি একটি কাকও নাই। নক্কিরাণীর পাশে বসিয়া গন্ধকালী আঁচলের গিঁট খুলিয়া একটি পান বাহির করিয়া খাইল। তারপর তিনুকে প্রশ্ন করিল, সব মাল উঠেছে তো?

হুঁ।

গন্ধকালী এবার ভজা এবং কেষ্টাকে বলিল, কোলাঘাটে সকলের সঙ্গে একবার দেখা করবি।

আচ্ছা।

কথার মধ্যেই গন্ধকালী পায়ের গোড়ালি দিয়া সিটের তলায় রাখা চালের বস্তাটি ধীরে ধীরে নক্কিরাণীর সিটের দিকে ঠেলিয়া দিতেছিল। আর কেহ না দেখিলেও গন্ধকালীর কাণ্ড ঠাহর করিয়া তিনু মুচকি হাসিল।

কামরার যাত্রীরা কেহ ঝিমাইতেছিল, কেহ ঢুলিতেছিল, কেহবা এই অনা-বৃষ্টির পরিণাম লইয়া আলোচনা করিতেছিল। আষাঢ় মাস পড়িয়া গেল, তবু বৃষ্টির দেখা নাই। মাঠ, পুকুর শুকাইয়া খটখট করিতেছে। গত মরশুমের ভয়ঙ্কর বন্যার পর এ বৎসর ভয়াবহ খরার মার হইতে আর রেহাই নাই। দেশগ্রাম উজাড় হইয়া যাইবে। সকাল হইতেই আকাশের ঈশানকোণে এক কুঁচি কালো মেঘ অসহায়ের মতো লটকাইয়া ছিল। তুপুরের ঝাঁঝা রোদেও

সেই নেইআকড়া মেঘটি আকাশের দখল ছাড়ে নাই। সেই দিকে আঙুল উঁচাইয়া এক যাত্রী, বনমালি বলিল, আজ একপশলা জল হবে।

তার সঙ্গী গদাই বলিল, কে জানে!

এইবার বনমালি মুখটা গদাইয়ের কানের কাছে লইয়া ফিসফিস করিল, আমি একটা শুভ লক্ষণ দেখেছি।

কী?

একজোড়া পোয়াতি।

বনমালির দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া নক্কিরানী ও গন্ধকালীকে একপলক দেখিয়া গদাই বলিল, ধ্যুস্। হাওড়ায় পৌছে ওরা চালের থলি বিয়োবে।

অতঃপর দুইজনে খ্যাকখ্যাক করিয়া হাসিতে লাগিল।

নক্কিরানীর সহিত ইতিমধ্যে গন্ধকালী গল্প জমাইয়াছে।

ক'মাস, গন্ধকালী প্রশ্ন করিল।

আট।

চললে কোথায়?

আঁদুল।

কর্তার কাছে?

এই প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া নক্কিরানী পাল্টা প্রশ্ন করিল, তোমার ক'মাস?

গন্ধকালী কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার সন্তান কামনা কিসান দাস মিটাইতে পারে নাই। কিসান মরিয়াছে। জগাই আসিয়াছে। গন্ধকালীর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবার হয়তো পূর্ণ হইবে। একটি শিশুর জন্য তাহার হৃদয় যে মাঝে মাঝে কী প্রবলভাবে আনচান করে, এই কথা সে কাহাকে বুঝাইবে? নক্কিরানীর প্রশ্নের উত্তরে গন্ধকালী বলিল, বারোমাস, আমি বারোমেসে পোয়াতি।

গন্ধকালীর কথা নক্কিরানী বুঝিতে পারিল না। বারোমাস গর্ভধারণের কথা সে সাতজন্মে শোনে নাই। নক্কিরানী বড়ো অবাক হইয়া গন্ধকালীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার মুখে আর কোন প্রশ্ন জোগাইল না।

অচিরেই ট্রেন কোলাঘাট বাগনান ইত্যাদি পার হইয়া গেল। বাগনান পর্যন্ত গন্ধকালীর যে ত্রস্ত, ব্যস্ত ভাব ছিল, এখন তাহা কাটিয়া গিয়াছে। এই লাইনের মূল চেক্‌পোস্ট্ হইল বাগনান। তাহার পর পুলিসী হামলার সম্ভাবনা অনেক কম। বাউড়িয়া বা সাঁকরাইলেও মাঝে মাঝে ঝামেলা হয়। কিন্তু এই দুই স্টেশনেই গন্ধকালীর যথেষ্ট যোগাযোগ এবং প্রতিপত্তি আছে। বাউড়িয়া থানার বড়োবাবু এবং সাঁকরাইল রেলপুলিসের মেজবাবুকে নানা মোহিনী মন্ত্রে গন্ধকালী তুক করিয়াছে। শাড়ির আঁচলে কপালের ঘাম

মুছিয়া দারুণ স্বস্তি ও আরামে গন্ধকালী আবার নকিরানীর পাশে আসিয়া বসিল। গন্ধকালীর হাঁকডাক, তেজ, দাপট দেখিয়া নকিরানী ভারী মুগ্ধ হইয়াছিল। এমন জাঁদরেল মেয়েমানুষ সে জীবনে দেখে নাই। টুঁ শব্দ না করিয়া এতোগুলি মেয়ে, মরদ যার হুকুম তামিল করে, সে বড়ো সামান্য মেয়েছেলে নয়। নকিরানী এখন বেশ সম্ভ্রমের সহিত গন্ধকালীর সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল। নকিরানীর পারিবারিক নানা খবর গন্ধকালীর গোচর হইল। সূর্য পশ্চিমে সামান্য হেলিলেও রোদের তেজ কিন্তু এতোটুকু কমে নাই। অসহ্য কষ্টে মাটি, গাছপালা, মহাশূন্য তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। নিঃশ্বাসে আগুনের হল্কা। উত্তাপে পৃথিবী যেন অচেতন, অসাড়, শব্দহীন হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু গাড়ী ফুলেশ্বর স্টেশনে ভিড়িবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হইয়া গেল। জেলাপুলিস, রেলপুলিস এবং হোমগার্ডের সমবেত সশস্ত্র বাহিনী চোখের পলকে ট্রেনের প্রায় প্রতিটি কামরা দখল করিয়া লইল। শেষ-দুপুরের নৈঃশব্দ কাটিয়া স্টেশন চত্বরে বড় হৈচৈ পড়িয়া গেল। গন্ধকালী বুঝিল, অসংখ্য পুলিস ট্রেন ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, বাঁচিবার উপায় নাই। আজ নিশ্চয়ই ফুলেশ্বরে মোবাইল কোর্ট বসিয়াছে। কিন্তু এইরকম হইবার কথা নয়। অগ্রিম কোন খবরও ছিল না, তবু এই বিপত্তির মোকাবিলায় গাছ-কোমর বাঁধিয়া গন্ধকালী উঠিয়া দাঁড়াইল। খাকি পোষাক পরা তিনটি বাহিনীর যাহারা কামরায় ঢুকিয়াছে, তাহাদের সকলেই গন্ধকালীর অচেনা। মূল্যবান চালের বস্তাগুলি ধুপধাপ প্ল্যাটফর্মের উপর পড়িতেছে। পুলিসকে কী যেন বলিতে গিয়া বন্দুকের কুঁদার ঘায়ে ভিকু প্ল্যাটফর্মের উপর আছড়াইয়া পড়িল। বিপদ বুঝিয়া কেষ্ট ভাগিতেছিল। বিরাশি সিক্কার একটি রদ্দা খাইয়া কেষ্ট নিশ্চল হইয়া গেল।

এমতাবস্থায় গন্ধকালী জানে যে, আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। তাই সে উগ্রচণ্ডী মূর্তি ধারণ করিয়া, আকাশ ফাটাইয়া পুলিসের উদ্দেশে গালি বর্ষণ শুরু করিল, ওরে আঁটকুড়ির বেটারা, তোদের ঘরে কী ছেলে, মেয়ে, মা, বোন নেই? থানায় নিয়ে চল, মারবি কেন? চালের বস্তাগুলো কী হারামের মাল? ওরে হারামখোরের দল, তোদের ওলাউঠো হোক, কুড়িকুষ্টি হোক!

গন্ধকালীর তীক্ষ্ণ, ধারালো কণ্ঠস্বরে সারা কামরা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সেই শব্দে অনেক উপরে আকাশের বুকে কয়েকটি উড়ন্ত চিল শুরু হইয়া কালো টিপের মতো সাঁটিয়া গেল। রক্ষীবাহিনী এক মুহূর্ত থতমত খাইয়া কৃষ্ণাঙ্গী, এলোকেশী, আঁটোসাঁটো শরীর মেয়েছেলেটিকে খর চোখে লেহন করিল। কিন্তু এক লহমা মাত্র। তারপর একজন উর্দিধারী হঠাৎ তাহার রাইফেলের ধারালো বেয়োনেটটি গন্ধকালীর পেটে ঢুকাইয়া দিল।

হুড়মুড় করিয়া একরাশ চাল গন্ধকালীর দুপায়ের উপর ছড়াইয়া পড়িল। গন্ধকালী অপ্রস্তুত। এমন একটি অসম্মানজনক পরিস্থিতির জন্ত সে তৈরী ছিল না। লজ্জায়, ভয়ে তাহার সব সাহস, তেজ দর্প করিয়া নিভিয়া গেল। গন্ধকালী অধোবদন হইল। অতঃপর কামরার মেঝের উপর বসিয়া, দুই পা ছড়াইয়া সে তুমুল কান্না জুড়িয়া দিল। গন্ধকালীর আচরণে উর্দিধারীরা যথেষ্ট মজা পাইয়াছিল। এবার নক্রিরানীর পেটের উপর একজনের নজর পড়িল। তাহার রাইফেলেও ঝকমকে তীক্ষ্ণধার বেয়োনেট লাগানো আছে। আতঙ্কে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নক্রিরানী সিট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কিছু বলিতে চাহিতেছিল। কিন্তু সুযোগ পাইল না। তাহার ফলভারাক্রান্ত, টইটম্বুর পেটে সূচ্যগ্র বেয়োনেট সজোরে ঢুকিয়া গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য! রক্ত মাংসের সেই পূর্ণ কুম্ভে অবলীলায় বেয়োনেট ঢুকিয়া যাইলেও এক কণা চাল পড়িল না। আর্ত গলায় একবার মা বলিয়া নক্রিরানী সিটের উপর লুটাইয়া পড়িল। চাল না পড়িলেও, সেই রহস্যময়, গাঢ় লাল বর্ণের তরল, যাহা অমোঘ, অপরিবর্তনীয়, দেশে, কালে শাশ্বত, নিজস্ব নিয়মে মনুষ্য শরীরের স্নায়ু, শিরায় প্রবাহিত, সেই তরলে নক্রিরানীর শাড়ী, সিট ভিজিয়া, ভাসিয়া গেল। সিট ভেদ করিয়া নক্রিরানীর উষ্ণ, ঘন রক্ত গোপালভোগ চালের বস্তার মাথাটি পর্যন্ত ভিজাইয়া দিল। নক্রিরানীর জঠরের মধ্যে এক অপরিণত, অপরিচিত প্রাণ সামান্য ধড়ফড় করিয়া একটি অন্তিম লাফ দিল। নক্রিরানী সিট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বেয়োনেটধারী তখনও দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। নক্রিরানীর মুখ চোখ দেখিয়া তাহার হাসি মিলাইয়া গেল। বন্দুকের ট্রিগারে সে হাত রাখিল। কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা। সময় যেন অচল হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ এক অমানুষিক চিৎকার করিয়া বেয়োনেটধারীর উপর নক্রিরানী ঝাঁপাইয়া পড়িল। মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধান। তবু নক্রিরানী বেয়োনেটধারীকে স্পর্শ করিতে পারিল না। তাহার আগেই এক ঝলক আলো, গুলির শব্দ, নক্রিরানী ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল। আর উঠিল না।

জাষ্টিস্ সিনহা কমিশনের রিপোর্ট

কলিকাতা ১৩ই মার্চ, আদালতের সংবাদদাতা, গত ষোলই জুলাই, উনিশশো পঁচাত্তর-এ, ফুলেশ্বর স্টেশনে পুলিশ ও চাল চোরাচালানকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ সংক্রান্ত বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট গতকাল প্রকাশিত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, মাননীয় শ্রীচন্দ্রকান্ত সিনহা চারিশত পৃষ্ঠার রিপোর্টটি পেশ করিবার পূর্বে জানাইলেন যে, গত আটমাসে মোট সাতচল্লিশবার কমিশনের আদালত বসিয়াছিল। সর্বসাকুল্যে

একান্ন জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা ছাড়াও অকুস্থলে পাওয়া বিয়াল্লিশটি নিদর্শন এবং তেত্রিশটি সরকারী নথিপত্র পরীক্ষা করা হয়।

সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ও কাগজপত্রাদি দেখিয়া মহামান্য বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, খুবই পরিতাপের বিষয়, স্বাধীনতার সিকি শতাব্দী পরেও দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ আজও বেকার, নিরন্ন এবং দুর্দশাগ্রস্ত। এই অসংখ্য অভুক্ত, দুঃখী মানুষ, নিছক প্রাণরক্ষার জন্যই বেআইনী কাজকর্মে লিপ্ত হয়। আইন-কানুনের বাহিরে একজন বিচারকের মানবিক সত্তা এইসব দেখিয়া বিচলিত না হইয়া পারে না। আইন শুধু শাসনের যন্ত্র নহে, ইহা সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা ও ভারসাম্য রক্ষারও চাবিকাঠি। নিজের দায়িত্ব পালনে আইন ব্যর্থ হইলে, আইনভঙ্গকারীর বিচার করিবার অধিকারও আইন হারাইয়া ফেলে। তবু আইনের শাসন চালু রাখিতে হয়। মানবতা এবং আইন অনেক সময়েই ভিন্নস্বরে কথা বলে। বিচারককে আইনের নির্দেশই শুনিতে হয়।

রিপোর্টের প্রথম পঁচিশ পাতার মুখবন্ধে চালু আইন কানুনের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা লইয়া মাননীয় বিচারপতি নানা মূল্যবান মন্তব্য করিয়া মূল রিপোর্ট শুরু করিয়াছেন।

উনিশশো পঁচাত্তর সালের ষোলই জুলাই হাওড়াগামী খড়্গপুর লোকালের একটি কামরায় রেলপুলিসের গুলিচালনায় লক্ষ্মীরানী হাজরা (২৩) নামে এক বিবাহিতা রমণীর মৃত্যু হয়। গন্ধকালী দাসী (২৮), তিনকড়ি বারিক (১৯) এবং বনমালী বসু (৩৮) গুরুতর আহত অবস্থায় উলুবেড়িয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়। রেল পুলিসের দুই কনষ্টেবল, দানী মিশ্র এবং শঙ্কুলাল সর্দারও আহত হয়। ক্রুদ্ধ জনতা এবং যাত্রীরা দানী মিশ্র এবং সজ্জন হালদারের বন্দুক দুইটি ছিনতাই করে। তারপর ফুলেশ্বর স্টেশন তছনছ করিয়া তাহারা ট্রেনটিতে আগুন লাগাইয়া দেয়। দুইটি কামরা ভস্মীভূত এবং চারটি কামরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গোটা এলাকা এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ পরিগ্রহ করে। ওই লাইনে প্রায় সতেরো ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।

ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনার পর, সাক্ষ্য, প্রমান, প্রশ্নোত্তর, এগজামিনেশন, ক্রস্ এগজামিনেশন ইত্যাদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া মাননীয় বিচারপতি চোরাচালানের কারণ ও তাহা নিবারণের জন্য সরকারের নিকট তাঁহার মূল্যবান সুপারিশ পেশ করিয়াছেন। মহামান্য বিচারকের মতে সামাজিক রাজনৈতিক, নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং অর্থনৈতিক কারণ সমেত চোরাচালানের পিছনে মোট সাতচল্লিশটি কারণ আছে। কিন্তু ইহাতে ভয় পাইবার বা হতাশ হইবার কিছু নাই। কেননা সাতচল্লিশটি কারণ অপনোদনের জন্য মাননীয় বিচারপতি সাতান্নটি উপায় বাতলাইয়াছেন!

রিপোর্টের উপসংহারে সেইদিনের মৃত্যু, রক্তপাত ও দুর্ঘটনাকে অতীব দুঃখজনক বলিয়া চিহ্নিত করিয়া মাননীয় বিচারপতি মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই ঘটনার জন্য সরাসরি কাহাকেও দায়ী করা যায় না। দানী মিশ্র অথবা সজ্জন হালদারের গুলিতেই যে লক্ষ্মীরানীর মৃত্যু হইয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। প্রসববেদনা অথবা গর্ভপাতও সন্তানসম্ভবা লক্ষ্মীরানীর মৃত্যুর কারণ হইতে পারে।

মা বলিয়া ডাক

বাহির দুর্গাচক গ্রামের মাতঙ্গ হাজরার মায়ের আজ শ্রাদ্ধ। মাতঙ্গ গ্রামের একজন ধনী মানুষ। মাতৃশ্রাদ্ধে সে অনেক লোক খাওয়াইবে। বাগনান জি, আর, পির মালখানা হইতে নীলামে বেশ সস্তায় সে এক বস্তা ভালো গোপালভোগ চাল কিনিয়াছে। লালাভ সাদা শস্যবীজের মতো চালের আকৃতি। শ্রাদ্ধবাড়ীতে গন্ধকালীও নিমন্ত্রিত হইয়াছে। পেটের সন্তান নাই বলিয়া মা মরা বুঁচকিকে গন্ধকালী দত্তক লইয়াছে। মেয়েটার মুখের দিকে তাকাইলে গন্ধকালীর বুক কাঁপে। একেবারে লক্ষ্মীরানীর মুখ। চেহারাতেও মায়ের আদল। নিমন্ত্রণ বাড়িতে যাওয়ার পথে অনেক সাধ্যসাধনাতেও গন্ধকালীর কোলে বুঁচকি উঠিল না। এখনও গন্ধকালীকে বুঁচকি মা বলিয়া ডাকে না। বুঁচকির মুখের মা ডাকটুকু শুনিবার জন্য গন্ধকালী ভারী ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু গন্ধকালী আশা ছাড়ে নাই। তাহার বিশ্বাস, আজ নাই ডাকুক, কাল ডাকিবে, বুঁচকি একদিন নিশ্চয়ই তাহাকে মা বলিয়া ডাকিবে॥

রহস্যের নাম মরা ইঁদুর

আলো জেলে বারকোসের ওপর রাখা ছানার স্তূপের পাশে মরা ইঁদুরটাকে দেখে কিশোরী পাল ঘাবড়ে গেল। যে সে ইঁদুর নয়, একটা পেল্লায়, ধেড়ে ইঁদুর, ছানার স্তূপের ওপর চোখ উল্টে মরে পড়ে আছে। আতঙ্কে কিশোরী ঘামতে থাকল। একটু বাদেই চ্যাটার্জীবাড়ি থেকে সন্দেশের তলব আসবে। আজ অনাথ চ্যাটার্জীর বড়ো মেয়ের পাকাদেখা। পাত্রপক্ষের লোকদের খাওয়াবার জন্যে দিনসাতেক আগে অনাথবাবু দেড়শো সন্দেশ আর দেড়শো রাজভোগের অর্ডার দিয়েছিল। স্পেশাল সন্দেশ, কেজিতে দশটার বেশী হবে না, রাজভোগ পনেরোটা হতে পারে। অনাথ চ্যাটার্জী বলেছিল, দামের জন্যে ভাবতে হবে না। টাটকা, সরেস জিনিস চাই।

দামের জন্যে কিশোরী পাল ভাবে না। এ পাড়ায় কিশোরী ময়রার সুনাম আজকের নয়। গত চল্লিশ বছর, বাবা রাধিকা পালের আমল থেকে, অভিজাত মিষ্টান্ন বিক্রেতা হিসেবে তাদের চাহিদা এবং খ্যাতি আছে। আভিজাত্য আর খ্যাতি হাওয়া থেকে আসে না। অনেক শ্রম, নিষ্ঠা এবং সততায় এগুলি অর্জন করতে হয়। দু'পুরুষের অর্জিত এই সুনামের দরুণ মিষ্টির দাম যে কিছু বাড়বেই, এটা সকলে জানে। কিশোরীর দোকানে সন্দেশ, রসগোল্লা বা রাজভোগের বাড়তি দাম দিতে তাই কেউ আপত্তি বা দ্বিধা করে না। ক্রেতারা জানে, যেমন জিনিস তেমন দাম। আর এ ব্যাপারে কিশোরীরও তীক্ষ্ণ নজর। বাসি, পচা খাবার মরে গেলেও সে বেচতে পারবে না।

মরা ইঁদুরটার দিকে তাকিয়ে হতবাক কিশোরী প্রথমটা দিশেহারা হয়ে যায়। এই মুহূর্তে যে কি করা উচিত, সে ভেবে পায় না। এখনি জগন্নাথ আর শ্রীপদ এসে সন্দেশ বানাতে বসবে! আপাতত এই ভেনঘরে কিশোরী একা। যা করার এখনি করে ফেলতে হবে। বারকোসের সামনে এগিয়ে সামান্য নিচু হয়ে ইঁদুরটার চেহারা দেখতে যেতেই একটা বোঁটকা, পচা গন্ধ কিশোরীর নাকে ঢুকল। কি সর্বনাশ, শুধু মরেনি, পচতেও শুরু করেছে। এই ইঁদুর কখন এখানে এলো, কিভাবে মরল এবং পচতে শুরু করল, অনেক ভেবেও কিশোরী সে রহস্য উন্মোচন করতে পারল না।

সকালে বৌবাজার থেকে ত্রিশ কেজি একনম্বর ছানা কিনে, জল ঝরিয়ে, মেখে, চটকে, পাক শেষ করতে দুপুর হয়ে গিয়েছিল। দুরকম পাক হয়েছিল

ছানার। দু'শো রাজভোগ রসের গামলায় ছেড়ে কাঠের পরিষ্কার বারকোসে সন্দেশের জন্যে প্রায় পনেরো, ষোল কেজি ছানার তালটা রেখে কিশোরী যখন বাড়ী ফিরেছিল, তখনও ভেনঘর ঝকঝক চকচক করছে। কোথাও একটুকরো কুটো বা এককণা মাটি নেই। ভেনঘরের পরিচ্ছন্নতার দিকে কিশোরীর চিরকাল খুব সতর্ক নজর। এটা সে শিখেছে, বাবা রাধিকা পালের কাছে থেকে। খাওয়ার সুখের আগে চাই, খাদ্যবস্তু দেখার সুখ। তার জন্যে শুধু বাইরের শোকেস্ নয়, ভেন, ভাঁড়ার সবকিছু সাফ রাখতে হবে। এ নীতি থেকে কিশোরী কখনো পিছু হটেনি। অথচ আজ এই ভরসন্ধ্যেবেলায় কি বিপদেই না সে পড়ে গেল। এ ছানা ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এখন, এই শেষবেলায় নতুন ছানা কিনে, জল ঝরিয়ে, সেটা মেখে, পাক দিয়ে সন্দেশ বানাতে রাত ভোর হয়ে যাবে। তাছাড়া এই অবেলায় বৌবাজারে ভালো ছানা পাওয়া মুস্কিল। দুশ্চিন্তায় কিশোরী অথৈ জলে পড়ে যায়। একটা উপায় অবশ্য আছে। মাসতুতো ভাই নরেন মোদকের কথা কিশোরীর মনে পড়ল, নরেনেরও তিনপুরুষের মিষ্টির ব্যবসা। বেশ বড়োসড়ো নামী প্রতিষ্ঠান। নরেনের কাছ থেকে শ'দুই সন্দেশ নিয়ে আসা যায়। কিন্তু নরেন যদি দিতে না পারে? না পারা খুব অস্বাভাবিক নয়। চৈত্র শেষ করে নতুন বছরের এই প্রথম মাসে আজই প্রথম বিয়ের লগ্ন। ফলে শহর জুড়ে বিয়ের মেলা বসে গেছে। এমন দিনে নরেনের দোকানে বাড়তি দুশো সন্দেশ থাকবে, এটা ভাবা বোকামী। আর থাকলেই সে সন্দেশ যে খুব উঁচুদরের হবে, এটাই বা কে বলতে পারে! নরেন অবশ্য বাজে জিনিষ ভালো বলে চালাবে না। কিন্তু তাতে কিশোরীর কী উপকার হবে! সাদামাটা ছানার ডেলা সন্দেশ বলে অনাথ চ্যাটার্জীর বাড়ী দিলে, তার সম্মান থাকবে কোথায়? অনাথবাবুই বা কী ভাববে। মুখে কিছু না বললেও অনাথ মনে মনে বিরক্ত হবে। হয়তো বলে বসবে, তোমার মতো কারিগরের হাত থেকে এমন সন্দেশ আশা করিনি।

কথাটা ঠিক। চ্যাটার্জী বাড়িতে আজ ত্রিশবছর যাবতীয় কাজকর্মে কিশোরী মিষ্টি জুগিয়েছে। তার বাবা রাধিকা পালের আমলেই এই যোগাযোগ শুরু হয়েছিল। অনাথের বিয়েতেও কিশোরীর দোকান থেকে পাঁচরকমের মিষ্টি গিয়েছিল। শুধু চ্যাটার্জী বাড়ি নয়, এ পাড়ায় এমন অনেক বাড়ি আছে, যারা গুঁজিয়া থেকে রাজভোগ পর্যন্ত, প্রতিটি মিষ্টির জন্যে কিশোরী ছাড়া আর কারো দোকানে যায় না। অন্য দোকানের মিষ্টিতে মন ওঠে না তাদের। কিশোরী আজও গুঁজিয়া এবং দানাদার বানায়।

দ্রুতগতি দুশ্চিন্তা কিশোরীকে বেজায় কাবু করে দেয়। কিশোরী ভাবল, দেড়শো রাজভোগ অনাথের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে সন্দেশে ইঁদুর পড়ার কথাটা

বলে আসবে। দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। কিশোরীর এ ব্যাপারে কিছু করার নেই। অনাথ চাইলে কিশোরীই না হয় শ'দেড়েক ভালো সন্দেশের জোগাড়ে নেমে পড়বে। কিন্তু লুকোচাপা করে নোংরা সন্দেশ কিশোরী কাউকে খাওয়াতে পারবে না। তখনই একটা দুর্ভাবনা কিশোরীর মাথায় চিকুর দিল। মরা ইঁদুরের কাহিনী শুনে অনাথ কি রাজভোগ নিতে রাজী হবে। রাজভোগেও ইঁদুরের গন্ধ পাবে। রাজভোগ নিলেও কারো পাতে দেবে না। না নেওয়ার সম্ভাবনাই অবশ্য বেশী। তারপর অনাথের মুখ থেকে মরা ইঁদুরের এই কাহিনী পাঁচকান হবে। তখন কিশোরী পালের দোকানে কেউ আর ঘেঁসবে না। এত্তো দিনের দোকানে লালবাতি জ্বলবে, ব্যবসা লাটে উঠবে। শুধু টাকাকড়ি নয়, এই ঘটনার সঙ্গে কিশোরীর সুনাম, সম্মান, অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে। এগুলোর কাছে টাকার মূল্য আর কতোটুকু। বারকোস ভর্তি ছানা এবং তার ওপর একটা থেঁতো ইঁদুরের পচা মৃতদেহ আগলে বিভ্রান্তের মতো কিশোরী দাঁড়িয়ে থাকে।

কি কিশোরীদা এবার সন্দেশে বসবে নাকি?

বাইরের দোকান থেকে পুরানো কারিগর জগন্নাথের প্রশ্ন শুনে কিশোরী সম্বিত ফিরে পেল। ত্রস্ত, ব্যস্ত হয়ে ভাবল, এখনি একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কণ্ঠস্বর সহজ, স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে কিশোরী জবাব দিল, বসলেই হয়।

মরা ইঁদুরের ল্যাজ ধরে কিশোরী এবার তাড়াতাড়ি ভেনঘরের পেছনের জানলা দিয়ে বাইরের রাস্তায় ইঁদুরটা ফেলে দিল। কি বিরাট ইঁদুর। এক কেজির কম নয়। ল্যাজের ডগা ধরে ইঁদুরটাকে ফেলে দেওয়ার পর কিশোরীর মনে হ'ল, যে তার গোটা শরীর অপবিত্র হয়ে গেছে। বাঁ হাতের দু আঙুলের ডগা দুটো অসাড়। কুৎসিত, কটু গন্ধে থমথম করছে ঘরের বদ্ধ বাতাস। কিশোরীর গা ঘোলাচ্ছিল। রুদ্ধশ্বাস কষ্টে ঘাম জমছিল কপালে। ঠিক তখনই কোমরে বাঁধা গামছায় হাত মুছতে মুছতে জগন্নাথ ঘরে ঢুকল! কিশোরীকে এক পলক দেখে জগন্নাথ জিজ্ঞেস ক'রল, শরীর খারাপ নাকি?

নাহ, কিশোরী জানাল, যা গরম পড়েছে।

আর কথা না বাড়িয়ে ছানার বারকোসের সামনে জগন্নাথ বসে পড়ল। বাপের আমলের অভিজ্ঞ, পাকা কারিগর, জগন্নাথের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কিশোরী তার মনের হদিশ করতে চাইল। ছানার তালের যেখানটায় ইঁদুরটা মরে ছিল, ঠিক তার পাশে জগন্নাথ বসেছে। জগন্নাথ এবার জোরে জোরে বয়েকটা শ্বাস টানল। কিশোরীর বুক গুড়গুড় করছিল, এই বুঝি জগন্নাথ ধরে ফেলল। কিন্তু না, জগন্নাথ কোন দুর্গন্ধের কথা তুলল না। একটা পরিষ্কার, খালি বারকোস হাতে শ্রীপদ ঘরে ঢুকল।

বাইরের দোকানে শাঁখে তিনবার ফু দিয়ে কিশোরীর বুড়ো ছেলে অমরনাথ সন্ধ্যা ঘোষণা করল। বছরখানেক হ'ল, অমরনাথ বাপের ব্যবসায় বেরোচ্ছে। কপালে দু'হাত ছুঁয়ে প্রণাম সেরে জগন্নাথ বলল, এবার তাহলে শুরু করা যাক।

অগত্যা ছানার সামনে কিশোরীকে বসতে হ'ল। পরিমাণ মত ছানা হাতে নিতেই তীব্র পচা গন্ধে কিশোরীর বমি এসে গেল। পুরো ছানা নষ্ট হয়ে গেছে। এ মিষ্টি কোন কাজের বাড়ীতে চলবে না। এ সন্দেশ খাওয়ালে শুধু অনাথের নয়, কিশোরীরও প্রচুর দুর্নাম হবে। কিন্তু অবাক কিশোরী লক্ষ্য ক'রল যে, এই পচা, বিশ্রী গন্ধওলা ছানা দিয়ে বেশ সহজ, সাবলীল ভঙ্গীতে জগন্নাথ আর শ্রীপদ সন্দেশ বানাচ্ছে। তাদের মুখচোখে কোন বিকার বা পরিবর্তন নেই। সত্যি, দারুণ বিস্মিত হ'ল কিশোরী। খুঁতখুঁতে, শুচিবায়ুগ্রস্ত জগন্নাথ পর্যন্ত কথাটি বলছে না। ব্যাপার কি? মানুষের নাক, চোখ, জিভের যাবতীয় সংস্কার বদলে গেল নাকি!

কিশোরীকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে জগন্নাথ প্রশ্ন করল, কি হ'লো, তোমার হাত চলছে না কেন?

চটপট একটা কৈফিয়ৎ কিশোরীর মাথায় এসে গেল। কিশোরী বলল, সাংঘাতিক একটা ভুল হয়ে গেছে।

কি ভুল, জগন্নাথ এবং শ্রীপদ প্রায় একসঙ্গে জানতে চাইল।

এখনি একবার অনাথবাবুর কাছে যেতে হবে, কিশোরী বলল, অনাথবাবু বোধহয় গোলাপখাস সন্দেশের কথা বলেছিলেন। একদম খেয়াল করতে পারছি না।

অমরকে পাঠিয়ে দাও, জগন্নাথ পরামর্শ দিল, এক দৌড়ে খবর নিয়ে আসবে।

না, না, আমিই যাচ্ছি, কিশোরী জানাল, এসব ব্যাপারে আমার যাওয়াই ভালো।

হাতের কাজ বন্ধ রেখে, একটু অবাক হয়েই জগন্নাথ আর শ্রীপদ তাকিয়ে থাকল কিশোরীর দিকে। এমন ভুল তাদের মালিকের বড়ো একটা হয় না। সন্দেশের রঙ, গন্ধ, একবার দেখে বা শুঁকে কিশোরী পাল আজীবন মনে রাখতে পারে।

কর্মচারীদের দ্বিতীয় কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কিশোরী দোকানের বাইরে এসে দাঁড়াল। পেঁজাপেঁজা অন্ধকার ধীরে ধীরে জমাট বাঁধছে। উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জে প্রথম বৈশাখের আকাশ এর মধ্যেই ঝলমল করছে। মোলায়েম,

ঝিরঝির হাওয়া শরীরে লাগতে কিশোরীর বেশ আরাম হ'ল। বড়ো বিপাকে পড়েই অনাথের বাড়ীতে ছুটতে হচ্ছে কিশোরীকে। গোলাপখাস বা লেবু সন্দেশের প্রস্তাবে যদি অনাথকে রাজী করানো যায়, তা'হলে ছানার দুর্গন্ধ মারতে কিশোরীকে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। গোলাপ বা পাতিলেবুর সুবাস পছন্দ না হলে বাজারে আরো পাঁচ রকম গন্ধদ্রব্য আছে। রুচিকর একটা সুগন্ধ কিশোরী অনায়াসেই সন্দেশ এনে দেবে। অনাথকে রাজী করানোই এখন প্রধান কাজ। একাজ অমরনাথ পারবে না।

রাস্তার ভীড় কাটিয়ে কিশোরী হনহন করে অনাথের বাড়ীর দিকে হেঁটে চলল। আবছা আলোয় ঘোলাটে হয়ে আছে চারপাশ। কিশোরী জানে, ছানার দুর্গন্ধ জগন্নাথ বা শ্রীপদ টের না পেলেও অনাথের বাড়ীর চল্লিশ, পঞ্চাশ জন আমন্ত্রিতের কেউ না কেউ ধরে ফেলবে। কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। কিশোরী দ্রুত হাটে আর নানা দুশ্চিন্তায় তার মাথা ভার হয়ে ওঠে। ধেড়ে ইঁদুরটা আর মরার জায়গা পেল না। কোথা থেকে ওটা ঢুকল দোকানে! কিশোরীর হঠাৎ মনে পড়ল, লালার দোকানের কথা। তার মিষ্টির দোকানের ঠিক মুখোমুখি লালার রেশনের দোকান। গুদোম ভর্তি চাল, গম আর চিনির বস্তা। লালার দোকানে প্রায়ই ইঁদুরের উৎপাত হয়। তার দোকানঘরের তলায় সম্ভবতঃ ইঁদুরেরা সাম্রাজ্য গেড়েছে। সেখানেই তাদের বসবাস, বংশ বিস্তার। বিষ আর ফাঁদ দিয়ে লালা মাঝে মাঝে ইঁদুর দমনের চেষ্টা করে। ইঁদুর-কলে দু'চারটে ধরা পড়ে, বিষ খেয়েও কিছু মারা যায়। কিন্তু ইঁদুরের বংশ কিছুতেই নির্মূল হয় না। ওই ধেড়ে ইঁদুরটাও হয়তো বিষের যন্ত্রণায় বেতাল হয়ে রাস্তা পেরিয়ে তার ভেনঘরে ঢুকে পড়েছিল। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতেও ছানা খাওয়ার লোভ সামলাতে পারে নি।

কিশোরী আর ভাবতে পারল না। লালা নিশ্চয়ই আজ তার দোকানে ইঁদুর মারার বিষ ছড়িয়েছিল।

পাত্রপক্ষের লোকজন তখনও এসে পৌছোয় নি। কিশোরীর নাম শুনে অনাথ এসে হাজির হ'ল। সন্দেশ, রাজভোগ রেডি, কিশোরীকে হাসি মুখে প্রশ্ন করল অনাথ।

প্রায়, ঢোঁক গিলে কিশোরী জবাব দিল।

কথাটা কিভাবে পাড়বে কিশোরী ঠিক করতে পারল না। অবসন্ন, ক্লান্ত কিশোরীর মুখের দিকে চেয়ে অনাথ সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করল। তারপর পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কতো টাকা হলো?

সংকুচিত, লজ্জিত কিশোরী বলল, আরে ছি ছি, টাকার জন্যে আসি নি। মিষ্টিগুলো কখন পাঠাবো, তাই জানতে এলাম।

এই পরিবারের সঙ্গে কিশোরীর দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই কিশোরীর কথায় অনাথ খুশি হল। বলল, আধ ঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে পাঠালেও চলবে। পাত্রপক্ষ তো এখনো এসে পৌঁছোয় নি।

একটু ইতস্ততঃ করে কিশোরী প্রশ্ন করল, আচ্ছা অনাথবাবু, আপনি তো গোলাপখাস সন্দেশের কথা বলেছিলেন।

কিশোরীর প্রশ্ন শুনে অনাথ যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, না, না, কোন গন্ধটন্ধ নয়, একেবারে প্লেন সন্দেশ। ওতেই তো আপনার হাতযশ।

অনাথের কথায় কিশোরীর পায়ের তলার মাটি কাঁপছিল। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল কণ্ঠনালী। কোনমতে নিজেকে সামলে কিশোরী বলল, আশীর্বাদে একটু গোলাপখাস বা লেবুসন্দেশ দিলে অনুষ্ঠানটার কদর বাড়ে।

তা ঠিক, অনাথ সায় দিল। তারপর যোগ করল, অনেকে সুগন্ধ দেওয়া খাবার পছন্দ করে না। তাছাড়া খাঁটি ছানার নিজস্ব গন্ধের চেয়ে ভালো গন্ধ আর কি হতে পারে? যা স্বাভাবিক, তাই সুন্দর।

কিশোরী বুঝতে পারছিল যে, তার পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাচ্ছে। অনাথকে পটানো সম্ভব নয়। গন্ধ নিয়ে বেশী চাপাচাপি করলে অনাথের মনে অন্য সন্দেহ জাগতে পারে। তবু ডোবার আগে শেষ বার ভেসে ওঠার চেষ্টায় কিশোরী বলল, আমার ঘরে কিছু খাঁটি জাফরান আর টাটকা পেস্তা, বাদাম আছে। সেগুলোই তাহলে কাজে লাগেই।

এ প্রস্তাবেও অনাথ কোন উৎসাহ দেখাল না। কিশোরীকে খুশী করার জন্যে জবাব দিল, ফুলশয্যার তত্ত্বের মিষ্টিতে ওগুলো লাগবে।

আর কিছু কিশোরীর বলার নেই। পরাজিত, হতাশ ভঙ্গীতে অনাথের বাড়ী থেকে বেরিয়ে সে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ওই নষ্ট ছানাতেই সন্দেশ বানাতে হবে। জীবনে এতো বড়ো দুষ্কর্ম আগে কিশোরী কখনো করেনি। বিবেকের দংশনে সে রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু কী করবে সে? ম্লান, গম্ভীর মুখে দোকানে ফিরে সে দেখল, যে, বারকোসের পুরো ছানা নিয়ে জগন্নাথ আর এক দফা মাখছে।

কিশোরীকে দেখে জগন্নাথ প্রশ্ন করল, কি হবে?

যা হচ্ছিল, একদম প্লেন, গন্ধটন্ধ চলবে না, কিশোরী বলল।

কিশোরীকে আর বলতে হ'লনা। জগন্নাথ এবং শ্রীপদ ঝড়ের গতিতে সন্দেশ গড়তে শুরু করল। জামা ছেড়ে, হাত, পা ধুয়ে কিশোরী বারকোসের পাশে গিয়ে বসল। তাকেও হাত লাগাতে হবে। সামান্য ছানা হাতে নিয়ে কিশোরী সন্তর্পণে শু'কে দেখল। মাখামাখির ফলে দুর্গন্ধটা পুরো ছানায়

ছড়িয়ে পড়েছে।" তবে ঝাঁঝ একটু কম। কিন্তু ধরা যায়। রসিক মানুষ জিভে ছুঁয়েই বুঝবে। অতিথিদের মধ্যে রসিক যদি একজনও না থাকে, তবেই কিশোরী রেহাই পাবে। কিন্তু তা হয় না, দু'একজন জহুরি শত উপদ্রবের পরেও থেকে যায়। তাই তো কিশোরীর এত সুনাম। অনিচ্ছা আর অপরাধ-বোধ নিয়ে নিতান্ত ঢিমে তালে কিশোরী সন্দেশ গড়ছিল। মাথায় শুধু একটাই ভাবনা, কাজটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।

রাত আটটা নাগাদ, জগন্নাথ আর শ্রীপদ, দু'রকম মিষ্টি নিয়ে অনাথ চ্যাটার্জীর বাড়ী রওনা হল। এখনো সন্দেশটা আটকে দেওয়ার সময় আছে। এক অদম্য বিবেক কিশোরীকে আলোড়িত করতে থাকল। কিন্তু কিশোরী টু শব্দ করতে পারল না। সে রাতে কিশোরীর ভালো ঘুম হল না। নিদারুণ এক অস্বস্তি আর আত্মগ্লানিতে অন্ধকার বিছানায় কিশোরীর দম আটকে আসছিল। রাতে সে খায়নি। স্ত্রী বিনোদিনীর সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। স্বামীর মুখ, চোখের চেহারা দেখে বিনোদিনীও বেশী কথা বলার সাহস পায় নি।

অন্ধকার ঘরে মাথার ওপর পুরোদমে পাখা ঘুরলেও কিশোরী বেজায় ঘামছিল। মাথার মধ্যে সীমাহীন দুশ্চিন্তা। পচা সন্দেশ নিয়ে অনাথ চ্যাটার্জীর বাড়ীতে হয়তো এখন গণ্ডগোল লেগে গেছে। যে কোন সময়ে এখন অনাথ এসে কিশোরীর সদর দরজার কড়া নাড়তে পারে। রাত বারোটা পর্যন্ত তীব্র উদ্বেগ নিয়ে কিশোরী কান খাড়া করে শুয়ে থাকল। বাড়ীর কোথাও কোন শব্দ হলেই হৃৎপিণ্ডটা ধক করে উঠছিল। কিন্তু রাত বারোটা পর্যন্ত কেউ যখন এলো না, কিশোরী ভাবল, কাল সকাল পর্যন্ত অনাথ অপেক্ষা করবে। অন্য এক সম্ভাবনাও তার মাথায় এল। হয়তো গন্ধ পেয়েও কোন অভিযোগ না করে অতিথিরা সন্দেশ খেয়ে নিয়েছে। যারা মুখে তুলতে পারেনি, তারা পাতের এক পাশে সরিয়ে রেখেছে। রুচিবান, ভদ্র, রসিক লোকেরা তাই করে। কিশোরীর মস্তিষ্কে হঠাৎ এক আশঙ্কা বিদ্যুৎ চমকের মতো জেগে ওঠে। ভয়ে কিশোরী অসাড় হয়ে যায়। এই বিপজ্জনক সম্ভাবনার কথা তার আগেই ভাবা উচিত ছিল। এ ধরণের ঘটনা আগেও কম ঘটেনি। খাদ্যে বিষক্রিয়ার দরুণ এক সঙ্গে বিশ, পঞ্চাশজন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। তার সন্দেশ থেকেও যে বিষক্রিয়া হবে না, একথা কে বলতে পারে! যদি তাই হয়, তাহলে পাত্র পক্ষের দু'একজন লোক নিশ্চয়ই বলবে যে, সন্দেশ নিয়ে তাদের সন্দেহ ছিল। তখন কিশোরী কী কৈফিয়ৎ দেবে? পাড়ায় ঢিঢি পড়ে যাবে। আর এই বিষক্রিয়ায়, ঈশ্বর না করুন, যদি দু'একজন মারা যায়, তাহলে কিশোরী পালের হাজতবাস কে ঠেকাবে? নানা অশুভ চিন্তায় কিশোরীর সারা শরীর

জ্বালা করে। ঝাঁঝা আগুন মাথায় উঠে যায়। দেহ এবং মনের অপরিসীম অস্বস্তিতে কিশোরী বিছানায় ছটফট করে। মধ্যরাতে দু'তিনবার স্নান করেও তার শরীর বা মাথা জুড়োয় না।

ভোরের দিকে কিশোরী একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। অমরনাথের ডাকে চমকে জেগে উঠল। অমরনাথ বলল, অনাথবাবু এসেছে।

আতঙ্কে কিশোরীর মুখ ছাইবর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যুডিলাফ দিচ্ছিল। অনাথের সামনে এখন কোন মুখে সে দাঁড়াবে। তবু কিশোরীকে উঠতে হল। উঠতে গিয়ে কিশোরীর মাথাটা একপাক ঘুরে গেল। অমরনাথ প্রশ্ন করল, কি হ'ল?

রাতে ভালো ঘুম হয়নি, কিশোরী বিড়বিড় ক'রল।

জানলা বন্ধ থাকায় ঘরের মধ্যে পাতলা অন্ধকার জমে আছে। অমরনাথ একটু এগিয়ে এসে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ইস্, তোমার চোখ দুটো যে জবাফুলের মতো লাল হয়েছে।

অমরনাথ এবার হাতের পাতা কিশোরীর কপালে স্পর্শ করল। তারপর বলল, জ্বরও হয়েছে।

দু'পা হেঁটে কিশোরীও বুঝতে পারছিল যে, তার শরীরটা ভালো নেই, পা টলছে। বুকের মধ্যে জমাট সর্দি শ্লেষ্মার ভার। নির্মেঘ, উজ্জ্বল সকালটাকে কেমন বিবর্ণ, ঘোলাটে লাগছে। কিশোরী ভাবছিল, এটা রোগ নয়, পাপ আর অপরাধের মাশুল। এ মাশুল না দিয়ে নিস্তার নেই। তবে এই প্রথম এবং এই শেষ, পাপ আর সে করবে না। সারাজীবন সে সততা আর নীতিবোধে সে অটল, অবিচল ছিল, সেখান থেকে আর নড়বে না। তবু এই মুহূর্তে অনাথের মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতেই হবে। বেতাল পায়ে কিশোরীর হাঁটা দেখে মনে হল, যেন অনিচ্ছুক বলির পশুকে বধ্যভূমির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিশোরী সদর দরজায় পৌছোতে উচ্ছ্বাসে গদগদ অনাথ তার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমটা কিশোরী একটু ভয় পেয়ে গেল। ভাবল, লোকটা মারবে নাকি! কিন্তু না, অনাথ মারল না। ঘটনা ঘটল একেবারে অন্যরকম। কিশোরীর হাত ধরে অনাথ বলল, কি অসাধারণ সন্দেশ কাল আপনি বানিয়েছিলেন। রাজভোগটাও ভালো হয়েছিল। কিন্তু সন্দেশের পাশে দাঁড়ায় না। অতিথিরা পঞ্চমুখে আপনার সন্দেশের প্রশংসা করেছে। বলেছে, এমন মিষ্টি, তারা জীবনে খায়নি। স্বাদে, গন্ধে অতুলনীয়। খাঁটি ছানার গন্ধ কি আর বাজারের সুগন্ধিতে পাওয়া যায়!

বিপদ কেটে যাওয়ায়, দুর্ভাবনামুক্ত কিশোরীর এখন উৎফুল্ল হওয়ার কথা। কিন্তু তার বদলে কিশোরীর চোখের সামনে ঘোলাটে ভাবটা ক্রমশঃ ঘন হ'তে

থাকল। মাথা ঘুরছিল বাঁইবাই করে। কিশোরী ভাবছিল, পৃথিবীর শেষ রসিক লোকটাও মারা গেছে। এরপর সে কিভাবে তার প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধতা, সততা বজায় রাখবে! একটা মরা ইঁদুর তার এতোদিনের শ্রম, নিষ্ঠাকে চোখের পলকে হারিয়ে দিয়েছে। অনাথের শরীর থেকে গত সন্ধ্যের সেই মরা ইঁদুরের বিটকেল, পচা গন্ধটা কিশোরীর নাকে ঢুকছিল। কিশোরী হঠাৎ ভুম করে মাটিতে পড়ে বেহুঁস হয়ে গেল।

অনাথ তো অপ্রস্তুত। প্রশংসা শুনে কিশোরী যে এভাবে ধরাশায়ী হবে অনাথ ভাবেনি। অমরনাথ আর অনাথ, ধরাধরি করে কিশোরীকে শোবার ঘরে আনল। লজ্জায়, সঙ্কোচে অনাথ মাথা তুলতে পারছিল না। এ কী উটকো বিপত্তি! ডাক্তারের পরামর্শে তখনই কিশোরীকে হাসপাতালে পাঠানো হ'ল। কিন্তু কিশোরীর জ্ঞান আর ফিরল না। দুপুরের আগেই তার দেহান্ত হ'ল। ডাক্তার বলল, হার্টফেল।

কিন্তু কেন? এতো স্তুতি এতো প্রশংসা শুনেও একমুখ আতঙ্ক নিয়ে লোকটা যে কেন মরে গেল, এ রহস্য কেউ ভেদ করতে পারল না। শুধু বাড়ির অন্দরমহলে হাউমাউ করে কান্নার ফাঁকে ফাঁকে কিশোরীর বউ বলছিল, অনাথ চাটুজ্জেটা হলো সাক্ষাৎ শনি।

শেষ বিকেলে কিশোরীর দোকানের ভেনঘরের পেছনের রাস্তায় একটা মৃত ধেড়ে ইঁদুরের পচাগলা দেহ নিয়ে কাকেদের ভোজসভা বসেছিল। দারুণ উল্লাসে মরা ইঁদুরটাকে তারা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। কিশোরীর মৃতদেহ নিয়ে দোকানের সামনে এসে শবদাহকেরা হরিধ্বনি দিতে কাকের দল অট্ট চিৎকারে আকাশ কাঁপিয়ে তুলল। মরা ইঁদুরটাকে শ্মশানযাত্রীরা কেউ দেখল না॥

মহাযুদ্ধ

টুল থেকে নেমে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সৌম্য ভিড়ের বাইরে এসে দাঁড়াল। ডানপাশে একটা সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কিনলো এক প্যাকেট। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে মেজাজে সুখটান দিল। বেশ খানিকটা ধোঁয়া বুকে নিয়ে নিবিড় আরামে শব্দ করল, আহ্....। গলগল করে একতাল ঘন কালো ধোঁয়া শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় মিশে গেল।

টুলের ওপর দাঁড়িয়ে এখন প্রণব বক্তৃতা করছে, যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা। যুদ্ধ মানুষের শত্রু। পৃথিবীর একশো কোটি লোক যখন অনশনে থাকে, প্রতি বছর পঞ্চাশ লক্ষ শিশু না খেয়ে মারা যায়, তখন পৃথিবীতে রোজ প্রতি মিনিটে এক কোটি টাকা যুদ্ধ খাতে কেন খরচ করা হবে? ভারতবর্ষের অবস্থা আরো করুণ। চৌত্রিশ কোটি ভারতবাসী আধপেটা খেয়ে থাকে। অথচ, ভারতীয় আটশো যুদ্ধ-বিমানের বাৎসরিক তদারকির খরচের টাকায় বিশকোটি নিরন্ন ভারতবাসীর অন্ন সংস্থান হতে পারে। তবু কেন এই অস্ত্রসজ্জা? কেন বিশ্বজুড়ে সমরাস্ত্রের এই ভয়াবহ প্রতিযোগিতা? এখনি এসব প্রশ্নের জবাব চাই। এসব প্রশ্নের সদুত্তরের ওপর মানুষের বাঁচা, মরা, যুদ্ধ, শান্তি, সব কিছু নির্ভর করছে।

প্রণব অবিবাহিত, প্রণবের অর্থাভাব নেই, তাই প্রণব অসাধারণ বক্তৃতা করে। প্রণবের টুলের চারপাশে মানুষ বাড়ছে। উৎকর্ণ, উদ্গ্রীব সব শ্রোতা। তাদের চোখে মুখে বিস্ময়, সংশয়, কারো বা অবিশ্বাস। দু' চারজন বিরক্ত এবং বিব্রত। অফিস ছুটির সময়ে এসপ্লানেডের মতো একটা ব্যস্ত এলাকায় এভাবে পথসভা করার কোন মানে হয় না। পথসভা ফুটপাথে হলেও ফুটপাথ উপচে ভিড় ক্রমশ রাস্তায় নেমে আসছে। এ ভিড় আরো বাড়বে। সব অফিস এখনো ছুটি হয়নি, সব মানুষ এখনো পথে নামেনি। ভিড় বাড়লে, এসপ্লানেডের এই চৌমাথায় যে ভয়ংকর এক জট পাকিয়ে উঠবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাদের তাড়া আছে, তারা কপাল কুঁচকে এই এলাকা ছেড়ে সরে পড়ার জন্যে দ্রুত হাটা দিল যাদের ব্যস্ততা কম, তারা ভিড়ের গা ঘেঁসে, অথবা সামান্য ব্যবধান রেখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়াল। গঙ্গার ওপারে শালিমার রেল ইয়ার্ডের পেছনে সূর্য ডুবে গেল। আকাশজোড়া

ফিকে লাল রঙ ধীরে ধীরে কালিবর্ণ ধারণ করছে। এক ঝাঁক ছায়া ছায়া অন্ধকার ময়দান ছেড়ে জোর কদমে রাজপথের দিকে ছুটে আসছে।

প্রণব এখন তার বক্তব্যের তুঙ্গ মুহূর্তে এসে পৌঁচেছে। সে বলছে, বাইবেলে কথিত মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা আজ আর নিছক গল্পকথা নয়। যে-কোন সময়ে পৃথিবীতে একটা মহাযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। সেই মহাযুদ্ধ শুরু হলে, যুদ্ধের প্রথম আধ-ঘণ্টায় যতো মানুষ মরবে, তার সংখ্যা এ পর্যন্ত ইতিহাসে নথিবদ্ধ সমস্ত যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির দ্বিগুণেরও বেশী। যুদ্ধের চার ঘণ্টা পরে পৃথিবীতে আর কোন জীবনের শব্দ থাকবে না।

ফ্যাকাসে অন্ধকারে শ্রোতারা স্তব্ধ, মূক। তাদের মুখের অভিব্যক্তি সৌম্য আর দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু প্রণবের প্রতিটা কথা অমোঘ, নিষ্ঠুর এক দৈববাণীর মতো বিবর্ণ বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। কি এক আতঙ্ক, ভয় তার বুকের মধ্যে গড়াতে থাকে। ঘরে তার স্ত্রী আছে, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে আছে। স্ত্রী প্রণতির নিটোল মুখটা সৌম্যর মনে পড়ল। চোখের সামনে ভেসে উঠল দুই শিশুসন্তানের অবোধ দৃষ্টি।

একদা সৌম্যও চমৎকার বক্তৃতা করতে পারতো। তখন ও অবিবাহিত, বাড়িতে খাদ্যাভাব ছিল না। গলায় তেজ, বক্তব্যে যুক্তি এবং প্রকাশভঙ্গিতে অননুকরণীয় সম্মোহন ছিল।

ওর বক্তৃতায় শ্রোতাদের মধ্যে বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে যেত। সে সব দিন আজ গত হয়েছে। সেই উদ্দাম, ঝোড়ো জীবন থেকে দশ-বারো বছর হলো সৌম্য সরে এসেছে। সেই যৌবন, রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত সেই সংগ্রামী মুহূর্তগুলো আজ স্মৃতি, ধীরে ধীরে ধূসর, আবছা হয়ে যাচ্ছে সেই অতীত। অসংখ্য মুখ, অনেক ঘটনা সৌম্য রোজ ভুলে যাচ্ছে। ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। এখন ওর বহু কাজ, নানা দায়িত্ব। স্ত্রী, ছেলে মেয়ে নিয়ে সৌম্যর এখন সাজানো সংসার, সুখী, ভরপুর। টিভি আছে, ফ্রিজ আছে, অদূর ভবিষ্যতে যে একটি গাড়ি হবে না, একথাই বা কে বলতে পারে! অতীতের সেই দুঃসাহস, গোঁয়াতুমি এখন তার সাজে না। সৌম্য এখন যুক্তিবাদী, পরিণত মানুষ। সত্যি কি তাই? কথাটা মনে হতেই ওর হৃৎপিণ্ড দ্রুততালে কয়েকবার নেচে উঠল,। তখনই ওর মনে পড়ল, যে পথসভা শেষ হলে আজই টিভির ইন্স্টলমেণ্ট জমা দিতে হবে। এক পলক থমকে গিয়ে সৌম্য সিগারেটে একটা টান দিল। দু আঙুলের ডগায় আগুনের ছ্যাঁকা লাগতে সৌম্য বুঝল যে, পুড়তে পুড়তে সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তার কানের কাছে মুখ এনে তখনি কে যেন বলল, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

সৌম্য চমকে উঠল। পেছনে দাঁড়ানো লোকটাকে এক লহমায়

মেপে নিল। না, লোক নয়, বছর পঁচিশের এক যুবক। কিন্তু এ কী রকম লক্ষীছাড়া যৌবন। চেহারায় পঁচিশ বছরের শ্রী, সারল্য, দীপ্তি, কিছুই নেই। ময়লা, তাপ্পিমারা শার্ট, আর ঢলঢলে ট্রাউজার্সে ঢাকা, শুকনো, দড়িপাকানো শরীর। দুহাতের ফ্যাকাসে চামড়ার নীচে হরিদ্রাভ শিরাগুলো দলা পাকিয়ে আছে। এ মুখ সৌম্য আগে দেখেনি, একেবারেই অপরিচিত। তবু সৌম্য স্মৃতির আকাশ পাতাল হাতড়াতে থাকল। নিশ্চয়ই কোন প্রাক্তন ছাত্র, যার কথা সৌম্য ভুলে গেছে। গত একযুগ ধরে কম ছাত্র তো সে পড়ায়নি। বিস্ময়, অস্বস্তি চেপে, সাবলীল দৃষ্টিতে ছেলেটার চোখে সৌম্য চোখ রাখল।

অপরিচিত মানুষটা বলল, আমি যুদ্ধ চাই।

সে কী ?

অবাক হচ্ছেন কেন ?

শান্তি না থাকলে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে, মুছে যাবে মানুষের অস্তিত্ব।

মানুষ বলতে আপনি কাদের বোঝাচ্ছেন ?

সব মানুষের কথা বলছি, আপনার কথা, আমার কথা।

আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না। পৃথিবীতে আজ অপার শান্তি থাকা সত্ত্বেও আমি মুছে যাচ্ছি, মরে যাচ্ছি। আমার দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, আমি মরতে বসেছি।

কথা শেষ করে অপরিচিত ছেলেটা সৌম্যের শরীরের সঙ্গে প্রায় সেঁটে দাঁড়াল। তারপর বলল, গত তিনদিন আমি কিছু খাইনি। গত মাসে আমার বাবা মারা গেছে। বাবার টিবি হয়েছিল। আমার বিধবা মা রোজ আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার ভয় দেখায়। যে কোনদিন ভাড়া বাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে মায়ের হাত ধরে আমাকে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হবে।

ছেলেটার স্পর্শ এড়াবার জন্যে সৌম্য সন্তর্পণে এক পা সরে দাঁড়াল। তার সারা শরীর ঘিনঘিন করছিল, গলা শুকিয়ে কাঠ। তবু সে বলল, যুদ্ধ বাঁধলে খেতে পাওয়া দূরের কথা, আপনি প্রাণেও বাঁচবেন না।

ছেলেটা অদ্ভুত চোখে সৌম্যের দিকে তাকাল। কী বুক কাঁপানো, শীতল দৃষ্টি! বলল, আমার মতো মানুষের বেঁচে থেকে কী লাভ!

তবু তো বেঁচে আছেন।

অপরিচিত মানুষটা হঠাৎ আর্ত গলায় ডুকরে উঠল, চাই না, আমি এ-ভাবে বাঁচতে চাই না। আমি যুদ্ধ চাই। । ধ্বংসী, ভয়বহ এক যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে গোটা পৃথিবী এলোমেলো, লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলে হয়তো আমি খেতে পাবো, আশ্রয় পাবো, বেঁচে যাবো।

ভুল, ভুল ধারণা, এ ভাবে বাঁচা যায় না।

তবে, কীভাবে বাঁচা যায় ?

ক্ষুধার্ত, ধারালো দৃষ্টি মেলে ছেলেটা তাকিয়ে থাকল সৌম্যের দিকে।

শান্তি চাই, আজকের এই শান্তি পৃথিবী জুড়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

বাজে কথা, মিথ্যে কথা, পৃথিবীতে কোথাও একবিন্দু শান্তি নেই। আমি প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত যুদ্ধ করছি, নিঃশব্দ, নিষ্ঠুর যুদ্ধ। এবার আমি শেষ যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ দেখতে চাই।

কথা শেষ হতেই ছেলেটা ভয়ঙ্করভাবে কাশতে শুরু করল। শুকনো, খনখনে একটানা কাশির সঙ্গে তার সারা শরীর কুঁকড়ে গেল। তার বুকের ভেতর থেকে সর্বস্ব ভাঙচুর হওয়ার ধাতব আওয়াজ উঠে আসছিল। পকেট থেকে রুমাল বার করে ছেলেটা নিজের মুখে চেপে ধরল। ময়লা, জীর্ণ, একটুকরো কানি কাপড়। রাস্তার আলোয় সৌম্য দেখল যে, ছেলেটার সেই রুমাল রক্তে ভিজে উঠছে।

কাশি থামতে রক্তমাখা ভিজে রুমালে দুটো ঠোঁট মুছে ছেলেটা তাকাল সৌম্যের দিকে। নিজের ভেতর সৌম্য একদম গুটিয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা বলল, রক্ত দেখলেন? আমার রক্ত? যুদ্ধ না চললে কেন এতো রক্ত বেরোচ্ছে আমার শরীর থেকে?

উত্তেজনায় সৌম্যের যুক্তি, বুদ্ধি, সব কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে। ছেলেটা শুধু অসুস্থ নয়, উন্মাদ। এর সঙ্গে বেশী কথা বলা অর্থহীন। ছেলেটার সামনে সৌম্য আর দাঁড়াতে চাইল না। তার মুখের সামনে অসুস্থ মানুষটা বিশ্রী-ভাবে কেশে রক্ত ওগরাল। ওর মহারোগের বিষাক্ত জীবাণু যদি তার শরীরে সংক্রামিত হয়, তাকে অশান্ত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, যুদ্ধপিপাসু করে তোলে, তাহলে তার সমূহ ক্ষতি হবে। তার সংসার আছে, বৌ, ছেলে, মেয়ে, চাকরি, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স আছে। গোলাবারুদে সে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে সে দাঁড়াবে কোথায়! সৌম্য ঠিক করল, বাড়ি ফিরেই গরম জলে ডেটল মিশিয়ে সাবান মেখে ভালো করে স্নান করবে।

বক্তৃতা শেষ করে প্রণব কথা বলছে একজন শ্রোতার সঙ্গে। আজকের শেষ বক্তা রতন শুরু করেছে তার ভাষণ। সংগঠনের কেউ একজন এসে এখন সৌম্যকে ডাকলে সে বেঁচে যায়। কিন্তু কেউ ডাকছে না। সকলেই ভাবছে যে, সৌম্য বোধ হয় কোন পরিচিত বন্ধু বা ছাত্রের সঙ্গে গল্প করছে। ছেলেটা হঠাৎ বলল, চলুন, কার্জন পার্কে বসে কথা বলি।

তার প্রস্তাব শুনে উদ্বেগে, আশঙ্কায় সৌম্য কেঁপে উঠল। এই অসুস্থ, উন্মাদের সঙ্গে অন্ধকার কার্জন পার্কে বসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া,

অপরিচিত, অজ্ঞাতকুলশীল কারো সঙ্গে বসে এ ধরনের ঘনিষ্ঠ আলোচনা বা খোসগল্প করতে সৌম্যের রুচিতে বাধে। কিন্তু এ ছেলেটাকে কাটাবে কী করে! সৌম্যের অন্তরাত্মার ভেতর থেকে কে যেন বলল, যেও না, ওর সঙ্গে যেও না, গেলে বিপদে পড়বে।

সন্ধ্যারাতের জনবহুল ধর্মতলা। সব আলো জ্বলে উঠেছে। তবু এক আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় সৌম্য শিউরে উঠল। শীত করছিল তার। পাঞ্জাবির ভেতরের পকেটে টিভির কিস্তির টাকা রয়েছে। এই বিপজ্জনক ছেলেটা হয়তো জানতে পেরেছে সে খবর।

ভয় পেলেন, ফিসফিস প্রশ্ন করল ছেলেটা।

সৌম্য কেঁপে উঠল। পাল্টা প্রশ্ন করল, ভয়? কীসের ভয়?

হারাবার ভয়। হারাবার মতো জিনিস তো আপনার কম নেই, সংসার, চাকরি, ব্যাঙ্কব্যালান্স এবং আরো নানা কিছু।

সৌম্যের বলতে ইচ্ছে করল, ভাই, তোমার রুটি, রুজির লড়াই আর শান্তির জন্যে আমার লড়াই, এদুটো কিছু আলাদা নয়, এক এবং অভিন্ন।

কিন্তু বড়ো কেতাবী, সাজানো শোনাবে কথাটা, তাই সে বলল না। তাছাড়া, সে ভয় পাচ্ছিল যে, তার কথা শুনে ছেলেটা হয়তো প্রশ্ন করবে, কোন লড়াইটা এ মুহূর্তে জরুরী? আমার প্রতিদিনের যুদ্ধে আপনার ভূমিকা কি?

সৌম্যের কথা শোনার জন্যে অসুস্থ মানুষটার কোন আগ্রহ ছিল না। নীরব, বিহ্বল সৌম্যের দিকে না তাকিয়ে ছেলেটা আপনমনে বকে যাচ্ছিল, আমার কিছুই হারাবার নেই'। পৃথিবীর জ্ঞান, শিক্ষা, সম্পদের আমি এক কণাও পাইনি। আজন্ম অবিরাম যুদ্ধ করছি, এই যুদ্ধে না জেতা পর্যন্ত আমি সমস্ত শান্তির বিরোধী। আমি যুদ্ধ চাই।

অপরিচিত ছেলেটা আবার ভীষণ কাশছিল। উদ্গত রক্তবমন গিলে নেওয়ার জন্যে পকেট থেকে রক্তমাখা কাপড়ের টুকরোটা সে আবার টেনে বার করল।

তখন পথসভা শেষ করে প্রণব এসে পড়ায় সৌম্য বেঁচে গেল। প্রণব বলল, দারুণ সভা হয়েছে। গ্র্যাণ্ড্ সাকসেস্।

বিধ্বস্ত, ক্লান্ত সৌম্য তাকাল প্রণবের দিকে। সৌম্যর দৃষ্টি শূন্য, বিশ্বাসহীন। বাঁ পাশে নজর ফেলে সেই অচেনা আগন্তুককে সৌম্য আর দেখতে পেল না। রহস্যময় মানুষটা কিন্তু সৌম্যের বুকে মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত এক জরুরী প্রশ্নের তীক্ষ্ণধার গজাল বিঁধে দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। একটা দমকা কাশির চোটে সৌম্যের বুকের রক্ত মুখে উঠে আসতে চাইছিল। সৌম্য বুঝতে পারল, হাজার বক্তৃতাতেও আসন্ন, অনিবার্য সেই যুদ্ধকে ঠেকানো যাবে না॥

মায়াবৃতা

ছায়া বলল, আমাকে মুক্তি দাও, আমি আর পারছি না।

কী হয়েছে তোমার, আমি প্রশ্ন করলাম, এত ভেঙে পড়ছো কেন?

ছায়া বলল, মানুষের বড়ো কষ্ট, দিনরাত তারা কাঁদছে, মারামারি করছে, মারছে, মরছে, এত দুঃখ, কষ্ট, কান্না আমি সহ্য করতে পারছি না।

অসহায়, আর্ত ছায়ার ধূসর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, শান্ত হও, বসো, তারপর কথা হবে।

আর কোন কথা নয়, ছায়া বলল, আমি মুক্তি চাই।

একটু বিরক্ত হলেও গলার স্বর সহজ, স্বাভাবিক রেখে আমি বললাম, দ্যাখো, তুমি হলে আমার ছায়া, রক্তমাংসের মানুষ নও, সুখ, শোক, সম্মান লাঞ্ছনা, কিছুই তোমার গায়ে লাগার কথা নয়, তা সত্ত্বেও তুমি যদি এত ভেঙে পড়ো, ছটফট করো, তাহলে আমার মতো রক্তমাংসের মানুষের কি দশা হয় বলোতো? তোমার মনে রাখা উচিত যে, তুমি আমার অংশ, আমার শরীর থেকেই তোমার জন্ম, আমার জন্যে তোমার কিছু করার আছে।

আমার কথায়, গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে, ছায়া বেশ নরম হয়ে গেল। এক মুহূর্ত পরে প্রশ্ন করল, আর কতদিন?

আমি বললাম, যথাসময়ে জানাব, এখন তুমি বাজারটা করে নিয়ে এসো।

রেশনের থলি হাতে করুণ মুখে ছায়া বাজারে বেরিয়ে গেল। বাইরে ঠা-ঠা রোদ, পৃথিবী পুড়ছে, মানুষ আর মানুষের মন পুড়ছে। বাজারে যেতে হল না বলে দারুণ আরামে আমি লম্বা একটা শ্বাস ফেললাম। চেয়ারে শিথিল শরীর এলিয়ে দিতে আয়েশে বুজে এলো আমার দুচোখ। নিজের ছায়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। মুখে যাই বলি, আমি জানি, ছায়ার মুক্তি নেই, কোনদিন আমি মুক্তি দিতে পারব না ছায়াকে। দেবই বা কেন? অনেক দিনের কঠোর শ্রম আর সাধনায়, নিজের এই ছায়া, আমার শরীর থেকেই যার জন্ম, তাকে আমি তৈরী করেছি। সমাজ, সংসারের নানা ঘটনায় বিরক্ত, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে অন্য ধরনের একটা জীবন, যে জীবনে গভীর-ভাবে লিপ্ত থেকেও আমি নিঃস্পৃহ, নিরাসক্ত, উদাসীন নিছক একজন দর্শক, সবেতে থেকেও কারো সাতে পাঁচে নেই, সেই জীবনের কথা অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম।

সামান্য একটা পারিবারিক ঘটনার সুবাদে, বছর দুয়েক আগে এই অভিনব চিন্তাটা আমার মাথায় এসেছিল। সেদিনের সেই ঘটনাটা সামান্য হলেও আমার মর্মমূল পর্যন্ত নাড়িয়ে গিয়েছিল। এক রাতে খাবার টেবিলে স্ত্রী, ছেলে, মেয়ের সঙ্গে খেতে এসেছি। হঠাৎ কী একটা কথার মাঝখানে, আমার মেয়ে অলি, বয়স দশ, বলে উঠল, বাবা তুমি এত 'আমি' 'আমি' করো না। একটু আগে, অন্য এক প্রসঙ্গে আমার স্ত্রী, মল্লিকা, ঠিক এই কথাটাই বলেছিল। মল্লিকার কথায় আমল না দিলেও দশ বছরের মেয়ের মুখে একই কথা শুনে আমি কেঁপে উঠেছিলাম। লজ্জা, গ্লানি, অপমানে আমি শব্দহীন। বড়ো ছেলে প্রীতীশ, বয়স চোদ্দ, পাশের চেয়ারে বসে মিটিমিটি হাসছে, না তাকিয়েও আমি টের পাচ্ছিলাম তার হাসি। ঘরের ভেতরটা গুমোট, খাওয়ার টেবিলে শুধু মুখ নড়ার শব্দ, চুপচাপ চারটে রুটি চিবিয়ে টেবিল ছেড়ে আমি উঠে পড়েছিলাম।

টেবিলে সেদিন লেখাপড়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। রোজ রাতেই হয়। আলোচনার সময়, লেখাপড়া ছাড়া গান, নাটক, খেলা, আবৃত্তি, নানা বিষয় এসে যায়। সেই রাতে আমি নিজের স্কুলজীবনের কথা বলছিলাম। খালি পা, দড়ি লাগানো ইজের আর গেঞ্জি পরে রোজ স্কুলে যেতাম। আমাদের বাড়ি থেকে স্কুল ছিল মাইল দেড়েকের পথ। মাটির কাঁচা রাস্তা। প্রথম বর্ষায়, রাস্তায় চটচটে কাদা, যাতায়াতের সময় দু'একবার আছাড় খেতাম। ইজের, গেঞ্জি, কাদায় মাখামাখি, সেগুলো পরেই দিন কেটে যেত। চেপে বর্ষা নামলে রাস্তার পিচ্ছিল ভাবটা কেটে গিয়ে এক হাঁটু কাদা জমত। হড়হড়ে ঘন কাদা। সে কাদাতেও অনেকবার আমার পতন ঘটেছে। রাস্তার চেহারা, শীতের সময় বদলে যেত। সকালে শিশির ভেজা, বিকেলে ধুলো, গ্রীষ্মে ধুলোয় ডুবে যেত দু' পায়ের গোড়ালি। তার মধ্যেই আমাদের স্কুল, লেখাপড়া, সাধ, আহ্লাদ, স্বপ্ন। ইউনিফর্ম নেই, স্কুলবাস বা খাবার ভরা টিফিনের বাক্স নেই, আকাশ মাঠ, পুকুর, গাছগাছালি আমাদের সব শূন্যতা ভরে দিয়েছিল। প্রথম এক জোড়া জুতো, ঠিক জুতো নয়, বিদ্যাসাগরী চটি পেয়েছিলাম, ক্লাস থ্রি-তে। লেখাপড়াতে খুব খারাপ ছিলাম না, প্রথম তিন, চার জনের মধ্যে জায়গা পেতাম। দু'একবার জীবনে ঠকেছি, কিন্তু কোথাও ঠেকে যাইনি। ছেলেবেলার সেই ট্রেনিং বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাকে।

ঠিক তখনই ব্যাজার মুখে মল্লিকা বলেছিল, অতো আমি আমি কোরো না।

মল্লিকার কথা গায়ে না মাখলেও মেয়ের মুখেও ঠিক ওই একই কথা শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল আমার মুখ, মুখের ভেতরটা বিস্বাদ। রাতে বিছানায় শুয়ে আমি ঘুমোতে পারছিলাম না। অস্বস্তি খচখচ করছিল মাথার মধ্যে।

একটা কথাই ভাবছিলাম, সত্যি কী আমি সারাদিন শুধু আমি আমি করি? আমি শব্দটা আজ কতবার বলেছি? অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে মনে মনে হিসেব করলাম, সেদিন যত জায়গায় গেছি, যত জনের সঙ্গে কথা বলেছি, সব মিলিয়ে আমি, আমার, আমাকে, এই তিনটে শব্দ দেড় হাজার বার, সামান্য কম বেশি হতে পারে, আমি উচ্চারণ করেছি। হিসেব করে লজ্জায়, অনুতাপে, আতঙ্কে গুটিয়ে গিয়েছিলাম আমি। কী সর্বনাশ, আমি শব্দ-টা সারা দিনে এতবার কেন আমি বললাম? রোজই কী বলি? আমি কে? আমি কেন? সারাদিনে এতবার আমি শব্দটা উচ্চারণ করার অধিকার কী আমার আছে? ভয় আর অসহায়তায় আমি কুঁকড়ে গেলাম। অন্ধকার ঘর, আমার পাশে প্রীতীশ ঘুমোচ্ছিল। পাশের ঘরে মেয়ে অলিকে নিয়ে মল্লিকা, তারাও ঘুমিয়েছে। নিঃশব্দ ফ্লাট, শুধু আমি, সূচীভেদ্য, তীক্ষ্ণ নানা প্রশ্নের খোঁচায় ছটফট করছিলাম। কানের পাশে নাচানাচি করছিল কয়েকটা শব্দ আমি, আমার, আমাকে। আমি ভাবছিলাম, কি মুখ্যু, গাড়োল, আহাম্মক আমি। সারাদিন নানা অজুহাতে শুধু আমি আমি করছি, নিজেকে জাহির করার কী আপ্রাণ চেষ্টা, অথচ আমি কেউ নই, একথা সকলে, এমন কী আমার দশ বছরের মেয়েটা পর্যন্ত জেনে গেছে।

ঘুম ছুটে গিয়েছিল, তেষ্টায় বুক খাখা, গলা কাঠ, নিজেকে ছিছি করছিলাম, ধিক্কার দিচ্ছিলাম আমি। নিজের অতীত, ভবিষৎ আর বর্তমানকে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম। আজকের আমির সঙ্গে আমার অতীতের আমির বিশেষ মিল নেই। আজকের আমি ম্লান, নিষ্প্রভ, ছাপোষা মানুষ। ছেলে-বেলায়, কৈশোরে, ছাত্রজীবনের নানা পর্বে এক উজ্জ্বল আমি যে নানা সম্ভাবনা প্রতিশ্রুতিতে বারবার ঝলসে উঠত, তার দেখা স্কুল, কলেজের মাস্টারমশাইরা, আত্মীয়, বন্ধু, সকলেই পেয়েছিল। সে ছিল চৌকস, অসাধারণ প্রতিভাধর এক তরুণ, কোন বিষয়ে তাকে যে কেউ ঠেকাতে পারবে না, পরিচিতজনেরা এ কথা বলাবলি করত। সকলের প্রত্যাশা, বিস্ময়ের খবর সেদিনের সেই আমিও জেনে গিয়েছিল। নিজের সফলতা, সিদ্ধি সম্পর্কে সে এত অসংশয়, নিশ্চিন্ত ছিল যে, সারাদিনে সে একবারও আমি আমার আমাকে, এই শব্দগুলি মুখে আনার সময় পেত না। সকলেই তখন তাকে নিয়ে ব্যস্ত, মাতামাতি করছে, এত অসংখ্যবার তার নাম উচ্চারিত হচ্ছে যে, সেখানে আমি, আমার, আমাকে বলার মতো অবসর বা ফাঁক নেই।

অথচ এখন আমি সারা দিন আমি আমি করি। আজ আমি অতি তুচ্ছ, সাধারণ, সব রঙ, চাকচিক্য মুছে গেছে, কোনদিন যে আমার মধ্যে কিছু সম্ভাবনা বা প্রতিশ্রুতি ছিল, আজ আমাকে দেখলে সেটা বিশ্বাস করা কঠিন। নিজের

বিবর্ণ, পলকা, এলেবেলে জীবনের কথা ভেবে সে রাতে দারুণ কান্নায় ছলছল করছিল আমার অস্তিত্ব, বিছানা, ফ্ল্যাট, অন্ধকার পৃথিবী। ভাবছিলাম, আজ আমার কী আছে? কিছুই নেই। কোম্পানির চাকরি, তাদের পরিচিতি আমার পরিচয়, পরের বাড়িতে আমি ভাড়াটে, সংসারের দামী জিনিসগুলি, ফ্রিজ, টিভি, এমন কি বসার এবং শোওয়ার ঘরের সব আসবাব ধারবাকিতে কেনা। মাসের কিস্তি বাকি পড়লে বিক্রেতারা এগুলি টেনে নিয়ে যাবে। অথচ আমি সেকথা ভুলে গিয়েছিলাম। কেন ভুলে গেলাম?

না ঘুমিয়ে সে রাতটা কেটেছিল। পরদিন অফিস গেলাম না। তাৎপর্যহীনতা, অপমান, গ্লানি কুরে কুরে খাচ্ছিল আমাকে। দু'একদিনের নিমগ্ন চিন্তার পর ঠিক করলাম, আর নয়, একেবারে আলাদা রকমের একটা জীবনের খোঁজ করতে হবে। শুরু করলাম, হঠযোগ। বছর খানেক যোগ চর্চার পরে আমি যা চাইছিলাম, শরীর থেকে ছায়াকে আলাদা করতে পারলাম। তারপর আমাকে পায় কে? সেই থেকে আমার সব কাজ, অফিস যাওয়া, দোকানবাজার করা, ছেলেমেয়েদের পড়ানো, মড়া পোড়ানো, কাউকে জুতো পেটা করা বা নিজে জুতো পেটা খাওয়া, দিনে পাঁচশো বার আমি বলা, সবটাই ছায়া করে, ছায়ার ওপর দিয়ে যায়। অখণ্ড অবসর পেলাম আমি। কিছুদিনের জন্যে পৃথিবীতে যেন বেড়াতে এসেছি, এমন হল আমার মেজাজ, চালচলন। রেকর্ডপ্লেয়ারে সারাদিন গান আর সেতার শুনি, ভালো ভালো বই পড়ি, সন্ধ্যেবেলা স্নান করে পাউডার মেখে, পাঞ্জাবি পরে নাটক বা সিনেমা দেখতে যাই। সারাদিনের পরিশ্রমে, উদ্বিগ্ন, ক্লান্ত, অবসন্ন আমার ছায়াটা আবছা অন্ধকার বিছানায় ভিজে ন্যাকড়ার মতো লুটিয়ে থাকে। বেচারিকে দেখে আমার কষ্ট হয়, বুকের ভেতর রিনরিন করে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবি, ও তো আমার ছায়া, ওর সুখ অসুখের বোধ নেই, থাকলেও সে সব ওকে মেনে নিতে হবে, পার্থিব শোক, সুখ, অপমান, গ্লানির সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াব না। আমি দর্শক, সব কিছুর বাইরে, আমার কাজ দেখা, উপভোগ করা। আমি শুধু দেখবো, আমিত্বহীন আমি, আমি নেই।

জীবন সম্পর্কে এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে আমার একটা ধারণা হয়েছে। জীবন মানে দুঃখ, দুর্ভোগ, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা, মৃত্যু। সুখ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু জীবনের এই মহাসমুদ্রে সুখ হ'লো বুদ্বুদ, বুজকুড়ি, দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, গ্লানি হলো ঢেউ, বিশাল, আকাশছোঁয়া অবিরাম ঢেউ, পরপর ছুটে আসছে, ছুটি নেই, কামাই নেই। এইসব ভয়ংকর ঢেউয়ের মাথায় ছায়াকে রেখে সুখের বুজকুড়িগুলো নিয়ে আমাকে থাকতে হবে। ছিলামও তাই। চাকরি, সংসার, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, আমার ছায়াকে নিয়ে দারুণভাবে

মজেছিল, মূল লোকটা যে কখন নিঃশব্দে সরে গেছে, এটা কেউ টের পায়নি।

কিন্তু গণ্ডগোলটা বাধল ধীরে ধীরে, অন্য জায়গায়। প্রথম কিছুদিন বেশ খুশিমনেই আমার সব কাজ, দায়িত্ব, ঝামেলা, ছায়া নিজের কাঁধে তুলে নিল। কিন্তু ছ'মাস না যেতেই শুরু হল তার ক্ষোভ, অভিযোগ। আমার উদ্বেগহীন, সুখী উদাসীন জীবনে তার ক্ষোভ, অভিযোগ কোন আঁচড় কাটল না। কিন্তু আমিও বিব্রত, বিরক্ত হচ্ছিলাম। হঠযোগ, গানশোনা, কবিতাপড়া বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু ছায়ার ঘ্যানঘ্যানানি, মুক্তি দাও, ছেড়ে দাও আমাকে, আমি আর পারছি না, মানুষের বড় দুঃখ, কষ্ট, মানুষ কাঁদছে, আমার সহ্য হয় না, পৃথিবীতে আমার থাকার আর কোন ইচ্ছে নেই, ক্রমশ বেড়েই চলল। আমি প্রায়ই তাকে বোঝাই, সান্ত্বনা দিয়ে বলি, ঠিক আছে, খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে ছেড়ে দেব। কখনও বলি, এসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না, মানুষের দুঃখ, কষ্ট, এমনকি মানুষ এবং এই পৃথিবীটাও অলীক, মায়া, স্বপ্নের মতো, আর কেউ না জানুক, তুমি তো ছায়া, দণ্ডমান এই ছায়াবাজি তোমার বোঝা উচিত।

আমার কথা শুনে সেদিন ছায়া বলল, আজ একজন আমাকে শুয়োরের বাচ্চা বলেছে।

সন্ধ্যের অন্ধকারে বাড়ির ছাতে ফুরফুরে হাওয়া আর ফুলের গন্ধে আমি বুঁদ হয়ে বসেছিলাম। ছায়ার অভিযোগ শুনে বললাম, যে লোকটা তোমাকে গাল দিয়েছে, সে এবং শুয়োর দুটোই অবাস্তব, মায়া, ওসব তুমি ভুলে যাও।

একদিন মাঝদুপুরে ছায়া অফিস থেকে ফিরতে তাকে দেখে মল্লিকা, প্রীতীশ, অলি হৈচৈ জুড়ে দিল। এসব হৈচৈ, উত্তেজনায় আজকাল আমি কান দিই না। বিকেল বেলায় আমার বিছানার পাশে ছায়া এসে বসল, তার কপালে ব্যাণ্ডেজ, ফোলা মুখ। ভাঙা গলায় ছায়া বলল, আজ একজন মেয়ে আমার দুটো দাঁত ফেলে দিয়েছে।

কান্নায় বুজে আসছিল তার গলা। সে হাঁ করতে দেখলাম, তার ওপরের পাটির সামনের দুটো দাঁত নেই, ফোকলা।

সান্ত্বনা দিয়ে ছায়াকে বললাম, শরীর ভঙ্গুর, পদ্মপাতায় জল, দাঁতও তাই, আজ আছে কাল নেই, স্রেফ মায়া।

টকটকে লাল, রাগী চোখে আমার দিকে একপলক তাকিয়ে বিছানা ছেড়ে ছায়া উঠে গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার শান্ত, নিরুপদ্রব জীবনে একটা ভয়ঙ্কর বিপদ, কালবৈশাখীর ছারখার করা ঝড়ের মতো ক্রমশ ঘনিয়ে উঠছে। ইতিমধ্যে ছায়ার সঙ্গে আমার একটা লুকোচুরি খেলা, শব্দহীন, জটিল দ্বৈরথ শুরু হয়েছে। ছায়াটা প্রায়ই চুপচাপ আমার শরীরের

মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে। আমি ঠেকাচ্ছি, সে সরে যাচ্ছে, কিন্তু সে যাওয়া সাময়িক, ফিরে এসে আবার আমার রক্তমাংসের আশ্রয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ার জন্যে ওত পেতে অপেক্ষা করছে। ফলে গান, কবিতা, চাঁদ, ফুল, ফুরফুরে হাওয়ায় তৈরি আমার জীবনের প্রগাঢ় মৌতাত প্রায়ই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ভারি বিরক্ত হচ্ছিলাম আমি। যে আমিকে ছায়ার ঘাড়ে চাপিয়ে, আমি, আমার, আমাকে শব্দগুলো মরা মাছির মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, সেই শব্দগুলো আবার যেন পুনর্জীবন পেয়ে প্রায়ই আমার কানের চারপাশে ভনভন করতে শুরু করল। শাস্ত্রপড়া, যোগাভ্যাসের সময় আমি বাড়িয়ে দিলাম। ছায়ার সঙ্গে আমার দূরত্ব আর ব্যবধান বেড়ে গেল। বেশ কয়েকমাস আমার ওপর নানাবিধ উৎপাত করে ছায়া ধীরে ধীরে শান্ত, নম্র হতে থাকল। বন্ধ হয়ে গেল তার ঘ্যানঘ্যানানি আর মুক্তির জন্যে আকুলতা। বেশ বড়ো কিছু একটার যেন মুখোমুখি হচ্ছে সে, তার চালচলন, চাহনিতে এমন এক গভীর নিমগ্নতা ফুটে উঠল।

মাঝে কিছুদিন মল্লিকা, প্রীতীশ আর অলির সঙ্গে সে খুব নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন আচরণ করেছিল। মল্লিকাকে না জানিয়ে তার একটা সোনার বালা, দাম প্রায় দু'হাজার টাকা, আলমারি থেকে গোপনে নিয়ে ছায়া বিক্রি করে দিল। সেই টাকায় কয়েকদিন বিপুল ফূর্তি করল সে। ঘটনাটা জেনে সংসারে তুলকালাম অশান্তি, কেঁদে, ককিয়ে, চেঁচিয়ে মল্লিকা বাড়ি মাথায় করেছিল। নিয়মিত সংসার খরচের টাকাটাও ছায়া তখন দিত না। মাঝরাতে মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরত। এক বিকেলে, অলি ভীষণ অসুস্থ, ডাক্তার ডাকার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে ছায়া শ্রীরামপুরে চলে গেল। সারারাত বহুবিধ লাম্পট্য করে বাড়ি ফিরেছিল পরের দিন সকালে। অলি তখন যায় যায়, ধুঁকছে। তবু, সে যাত্রা কোনমতে বেঁচে গিয়েছিল মেয়েটা। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, আমাকে ব্যস্ত, বিব্রত, বিরক্ত করার জন্যে এসব ছায়ার কারসাজি, আমার আত্মমগ্ন, নিশ্ছিদ্র সুখের জগৎটাকে সে ভেঙে তছনছ করে দিতে চায়, বাড়ির ছাতের সাজানো বাগান থেকে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায় শান বাঁধানো ফুটপাতে। কিন্তু আমি অটল, অবিচল, নিষ্কম্প, উদাসীন, সংসারের ছায়াবাজি আর রগড় দেখে শুধু হাসি।

সংসারের প্রতি অবহেলা, নিষ্ঠুরতা আর লাম্পট্যের পাশাপাশি অফিসের কাজেও ছায়া ফাঁকি দিতে শুরু করল। যখন তখন অফিস কামাই, চেয়ারে বসে ঘুম, একটা ফাইল নিয়ে দিনের পর দিন সময় কাটানো আর গেঁতোমি, সেই সঙ্গে প্রতিনিয়ত তার মুখে আমি আমি, রোজ অন্তত হাজার বার, এসবই যে আমার বিরুদ্ধে ছায়ার প্ররোচনা, জেহাদ, প্রতিশোধ নেওয়ার

তীব্র ইচ্ছে. এটা বুঝতে আমার অসুবিধে হয় নি। সাংসারিক সমস্যা, অনটন, দুর্ভোগ, অফিসে কর্তাদের হুমকি, বন্ধুদের হাসাহাসি, বিদ্রূপ, ডবল্ ডেকারের হাওয়া ব্রেকের পিলে চমকানো হঠাৎ তীক্ষ্ণ আওয়াজ, যত বাড়ছিল, ছায়ার শ্বাসের শব্দ যত গভীর, ফ্যাঁসফেসে হচ্ছিল. ব্যাপ্ত, ঘন হচ্ছিল, তার চোখের তলার কালি, পরিশুদ্ধ শূন্যতায় আমি তত মগ্ন, বিভোর হয়ে যাচ্ছিলাম। এই শব্দহীন যুদ্ধ আর টানাপোড়েনে হেরে গিয়ে ছায়াও একসময় ক্লান্ত, অবসন্ন, একা হয়ে গেল। আমার কথা, আমার শরীর থেকে যে তার জন্ম, এটা সে ভুলে গেল। সে ভাবতে শুরু করল, সে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র এক অস্তিত্ব, পৃথিবীতে তার অনেক দায়, কাজ, ধীরে ধীরে সে খুব নিয়মনিষ্ঠ, সংসারী, কর্মী মানুষ হয়ে উঠল।

যত তার এই পরিবর্তন হতে থাকল, তত বাড়তে থাকল আমার অস্থিরতা, কবিতা, গান, কুসুমসজ্জিত আমার কলঙ্কহীন জীবনে বিপন্নতার ধূসর কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ল। ছায়ার গতিবিধি এবং পরিবর্তনের কারণগুলো জানার জন্যে আমি খুব কৌতূহলী হলাম। কেন এই বদল, সেটা জানার আগ্রহ তীব্র হল। ছায়ার গতিবিধি কাজ, কথা, সব আমার নখদর্পণে, কিন্তু এতদিন তার কোন ব্যাপারে আমি উৎসাহ দেখাইনি, তার সুখ, শোক, ইচ্ছা, অভিমান, ব্যর্থতা আর গ্লানি, সবটাই তার, পাঁক আর কাদার মতো, কোন মহত্ব, শুদ্ধতা নেই, এসব আমার জানা, অভিজ্ঞতা, তাই কখনও কোন আগ্রহ দেখাইনি। কিন্তু হঠাৎ তার প্রশান্তি, সংযম, নিরুদ্বেগ তৃপ্তি, ভারি অবাক করল আমাকে। সেই সঙ্গে ছিল আমার মনের প্রচ্ছন্ন ছটফটানি, ছায়া কেন এমন নিটোল, পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে, আর আমি, যে জ্ঞানী, যোগী, শুদ্ধ, মুক্ত সে কেন এত শুকিয়ে যাচ্ছে, এটা জানতে হবে।

কয়েকদিন ছায়ার পাশাপাশি, ঘনিষ্ঠ হয়ে লেগে থাকতে, এক বিকেলে রহস্য কাটল। দেখলাম, এক নির্জন মাঠে একজন মহিলার মুখোমুখি ছায়া বসে আছে। মহিলাটি তরুণী বা যুবতী নয়, একটু বয়স হলেও খুব তাজা, সজীব, শ্রীময়ী, তার দুচোখে স্নিগ্ধ হাসি, কোমলতা, নিঃশ্বাসে চন্দনের হাল্কা সুবাস। হাসি আর সুবাস মিশিয়ে সেই নারী, তাকিয়ে আছে ছায়ার দিকে। তার দু চোখের করুণাঘন চাহনির দিকে নজর রেখে ছায়া মুগ্ধ, রোমাঞ্চিত, শব্দহীন। সবুজ ঘাসে ঢাকা সেই মাঠ, চারপাশে ছোট বড়ো অনেক গাছগাছালি, মাঝখানে একটা বড়ো দীঘি, স্বচ্ছ, টলটলে জল, ফুরফুর করে বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া, এক পাখি মায়াবী গলায় কোন একটা গাছের ডাল থেকে একনাগাড়ে ডেকে চলেছে।

স্তব্ধ ছায়ার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, কিছু বল।

কী বলবো, আবছা গলায় ছায়া জানতে চাইল।

যা ইচ্ছে।

ভারি ভালো লাগছে আমার।

আমারও, সেই নারী ফিসফিস করল।

দুজনে আবার শব্দহীন, মুগ্ধ, আবিষ্ট, পৃথিবীতে যেন সুখ নেই, শোক নেই, জরা, গ্লানি, পাপ, পাঁক, হতাশা ক্লান্তি, জন্ম মৃত্যু নেই, থাকলেও তার মধ্যে আছে আবহমান জীবন, এক মহৎ উদ্ধার, সেই উদ্ধারের মন্ত্র আর চাবি ছায়া পেয়ে গেছে, অথচ এটা আমার পাওয়ার কথা, আমি পাই নি, হেরে গেছি।

ছায়া বলল, নির্ভেজাল শুদ্ধতার জন্যে আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই।

নারীটি বলল, আমারও নেই।

ছায়া বলল, শোক, দুঃখ, হতাশা, অপমানের মধ্যে দিয়ে এক উজ্জ্বল আলোর কাছাকাছি আমি পৌঁছে গেছি।

আমিও, মেয়েটি জানাল।

পরস্পরের মুখের দিকে তারা দুজন তাকাল, তাদের চোখের মণিতে ঝিকমিক করছে আলো আর উজ্জ্বলতা। সবুজ মাঠ, প্রকৃতি, পৃথিবী, আকাশ অলৌকিক পরিত্রাণে মেদুর হয়ে আছে।

ছায়ার বিরুদ্ধে বিষ হিংসে, তীব্র রাগে চনমন করে উঠল আমার মাথা, রক্ত, শরীর। কিন্তু আমি অসহায়, কী করবো? সে রাতে, সেই প্রথম, ছায়ার পাশে শুয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম আমি, এতকাল ছায়া কাঁদতো, আমি হাসতাম বা ঘুমিয়ে পড়তাম, কিন্তু আমার কান্না শুনে ছায়া সস্নেহে আমার কপালে হাত রাখল, বলল, কেঁদো না, তুমি আর আমি এক, কিছুদিন ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, আবার আমি আসছি তোমার কাছে, পৃথিবী মায়াময়, খুব সুন্দর, মায়াময় বলেই বোধহয় এত সুন্দর, ভারি ভালো লাগছে আমার॥

নাকচ

সুমন্ত আত্মহত্যা করল।

কেন, কীভাবে সুমন্ত আত্মহত্যা করল, সে সব খুঁটিনাটি তথ্যের চেয়ে আমার কাছে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো, সুমন্ত যে আত্মঘাতী হবে, মৃত্যু যে তার অনিবার্য, এটা সাতদিন আগে যেদিন সুমন্তর বাড়ী শেষ যাই, সেদিনই টের পেয়েছিলাম। আমি জ্যোতিষী বা গণকঠাকুর নই, ভবিষ্যৎ যে দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময়, পাঁচজনের মতো এটাও আমি জানি। কিন্তু সুমন্তর ব্যাপারটা একেবারে আলাদা, সে আমার এতো পুরানো বন্ধু, আড়িভাবের আঁকাবাঁকা পথে এতোকাল আমরা পাশাপাশি হেঁটেছি যে, তার মুখ, চোখ, তাকানো, কথা, হাঁটাচলা দেখেই তার মনের নির্ভুল হদিশ আমি পেয়ে যাই। সেদিন সুমন্তদের বাড়ী থেকে বেরোবার সময়েই বুঝেছিলাম, এই শেষ, সুমন্তর সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

রাত ন'টা নাগাদ, বাড়ীর সদর দরজা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিয়ে সুমন্ত বলেছিল, আবার দেখা হবে। সুমন্তর কথা শুনে ছ্যাঁত করে উঠেছিল, আমার বুক, মাথার মধ্যে ঝড়তুফান, চোখ তুলে দেখলাম, আমার দিকে তাকিয়ে আছে সুমন্ত, তার দু'চোখে কৌতুক, চিকচিক হাসি। তার মৃত্যু যে অমোঘ, আসন্ন, আমি যে সেটা টের পেয়েছি, দু'জনের মধ্যে যে এখন অবোধ সরলতার এক লুকোচুরি খেলা চলছে, এটা সুমন্তও বুঝেছিল। সুমন্ত অসম্ভব বুদ্ধিমান, সেও আমাকে অনেকদিন চেনে, সম্ভবতঃ আমি নিজেকে যতোটা চিনি, তার চেয়ে সুমন্তর চেনা অনেক বেশী নির্ভুল আর নিখুঁত।

রাস্তায় নেমে সেই রাতে পেছনে না তাকিয়ে আমি হনহন করে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। সুমন্তদের বাড়ী থেকে আমার বাড়ী অনেকটা পথ, বাড়ী পৌছতে বেশ দেরী হয়ে যাবে। ফিকে অন্ধকার রাস্তা, ঝিরঝির হাওয়া বইছিল, নিজের মধ্যেই আমি ডুকরে উঠলাম, এ তুই কী করতে চলেছিস? তুই এভাবে শেষ হয়ে যাবি, এটা আমি ভাবতে পারিনি।

তাছাড়া সুমন্তর মাথাতে যে আত্মহত্যার চিন্তা ঢুকতে পারে, এটাও আমার কাছে অবিশ্বাস্য। সুমন্ত যুক্তিবাদী, জেদী, পুরুষকার আর শক্ত কব্জিই তার সম্বল, আত্মহত্যা, তার মতে জঘন্য অপরাধ, কাপুরুষতা, এমন কথা তার

মুখেই বহুবার শুনেছি। সুমন্ত বলতো, এইসব ভীতু, আত্মবিশ্বাসহীন লোকদের আমি করুণা করি, অবজ্ঞা করি।

অন্ধকার ফাঁকা রাস্তা, আমার বুকে তোলপাড উদ্বেগ আর আশঙ্কা, কী করবো, সুমন্তর বাবা মাকে জানাবো, কিন্তু তারা কেউ কলকাতায় নেই, সুমন্তর দিদি মুনিয়া, সে বাড়িতে আছে, তাকে বলা যায়, মুনিয়াদি আগামী দিন সাতেক একটু নজরে রেখো সুমন্তকে।

তারপর? সুমন্তর ওপর নজরদারির কাজে কী মুনিয়া রাজী হবে? তাছাড়া মুনিয়া নিজেই এখন অসুস্থ, তারই পরিচর্যা দরকার। কী যে করবো, আমি ভাবতে পারছিলাম না। সুমন্তর বাবা কলকাতায় থাকলেও তিনি এতোবড় চাকরী করেন, যে তাঁর কাছে পৌছনোই মুস্কিল। সুমন্তর মাও তাই, চাকরী না করলেও তিনি ব্যস্ত সমাজসেবিকা, কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই লাগাতর উড়ে বেড়াচ্ছেন। মুনিয়া সুস্থ থাকলেই কী খুব একটা কাজ হতো? সুমন্তর মুখে শুনেছিলাম, বছর খানেক হলো, সন্ধ্যের পরেই মুনিয়া এলোমেলো, আলুথালু হয়ে যায়, ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ী ফিরে পারতপক্ষে বাবা মার কাছে যায় না, যাওয়ার দরকারও হয় না। সুমন্তর ওপর নজরদারির এই কঠিন কাজ কী মুনিয়া করতে পারতো? করতে রাজী হতো?

লাইটপোস্টের আলোর পিচের কালো রাস্তায় আমার ছায়া, পাশাপাশি হাঁটছে। আমি বুঝতে পারছিলাম, রাস্তায় লুটিয়ে থাকা ছায়ার চেয়ে আমার রক্ত মাংসের শরীর, মস্তিষ্ক, অনেক বেশী অসহায়, কিছু করার নেই, আমি বাঁচাতে পারবো না সুমন্তকে।

সুমন্তর ঘর, পড়ার টেবিল, টেবিলের ওপর পাতা চিড় খাওয়া চৌকো, বড়ো কাঁচ, আর কাঁচের তলায় সেই স্কেচ, সাদা কাগজের ওপর চাইনিজ ইঙ্কে আঁকা ছবিটার কথা মনে পড়তে আতঙ্কে শিউরে উঠলাম আমি। সবল তুলিতে আঁকা এক ভয়ঙ্কর ছবি, সুমন্তই এঁকেছে, ওর আঁকার হাত বেশ ভালো। ছবির বিষয়, একটা মফঃস্বল স্টেশন, পাশেই লেবেলক্রসিং, লাইনের ওপর একজন মানুষের দুটুকরো দেহ, দেখলেই বোঝা যায়, মিনিট কয়েক আগে একটা ট্রেন ঝড়ের গতিতে মানুষটার ওপর দিয়ে ছুটে গেছে। কালো কালিতে আঁকা হলেও মানুষটার দু'খণ্ড শরীরের চারপাশে ছড়ানো কালিমা রক্তের চেয়ে লাল। বুক থেকে মাথা পর্যন্ত শরীর আলাদা, মানুষটার মুখের ওপর চোখ পড়তেই আমি কেঁপে উঠলাম, মুখে সুমন্তর আদল।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে সুমন্ত মিটিমিটি হাসছিল, ঘরের বাতাসে গরম রক্তের গন্ধ, এক লহমায় সুমন্তর মতলব আমি টের পেয়েছিলাম।

অসুস্থ মুনিয়াকে পাশের ঘর থেকে ডেকে এনে দেখালে কাটা পড়া মানুষটার মুখ হয়তো সে চিনতে পারতো না, অথবা চিনেও অবলীলায় আমার

আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিত। সুমন্ত চিরকাল খেয়ালি, ছোটভাইয়ের এটাও এক নতুন খেয়াল, মুনিয়া ভাবতো। ভারী লজ্জায় পড়তাম আমি। কিন্তু আমি জানতাম, সুমন্তর আঁকা ওই স্কেচ কী আমোঘ, অনিবার্য। বড়ো, চৌকো কাঁচটার নিচে এর আগে দু'বার চাইনিজ ইঙ্কে লেখা দুটো বাণী আমি দেখছিলাম। প্রথমটা একটা সংস্কৃত শ্লোক, যেনাহং নামৃতস্যাং কিমহম্ তেন কুর্যাম, যাতে অমৃত নেই, তা দিয়ে আমার কী লাভ? এই শ্লোকটা যখন কাঁচের তলায়, সুমন্ত তখন ফিজিক্স্ অনার্স ছেড়ে ফিলসফি অনার্সে ভর্তি হয়েছে। বছরখানেক না যেতেই একদিন দেখলাম, শ্লোক উধাও, তার জায়গায় নতুন লেখা, বিশ্বসংসারের ব্যাখ্যার চেয়ে বিশ্বসংসারকে বদলানো অনেক বেশি জরুরী।

এই উদ্ধৃতিটা পড়ার হপ্তাখানেক পরে কলেজে গিয়ে শুনলাম, ফিলসফি ছেড়ে সুমন্ত অর্থনীতি অনার্স নিয়ে আবার ফাস্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। বছর শেষে আমি নিয়মিত ক্লাসে উঠে যাচ্ছিলাম, এবার আমার বি এস সি পরীক্ষা। সুমন্ত কিন্তু একই ক্লাসে তিনবছর, ক্লাসে ওঠার কোনও আগ্রহ যেন তার নেই, আমি প্রশ্ন করতে সুমন্ত বলেছিল, ক্লাসে উঠে কী লাভ? আসলকথা লেখাপড়া, সেটা আমি করছি।

আমি তর্ক করিনি। কেননা সুমন্তর কথাটা সত্যি। ও চিরকালই দারুণ মেধাবী আর পড়ুয়া, হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে ওর নাম ছিল। ব্যাস, ওই পর্যন্ত। তারপর গত তিন বছর একই ক্লাসে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসা, ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডাক্তারিতে ভর্তির পরীক্ষা, যাতে বসলে সুমন্ত সহজেই উতরে যেতো, বসার কথাও ছিল, কিন্তু পরীক্ষার দিনগুলোতে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে, সাংখ্যদর্শন পড়েছিল।

সুমন্ত বলতো, ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার হয়ে কী লাভ? আরও অনেক বড়ো কাজ আছে।

কী কাজ, আমি জানতে চেয়েছিলাম।

আত্মানং বিদ্ধি, নিজেকে জানতে হবে।

সুমন্তর কথাগুলো ভারী দুর্বোধ্য, ঘোলাটে লাগতো, সবটা আমি বুঝতে পারতাম না, শুধু আশঙ্কা আর উদ্বেগ, আমার বুকের মধ্যে ঘন হয়ে উঠতো। বেদ, উপনিষদ, গীতা, চার্বাক, বৌদ্ধ আর নাগার্জুন পড়া শেষ, সুমন্ত তখন মন দিয়ে ডেকার্টে, কাণ্ট আর হেগেল পড়ছে, একদিন বলল, সব ধাপ্পা।

তার মানে, আমি প্রশ্ন করলাম।

আত্মা বলে কিছু নেই।

তাতে তোর কী?

আমার প্রশ্ন সুমন্তর কানে ঢুকল না, সে বলল, জ্ঞান বলেও কিছু নেই, সব বিভ্রম, মায়া নয়।

তাতে তোর কী, আমি ফের প্রশ্ন করলাম।

অনেক কিছু, সুমন্ত বলল, তার মানে আমার ছোটকাকাও ভুল।

সুমন্তর দুচোখে ঝকঝকে দৃষ্টি, একটু অবাক হয়েই আমি তাকালাম তার দিকে। সুমন্তদের বাড়ীতে অনেকবার গেছি, তার যে একজন কাকা আছে, সেই প্রথম শুনলাম। সুমন্তর দৃষ্টি গভীর, আচ্ছন্ন, বিড়বিড় করে সে বলল, ঠিক পনেরো বছর আগে, আমার বয়স তখন চার বা পাঁচ, কাকা বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কাকার মুখটা আজও আবছা।

কোথায় গিয়েছিল তোর কাকা, প্রশ্ন করেছিলাম আমি।

মুক্তির খোঁজে।

সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল ?

ঠিক তার উল্টো, বিপ্লবী।

একদম ছেলেমানুষী, মন্তব্য করেছিলাম আমি।

আমার কথা শুনে সুমন্ত কিছুক্ষণ চুপচাপ বসেছিল, তারপর বলেছিল, হয়তো, ওদেরও একটা যুক্তি ছিল নিশ্চয়।

সেটা ভুল যুক্তি, আমি বলেছিলাম।

সুমন্ত আর কথা বাড়ায়নি। সেদিন শেষ বিকেলে আউটরাম ঘাটে আমরা দুজন পাশাপাশি ঘাসের ওপর বসেছিলাম। গঙ্গার ওপারে ডুবুডুবু সূর্য, লালচে ফিকে আলোয় ছলাৎছল ঢেউ, একটা পাল তোলা নৌকা অনেক দূরে, সে দিকে তাকিয়ে সুমন্ত প্রশ্ন করল, ফিজিক্স্ অনার্স নিয়ে এ বছর তুই বি এস্ সি পাশ করবি ?

সুমন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর প্রশ্নের প্যাঁচ এবং গতি বোঝার চেষ্টা করলাম।

পরীক্ষা দিবি তো, সুমন্ত প্রশ্ন করল।

কেন দেবো না, আমি বললাম।

তারপর ?

এম এস সি পড়বো।

তারপর ?

বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছে, গবেষণা।

তারপর ?

বুঝতে পারছিলাম, এক নাগাড়ে প্রশ্ন তুলে সুমন্ত কোনঠাসা করতে চাইছে আমাকে। বন্ধুদের ঘায়েল করার এটাই সুমন্তর কৌশল। নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত

যুক্তি এবং কার্যকারণের সুতোয় সুমন্ত সব কিছু বেঁধে ফেলতে পারে। সুমন্ত বলতো, সত্য, সিদ্ধি, সফলতা এবং যুক্তি অবিচ্ছেদ্য।

আমাকে চুপচাপ দেখে সুমন্ত ফের খোঁচালো, লেখাপড়া, বিলেত আমেরিকা, গবেষণার পর?

হালুয়া খাবো, আমি বললাম।

আমার কথা শুনে মুচকি হেসে সুমন্ত জিজ্ঞেস করল, নন্দিনীর কী খবর?

সুমন্তর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমি বলেছিলাম, আমাদের সকলের লেখাপড়া, গবেষণা, জ্ঞানচর্চার মধ্যে দিয়েই সভ্যতা এগিয়ে চলেছে।

ঘোড়ার ডিম, বিরক্ত হয়ে সুমন্ত বলল, কোথাও এগোচ্ছে না।

নিশ্চয়ই এগোচ্ছে, আমি বললাম।

এক পলক আমাকে নজর করে সুমন্ত বলল, হয়তো।

তারপর স্বগতোক্তি করল, এম এস সি, গবেষণা, আমেরিকা, নন্দিনী, ছেলেমেয়ে, সংসার, সভ্যতা, শতশত শূকরের চিৎকার সেখানে, শতশত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর। একটু বিরক্ত হয়ে সুমন্তকে বললাম, তুই যে তিন বছর ধরে একই ক্লাসে ফিজিক্স, ফিলসফি, ইকনমিক্স, শুধু সাবজেক্ট বদলে যাচ্ছিস, এর মানে কী?

ম্লান হেসে সুমন্ত বলেছিল, খুঁজছি।

কী খুঁজছিস?

মানুষের কী খোঁজা উচিত।

বাজে কথা।

হঠাৎ সুমন্ত বলল, প্রেমিকা খুঁজছি। একটা প্রেমিকা পেলেই লেখাপড়া, বিদেশযাত্রা, সংসার আর মানবসভ্যতাকে, বেশ চমৎকার একটা মালার মতো, আমি গেঁথে ফেলতে পারবো। আমাকে একটা প্রেমিকা দিবি?

আমি বেশ অবাক হয়েই সুমন্তর দিকে তাকালাম। আমাদের কো-এডুকেশন কলেজ, সহপাঠিনীদের অনেকেই সুমন্তর অনুরাগী, কিন্তু এইসব রাগঅনুরাগকে সুমন্ত পাত্তা দেয় না।

গঙ্গার জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে সুমন্ত বলেছিল, সনৎ মহারাজকে কিছুদিন আগে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। আমার চিঠিতে কয়েকটা প্রশ্ন ছিল। গতকাল মহারাজের জবাব পেয়েছি। চিঠির এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, আমাদের শিক্ষায়তনের কনককিরীটশোভিত, উজ্জ্বল ছাত্ররা কর্মক্ষেত্রে এমন সব দুর্নীতি আর নোংরামি করছে, যার কিছু কিছু খবর শুনে লজ্জায়, সংকোচে, মর্মদাহনে মাটিতে মিশে যাই। এখন আমার মনে হচ্ছে যে, লেখাপড়ায় অসাধারণত্বের চেয়ে সৎ, সামাজিক, হৃদয়বান ছাত্র গড়াই এ মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আমরা দুজনে যে মিশনারী স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম, সেখানকার হেডমাস্টার সনৎমহারাজের সঙ্গে সুমন্তর যে এখনো যোগাযোগ আছে, এটা আমার জানা ছিল না, একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলাম, হঠাৎ এই চিঠির কথা তুললি কেন?

এমনি, সুমন্ত জানাল।

বিষয়টা সুমন্ত এড়িয়ে যেতে চাইলেও আমি জানতাম, অকারণে সে কথাটা বলেনি, কোনও গভীর সংকেত দিতে চাইছিল।

আমাদের বিখ্যাত স্কুলের ঝাঁক ঝাঁক কৃতী ছাত্র, ফি বছর যারা পাশ করে বেরোচ্ছে, কর্মজীবনে তাদের বেশীরভাগই শিখরবাসী, কিন্তু তারা সকলে সৎ আদর্শবান, নীতিনিষ্ঠ নয়, বাজে, নোংরা লোকও আছে। মহারাজের চিঠি কী আভাস দিচ্ছে?

আমি বললাম, ব্যতিক্রম নিয়ম নয়।

কোনটা নিয়ম, আর ব্যতিক্রম কোনটা, আমি তার খোঁজ করছি, সুমন্ত বলল, মহারাজের চিঠি আমাকে বেশ সাহায্য করেছে।

এসব বছরখানেক আগের ঘটনা। এরপর সুমন্তর কলেজে আসা খুবই কমে গেল। ভয়ংকর এক নাকচের তত্ত্ব পেয়ে বসলো তাকে। সবকিছু খারাপ, জঘন্য, ষড়যন্ত্র, একটা দিনও আর স্থিতাবস্থাকে মেনে নেওয়া উচিত নয়, এইসব কথা সে বলতে শুরু করল।

এক দুপুরে কফি হাউসে, বন্ধুদের সামনে, অরিজিত তার মেসোমশাই-এর গল্প বলছিল। মেসো খুব কৃতী ছাত্র ছিলেন, এখন আই এ এস, রাজ্য সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের সচিব।

অরিজিতের গর্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে সুমন্ত প্রশ্ন করল, তোর মেসো কী খুব সফল?

নিশ্চয়ই, মুহূর্তের মধ্যে জবাব দিয়েছিল অরিজিত।

তার মানে, তোর মেসো খুব খারাপ লোক, অরিজিতের চোখে চোখ রেখে ঠাণ্ডা গলায় ধীরে ধীরে সুমন্ত কথাগুলো বলল।

সুমন্তর কথাটা যেন মৌচাকে ঢিল, একটু উল্টোরকম, টেবিলে গুঞ্জনের বদলে নিমেষে নৈঃশব্দ নামল, কেননা সকলের পরিবারেই দু'একজন সফল কৃতী লোক আছে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ, হঠাৎ সুমন্তর দিকে তাকিয়ে মীনাক্ষী বলল, তোমার বাবাও তো ব্যাঙ্কের বিরাট অফিসার, সফল, কৃতী মানুষ।

মুচকি হেসে সুমন্ত বলল, আমার বাবা সাধুপুরুষ নয়।

মীনাক্ষীর মুখ কালো, কী বলবে ভেবে পেল না। এক চুমুকে কাপের

কফি শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অরিজিৎ বলল, আমি চললাম, প্র্যাকটিকাল্ ক্লাস আছে।

অরিজিতের পর গেল মীনাক্ষী, তারপর আরও একজন, ধীরে ধীরে ফাঁকা টেবিলে আমি আর সুমন্ত মুখোমুখি. দেখলাম, সুমন্তর শক্ত, সরু চোয়াল তিরতির করে কাঁপছে, দুচোখে রাগ আর ঘৃণা। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, সুমন্ত আমাদেরও ঘেন্না করতে শুরু করেছে। এই ঘৃণা আর অপছন্দের কথা গোপন করা দূরে থাক, বুক ঠুকে সোচ্চারে বলে বেড়াচ্ছে। অরিজিতের সঙ্গে সুমন্তর এই গায়ে পড়া ঠোকাঠুকিতে আমি বিব্রত, বললাম, এটা করলি কেন?

কী করলুম, প্রশ্ন করল সুমন্ত।

সুমন্তর দুচোখে কৌতুক, শব্দহীন হাসি, আমি বললাম, তোর শত্রু বাড়ছে।

ভদ্রবেশী চাকরবাকরদের বন্ধুত্ব আমি চাই না, সুমন্ত বলল।

আরো যাচ্ছেতাই নানা কথা সুমন্ত বলবে, এটা বুঝে ওকে আর ঘাঁটালাম না। আমার কানে এসেছিল, রোজ নানা সুবাদে যাদের সঙ্গে সুমন্তর দেখা হয়, সহপাঠী, বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশী সকলকে সে অকথ্য অপমান করছে। কাউকে বলছে, হিজড়ে, ধান্দাবাজ, কাউকে প্রশ্ন করছে, আজকাল কতোদিন পরপর আপনি রক্ত বদলাচ্ছেন? শেষ কার রক্ত, সাপ না শকুনের, আপনি নিয়েছেন?

আমি না ঘাঁটালেও সুমন্ত কিন্তু থামল না, বলল, আমি একটা পরীক্ষা, একসপেরিমেণ্ট্ করছি, মানুষ যাচাই করার পরীক্ষা। বাইরে থেকে বেশীরভাগ লোককে যা মনে হয়, আসলে সে তার সিকিভাগও নয়, একদল চেনা মানুষেরও বারো আনা, হয়তো তারও বেশী, ডুবো পাহাড়ের মতো, চিরকাল চোখের আড়ালেই থেকে যায়। বাইরে থেকে যাকে সৎ, আদর্শবান, সাহসী তেজী মনে হয়, একটু খোঁচালেই ধরা পড়ে সে কী পলকা, ফাঁপা, ধড়িবাজ!

বেছে বেছে খ্যাতিমান, সফল, ত্রিশজন লোককে অপমান করে আমি দেখতে চেয়েছি, ক'জন রুখে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে সাতাশ জনের সঙ্গে আমার মোকাবিলা হয়েছে, একতরফা, আমি বলেছি, আপনি চাকর, মর্যাদা, বিবেক, মূল্যবোধ সব বেচে দিয়েছেন, যাকে বলেছি, সে, শুনেছে নিঃশব্দ, শুকনো মুখ, কথা হারিয়ে গেছে, সাতাশজনের মধ্যে মাত্র দু'জন আমার চোখে চোখ রেখে সরাসরি প্রতিবাদ করেছেন।

সুমন্তর সব কথা আমার কানে ঢুকছিল না, কিন্তু সুমন্ত যে এক বিপজ্জনক নেশায় বুঁদ, এটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। ইদানীং চায়ের দোকানে,

কলেজের মাঠে, কফি হাউসে, যেখানেই সুমন্ত বসতো, তার মুখে এই সব কথা, বন্ধুরা অনেকেই পালিয়ে যেতে চাইতো। সুমন্ত কিন্তু তাদের ছাড়তো না। বলতো, এসব কথাগুলো তোদের শোনা দরকার। জলসা, জনসভা, সংস্কৃতির আসর, গুণীজনসম্বর্ধনা, সর্বত্র এগুলো বলতে হবে। চালাক এবং বোকা, এই দু'ধরনের সুসজ্জিত চাকরবাকরদের তুলোধোনা করায় ভারী আনন্দ, শুরু করলে তোরাও বিস্তর মজা পাবি। মনে রাখিস ল্যাংটো লোককে ল্যাংটো বলা নৈতিক এবং সামাজিক দায়িত্ব, মহৎ কাজ।

কিন্তু এই মহৎ কাজে খুব বেশি বন্ধুর সাড়া সুমন্ত পেল না। আসলে সুমন্তর ক্রোধ, অভিমান যতোটা তপ্ত, বাস্তব, তার কাজকর্ম ঠিক ততো স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ছিল না। বন্ধুরা কেউ কেউ উদ্বেলিত, কিন্তু কী করবে ভেবে পেতো না। ফলে বন্ধুদের থেকে সুমন্ত ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল।

একদিন প্রাকআধুনিক ভারতীয় অর্থনীতির ক্লাসে অধ্যাপকের আলোচনার মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে সু·ন্ত বলল, উনিশ শতকের ভারতীয় ব্যবসায়ীরা শুধু নয়, তথাকথিত মণীষীরাও ছিল ইংরেজদের চাকরবাকর।

শিউরে উঠে অর্থনীতির অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন, কীরকম ?

রামমোহন ছিলেন বেন্টিংয়ের পিওন, বিদ্যাসাগর মশাই উচ্চাকাঙ্খী কেরাণী, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজদের ধামাধরা, এস এন ব্যানার্জীও তাই, পরে গান্ধী, নেহরু, যোশী, রনদিভে।

প্রায় ধমক দিয়ে সুমন্তকে থামিয়ে অধ্যাপক বলেছিলেন, তুমি নৈরাজ্যবাদী, দেশপ্রেম, দেশের প্রতি ভালোবাসা।

অধ্যাপকের কথার মাঝখানেই সুমন্ত বলেছিল, দেশ কী ? খবলে খাওয়া তিনকোনা পরোটার মতো একটা মানচিত্র ? আমার দে নেই স্যার, দেশপ্রেম নেই, বিপ্লব নেই, ধর্ম নেই।

কী আছে তোমার ?

স :), যুক্তি আর শূন্যতা।

নিজের বক্তব্য তুমি প্রমাণ করতে পারবে ?

অধ্যাপকের প্রশ্ন শুনে পকেট থেকে সুমন্ত একটা কাগজ বার করেছিল, কাগজে দশ-বারোটা বই এর নাম, বেশ কয়েকটা বিদেশী বই, গড়গড় করে বইএর ফর্দটা পড়ে, অধ্যাপককে সুমন্ত বলেছিল, এই বইগুলো ছাড়াও আরো কিছু বই এর নাম আপনি চাইলে দিতে পারি।

রাগের বদলে অধ্যাপকের মুখ তখন আতঙ্কে থমথম করছিল। ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা বাজতে তিনি যেন বাঁচলেন। ঘর থেকে যাওয়ার আগে সুমন্তকে বললেন, আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রো।

হপ্তাখানেক আগে, এক বিকেলে কলেজ ক্যান্টিনে বন্ধুদের সঙ্গে সুমন্ত

আড্ডায় বসেছিল। নানা কথার মধ্যে হঠাৎ সে গুম হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, বাইরে চুপচাপ হলেও তার ভেতরে কী এক ছটফটানি চলেছে। হয়তো এর নাম অন্তরটিপুনি, ভেতর ভেতর হয়, যখন হয় তখন মানুষ চুপ, কিন্তু স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। সুমন্তও পারছিল না। আড্ডা থেকে বেরিয়ে পড়ার জোরালো তাগিদে উসখুস করছিল। সামনের টেবিলে আধ-খাওয়া চায়ের কাপ, চায়ের তলানিতে কালচে সর, ঢকঢক করে এক চুমুকে তলানিটা খেয়ে সুমন্ত আমাকে বলল, আয় আমার সঙ্গে, কথা আছে।

কী যে কথা, বুঝতে পারলাম না, কিন্তু ধুকধুক করছিল বুক। একটা দোতলা বাসের ওপরতলায় উঠে একটা সিটে পাশাপাশি দুজনে বসলাম। সুমন্তর গোপন কথা শোনার জন্যে ভারী হয়ে আছে আমার মাথা। এই বাসটা সুমন্তদের বাড়ীর কাছ দিয়ে যায়। বুঝলাম, আমাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সুমন্ত তার গোপন কথা বলবে।

সুমন্ত হঠাৎ বলল, দিদির শরীরটা খুব খারাপ।

সুমন্তর দিদি মুনিয়া, সুমন্তর চেয়ে তিন চার বছরের বড়ো, এবছর এম এ পরীক্ষা দেবে, মুনিয়া আমারও খুব ঘনিষ্ঠ। মুনিয়া, সুমন্ত আর আমি কতোদিন ওদের বাড়ীতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিয়েছে, দাবা খেলেছি একসঙ্গে সিনেমাও দেখেছি কয়েকবার। মুনিয়া, স্বভাবে সুমন্তর একদম বিপরীত, আলাপে, হাসিতে, নাচে, গানে, সবসময়ে উচ্ছল খুব ভালো সেতার বাজায়। পৃথিবীতে যে পাপ, গ্লানি, অপরাধ আছে, মুনিয়া যেন সে খবর এখনো পায়নি। পেলেও গায়ে মাখে না। ছিপছিপে, তন্বী, ফর্সা রঙ, গোল মুখে ভাসাভাসা দুটো চোখ, মুনিয়া নিষ্পাপ সারল্যের প্রতীক।

মুনিয়াদির কী হয়েছে, আমি জানতে চাইলাম।

কিছুদিন ধরে দিদি খুব নেশা করছিল, সুমন্ত বলল, শুকনো নেশা, হাসিস, মারিজুয়ানা, ড্রাগস্, গাঁজা তো আছেই। আমাদের কলেজের মতো দিদিদের য়ুনিভার্সিটিতেও শুকনো নেশার একটা আড্ডা আছে। সে আড্ডায় ঢোকার পর থেকেই দিদির মাথাটা একটু বিগড়ে গেছে। ডাক্তার দেখছে।

বেকবাগান বাস স্টপে নেমে বাঁ দিকে একটু এগিয়ে উঁচু পাঁচিল ঘেরা একটা বড়ো দোতলা বাড়ী, বাড়ীটার সামনে পেছনে বাগান, বিরাট সব ঝাঁকড়া গাছের ছায়া বাড়ীর চারপাশে সারাদিন ছড়িয়ে থাকে। এই বাড়ীর দোতলায় সুমন্তর বাবার কোয়ার্টার, একতলায় ক্যাম্প অফিস। সুমন্তর বাবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বড়ো অফিসার, প্রায়ই খবরের কাগজে নাম ছাপা হয়। খুব তাড়াতাড়ি তিনি যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর হবেন, এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। স্তব্ধ, নির্জন বাগান পেরিয়ে দোতলার ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার সামনে

এসে আমরা দাঁড়ালাম। দরজায় ল্যাচ্ লাগানো, বাইরে থেকেও চাবি দিয়ে এই দরজা খোলা যায়। কলিংবেল না বাজিয়ে পকেট থেকে ল্যাচের চাবি বার করে সুমন্ত দরজা খুলল। অধুনিক ফ্ল্যাট, চমৎকার সাজানো। দরজার পরেই বিরাট লবি, বাঁ দিকে খাবার জায়গা, ডান দিকে বসার ঘর, মাঝখানে কাশ্মীরী কাজ করা কাঠের পার্টিশন্। বসার ঘর ছেড়ে সামান্য এগিয়ে পাশাপাশি দুটো ঘর, সুমন্ত আর মুনিয়ার। মুনিয়ার ঘরের ভেজানো দরজা একটু ফাঁক করে দেখে সুমন্ত বলল, দিদি ঘুমোচ্ছে, ওষুধের ঘুম।

নিজের ঘরে ঢুকে দক্ষিণের বন্ধ জানলাটা সুমন্ত খুলে দিতে নিমের ছায়া মাখা এক ঝলক আলো ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। জানলার ঠিক পাশেই একটা প্রাচীন নিমগাছ, ঘন, সবুজ পাতা, জানলার গা ছুঁয়ে আছে। সুমন্তর এই ঘরটা আমার খুব চেনা, অনেকবার এসেছি। এ ঘরের সব জিনিস, খাট, চেয়ার, টেবিল, জামাপ্যান্ট, বই খাতা, চিরকালই খুব পরিপাটি করে সাজানো, গোছানো, কিন্তু সেদিন ঘরটা একটু অন্যরকম, আলাদা লাগল। ঘরের মেঝেতে ধুলো, কুটকুটে কালো বিছানার চাদর, বই, কাগজ ছড়িয়ে আছে মেঝেতে, বিছানায়, চেয়ারে, টেবিলটা কিন্তু একদম ফাঁকা, একটা বইও নেই। টেবিলের ওপর সেই চৌকোনা বড়ো কাচ, কাচটার মাঝখান থেকে একটা লম্বা, গভীর, চিড, কাচটা যে কোন কারণে ফেটে গেছে। কাচের নিচে চাইনিজ্ ইঙ্কে আঁকা একটা স্কেচ, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। বিছানায় সুমন্তর পাশে বসে প্রশ্ন করলাম, তোর যেন কী কথা আছে?

একপলক আমার দিকে তাকিয়ে আবছা হেসে সুমন্ত বলল, নাহ্, কোনো কথা নেই।

তাহলে?

তোর সঙ্গে একা একটু বসতে চাইছিলুম।

আমাকে আর কোনো প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে সুমন্ত বলল, দাঁড়া, দু'কাপ চা তৈরি করে আনি।

সুমন্ত চা বানাতে গেলে মেঝেতে, বিছানায়, চেয়ারে ছড়িয়ে থাকা বইগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখতে শুরু করলাম। মরগ্যানের প্রিমিটিভ সোসাইটি বইটার প্রথম পাতা উল্টে মিরদালের এশিয়ান ড্রামা খুললাম। তারপর কোশাম্বির লেখা, ভগবান বুদ্ধ। প্রতিটা বই যে খুঁটিয়ে, গভীর মনোযোগ দিয়ে সুমন্ত পড়েছে, বইগুলোর পাতা ওল্টালেই সেটা ধরা যায়। রিডিং ইন্ কৌটিল্যজ অর্থশাস্ত্র বা স্টাডিজ ইন্ ইসলামিক মিস্টিসিজমের প্রায় সব পাতাতেই জরুরী লাইনগুলোর তলায়, সবুজ বা লাল পেন্সিলের দাগ, পাশে মন্তব্য, নোট।

দু'কাপ চা নিয়ে সুমন্ত ঘরে ঢুকল। একমাথা রুক্ষ চুল, কপালের ওপর

কিছুটা ছড়িয়ে আছে। কপালের নিচে দুটো উজ্জ্বল চোখ। হাল্কা হাওয়ায় নিমগাছের পাতা কাঁপছিল। সুমন্তকে প্রশ্ন করলাম, মাসীমা কোথায়?

কানপুর, সুমন্ত বলল, অনাথ শিশুদের নিয়ে সেমিনারে আছে।

মেসোমশাই?

বাবা জার্মানীতে, অফিসের কাজে।

হঠাৎ সুমন্তকে আমার খুব অসহায়, শিশু মনে হলো। ভাবলাম, ওকে একটু সমালোচনা, শাসন করা দরকার। বললাম, পরশুদিন তুই নাকি এক রাজনৈতিক নেতাকে অপমান করেছিস?

সুমন্তর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, বলল, ঠিকই শুনেছিস।

সামান্য থমকে গিয়ে আমি বললাম, কিন্তু কেন করছিস? তোর মতো শিশুকে, ভদ্র, বিনয়ী।

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সুমন্ত বলল, কাকে সম্মান করবো? চোখের সামনে একজন সম্মানীয়কেও দেখতে পাই না।

তোর দুর্ভাগ্য, আমি বললাম।

ভালো লোকেরা কোথায় থাকেন, সুমন্ত প্রশ্ন করল, তাদের কয়েকজনের নাম, ঠিকানা আমাকে দিবি?

আমি দেবো কেন? যে যেমন মানুষ, সে তেমন সঙ্গী পায়।

আমি কী খারাপ ছেলে, সুমন্ত প্রশ্ন করল?

আমি জবাব দিলাম না।

ভালোর মাপকাঠি কী, সুমন্ত প্রশ্ন করল।

মানুষের ওপর বিশ্বাস, আমি বললাম।

পুরোনো, ছেঁদো কথা।

সব পুরনো কথাই ছেঁদো কথা নয়, আমি মনে করি, যে মানুষের আত্ম-বিশ্বাস নেই, সেই অন্যকে অবিশ্বাস করে। অবিশ্বাস বড়ো খারাপ জিনিষ, এর শেষ নেই, সীমা নেই, অবিশ্বাসী নিজেকেও বিশ্বাস করে না, নাকচ করে। এর পরিণাম খুব খারাপ। অবিশ্বাসী মানুষকে আত্মহত্যা করতে হয়।

আমার কথা শুনে সুমন্ত যেন কেমন কুঁকড়ে গেল। ঠিক তখনই পাশের ঘরে ঝনঝন শব্দ আছাড় মেরে কেউ কিছু ভাঙল। ক্লান্ত গলায় সুমন্ত বলল, দিদি জেগেছে, ওষুধ খাইয়ে আসছি, তুই একটু বোস।

পাশের ঘরে স্টিরিওতে বিদেশী বাজনার জোরালো শব্দ, মুনিয়া রেকর্ড-প্লেয়ার চালিয়েছে। আবার আমি একা। টেবিলের পাশে পশ্চিমের জানলাটা খুলতেই ফাটা কাচের তলায় কালো কালির স্কেচটা দেখতে পেলাম, ফাটা পড়া মানুষটার মুখের ওপর জানলা থেকে আলো এসে পড়েছে, চেনা মুখ,

আলোর ফোকাসে আমার নজর স্থির, নিষ্কম্প, আমার স্নায়ুতে, শিরায় এক হিমেল স্রোত, সুমন্তর পরিণাম আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

হঠাৎ ঘাড়ের ওপর উষ্ণ হাওয়া, কে যেন শ্বাস ফেলছে। তাকিয়ে দেখলাম, পেছনে সুমন্ত, তার মুখে রহস্যময় মিটিমিটি হাসি।

আমাকে প্রশ্ন করল, কী দেখছিস?

সুমন্ত আত্মহত্যা করার তিনদিন পরে একটা চিঠি পেলাম, সুমন্তর চিঠি। সম্ভবত আত্মহত্যা করার সামান্য আগে ও চিঠিটা পোস্ট্ করেছিল। লম্বা, সাদা কাগজে তিন পৃষ্ঠার চিঠি। চিঠির এক জায়গায় সুমন্ত লিখেছে, দেশ, কাল, ইতিহাস এবং চালু যাবতীয় মূল্যবোধ আর ধারণাকে একটানা নাকচ করতে করতে আমি বুঝতে পারলুম যে, আমার আর দাঁড়াবার, নড়াচড়ার জায়গা নেই, সামনে পেছনে অতলস্পর্শী খাদ, আমি আশ্রয়অবলম্বনহীন। ভারী শূন্য, একা হয়ে গেলুম আমি। তখনই ধরতে পারলুম, আমি আকাট, নির্বোধ। শুধু নেতি নয়, গ্রহণযোগ্য ইতিবাচক কিছু জিনিসও আছে। তা না হলে তোর মতো বন্ধু পেলুম কী করে? দু'চার জন সৎ, তেজী মানুষেরও তো দেখা পেয়েছি। সবচেয়ে বড়ো গলদ, আমি আমার দেশ আর মাতৃভূমিকে ভুলে গিয়েছিলুম। হাজার হাজার বছরের শৌর্য, সংগ্রাম আর ঐতিহ্যে উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত আমার মাতৃভূমির মুখ আমি দেখতে পাইনি। বলায় ভুল হলো, আমি দেখতে চাইনি। হয়তো এটা আমার ব্যক্তিগত ত্রুটি নয়, আমাদের জাতীয় চরিত্র ও মনস্তত্ত্বের দুর্বলতা, পরমুখাপেক্ষিতার গ্লানি। আমার নিরুদ্দিষ্ট ছোট কাকা নিশ্চয়ই দেখেছিল। দেখেছিল কী? সে কী বুঝেছিল, যে এদেশে জন্মানো কতো বড়ো গৌরব আর অহংকারের বস্তু? আমার বিশ্বাস, ছোট কাকা বুঝেছিল। নথিবদ্ধ, সাজানো ইতিহাসের আড়ালে এ দেশের আর এক গোপন, অলিখিত ইতিহাস আছে, সে ইতিহাস ত্যাগে, শপথে, ঘৃণায়, প্রেমে নবজন্মের প্রতীক্ষা করছে। এ উপলব্ধি ছোটকাকার নিশ্চয়ই হয়েছিল। এই উপলব্ধিই একজন মানুষের গৌরব, অহংকার, তার বাঁচা আর ঘর ছাড়ার প্রেরণা। কিন্তু ছোটকাকা গেল কোথায়? অনেক বছর আগে যে দৌড় প্রতিযোগিতায় ছোটকাকা নাম দিয়েছিল, সেই দৌড়ের বহু প্রতিযোগীর বসে যাওয়া, সরে পড়ার পরেও আজ পর্যন্ত কী সে মানুষটা দৌড়োচ্ছে? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, শুধু আমার ছোটকাকা নয়, আরো কিছু দৌড়বীর আজো ছুটছে, থামে নি, কিন্তু আমি পারি না, দেশ, পৃথিবী, সময়, উত্তরকালকে মেলাবার কাজে আমি অচল, অক্ষম, তাই আমার বাঁচার অধিকার নেই, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। তুই যে আমাকে কাপুরুষ বা ভীতু ভাববি না, এই বিশ্বাসটুকু বুকে আঁকড়ে নিয়ে মরার আগে আমি গভীর আরাম আর শান্তি পাচ্ছি॥

লাস জেগে ওঠে

মেদিনীপুর পুলিসকোর্টের ছোট ঘরটায় গাদাগাদি ভিড। কোর্টঘর উপচে দর্শকদের ভিড় বাইরের দালানে এসে পড়েছে। উর্দিপরা পুলিস লাঠি নিয়ে হট্‌হট্‌ করে ভিড় সরাতে চাইলেও কৌতূহলী মানুষের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। ম্যাজিস্ট্রেট্‌ এজলাসে এসে বসতে আদালতের কাজ শুরু হ'ল। ম্যাজিস্ট্রেটের মঞ্চের সামনে কালো সামলা পরা উকিল, আইনজীবীও বিস্তর জুটেছে। কোর্টঘরে রুদ্ধশ্বাস আগ্রহ, উত্তেজনা, প্রতীক্ষা। কালু মালোর বিচারের আজ রায় বেরোবে। বৌ, গোমতী মালোকে খুন করার অভিযোগে পুলিস গ্রেপ্তার করেছিল কালুকে। গোমতীর গলায় ফাঁস লাগিয়ে নৃশংসভাবে তাকে খুন করে সুবর্ণরেখার নির্জন চড়ায় কালু পুঁতে রেখেছিল। পাঁচ, সাত-দিন পরে মৃত গোমতীর লাশ সুবর্ণরেখার জলস্রোতের ঠেলা খেয়ে তীরের বালিমাটি ফুঁড়ে জেগে ওঠে। পচে গলে লাশটা এমন কদাকার হয়ে গিয়েছিল যে, সেটা গোমতীর মা ছাড়া আর কেউ চিনতে পারেনি। মালোপাড়ার দু'চারজন মেয়েমানুষও অবশ্য পরে পঞ্চায়েতের চৌকিদারের সঙ্গে থানায় গিয়ে গোমতীর মৃতদেহটা সনাক্ত করেছিল। লাশ দেখে গাঁয়ের মেয়েরা বলেছিল, হ্যাগো, ইত্তো আমাদের গুমতী, সেরম সটান শরীর, লম্বা লম্বা হাত পা।

জ্বরে শয্যাশায়ী, হাড় বার করা, শুকনো, রোগা শরীর কালু মালোকে সেদিন দুপুরেই তার বাড়ি থেকে পুলিস এ্যারেস্ট্‌ করে নিয়ে গিয়েছিল। অভাবে, ব্যাধিতে কাহিল শরীর, কালু তখন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে ধুঁকছিল। পালাবার শক্তি তার ছিল না, সে চেষ্টাও সে করেনি। কোনো গোঁয়ার্তুমি না করে, চুপচাপ, বাড়ি থেকে প্রায় চার মাইল পথ পায়ে হেঁটে, জ্বরের তাড়সে কাঁপতে কাঁপতে পুলিসপার্টির সঙ্গে কালু থানায় এসেছিল।

পুলিসের খাতায় কালু দাগী ক্রিমিনাল, অপরাধী। চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গার অভিযোগে ধরা পড়ে আগেও সে কয়েকবার জেল খেটেছে। বৌ খুন করা কালুর পক্ষে কিছু অসম্ভব কাজ নয়। এখানকার গরিব মানুষদের মধ্যে খুন, জখম, চুরি রাহাজানি রোজকার ঘটনা, লেগেই আছে। পাশেই লোধাগুলি। ঘেঁসাঘেঁসি কয়েকটা লোধাদের গ্রামে প্রায় পাঁচ, ছ'শো লোধার বাস। ভূমিহীন এই মানুষগুলোর চুরিচামারি মূল জীবিকা।

প্রতিবেশী গ্রামগুলোর গরিব জনগোষ্ঠীর ওপর লোধাদের বেআইনি জীবন ও জীবিকার প্রভাব পড়েছে। সুযোগ পেলেই তারাও চুরি, ডাকাতি করে। চুরি আর বেআইনি কাজে এ অঞ্চলে লোধাদের পরেই আছে মালোরা। এলাকার কোথাও চুরি, ডাকাতি, খুন জখম হলেই পুলিস প্রথমে লোধাদের গ্রামে, পরে মালোপাড়ায় হানা দেয়। পুলিসের হাতে বারবার হেনস্তা হয়ে এই দুই জনসম্প্রদায়ের মানুষেরা বেশ সেয়ানা হয়ে গেছে। ধরা পড়ার পর তারা থানায়, এজলাসে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা কথাও বলে না। তারা বুঝে গেছে, কথা বলা মানেই বিপদ. সত্যি, মিথ্যে যাই বলুক, সবটা তাদের বিরুদ্ধে যাবে। পুলিসহাজতে কোর্টকাছারিতে তাই তারা বোবা মেরে যায়, বোবার শত্রু নেই।

এ্যারেস্ট করে কালুকে থানায় আনার পর, পুলিসের ধারণা হয়েছিল খুনের অপরাধ কবুল করতে লোকটা বেগ দেবে। কিন্তু সেরকম কিছু হ'ল না। স্রেফ টো দু'চার ডাণ্ড, চড়-চাপড় খেয়ে কালু গড়গড় করে স্বীকারোক্তি দিয়ে দিল। সন্ধেবেলায় বৌয়ের সঙ্গে তুমুল কাজিয়া হওয়ায় কালু রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। মাঝরাতে বিপুল হাঁড়িয়া টেনে যখন সে ঘরে ফিরল, তখন তার মাথা খুনের নেশায় রিরি করছে। ঘুমন্ত বৌয়ের গলায় ছাগল বাঁধার দড়ির ফাঁস লাগিয়ে তাকে দমবন্ধ করে মেরে, রাত শেষ হওয়ার আগেই সুবর্ণরেখার চড়ায় লাশটা কালু পুঁতে দিয়েছে।

জবানবন্দী লেখা ডাইরির পাতায় কালু খুব সহজভাবে বুড়ো আঙুলের টিপছাপ এঁকে দিয়েছিল। কালুকে অনেক খুঁচিয়েও গোমতীকে খুন করার কারণটা থানার সেকেণ্ড অফিসার জানতে পারেনি। কারণ হিসেবে কালু যা বলেছিল, তা হ'ল সংসারে খিধে, অভাব থাকলে এরকম ঝগড়া, দুএকটা খুন হতেই পারে। কলহ, খুনের আর কোনো কারণ কালুর জানা ছিল না। কালু যাই বলুক, অফিসার বুঝেছিল, শুধু খিধে বা অভাব নয়, এ খুনের সঙ্গে যৌনতা, বিকারও জড়িয়ে আছে। বারমুখো, বাঁজা, স্বাস্থ্যবতী গোমতীর চালচলনে ক্ষেপে গিয়েই তাকে কালু খুন করেছে।

কারণ যাই হোক, সে নিয়ে অফিসারের মাথা ঘামাবার সময় বা প্রয়োজন ছিল না। স্বীকারোক্তির বঁড়শিতে খুনীকে গেঁথে ফেলার পর খুনের কারণ সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ শোনার তাগিদ আদালতের থাকে না। সাক্ষ্য, প্রমাণের ভিত্তিতে খুনের মামলা সাজানোর অনেক ফ্যাকড়া আর ঝামেলা থাকে। এখানে সে সব নেই, গোমতী খুনের মামলা অতি সরল, খুনী নিজের মুখে দোষ স্বীকার করেছে, ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাবাস, তার অবধারিত।

কালু ধরা পড়ার পর তাকে নিয়ে তার গাঁয়ে বেশ কয়েকদিন তুমুল

আলোচনা, তর্কবিতর্ক হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে খুনের অভিযোগ নিজের মুখে কালু মেনে নেওয়ায় কোর্টের উকিলবাবুরাও কম অবাক হয়নি। আসামীকে যে বাঁচানো যাবে না, এটা জেনেও কালুর মামলার দিনে আইনজীবীরা আদালতে ভিড় জমাতো। শিক্ষানবীশ, বোকা খুনীদের বাঁচানোর কোন আইনী ফিকির খুঁজে বার করা যায় কিনা, এ নিয়ে উকিলবাবুরা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করতো। বহু বছর ধরে বিস্তর খুনের মামলা ঘেঁটে এই সব ঝানু আইনব্যবসায়ীদের ধারণা হয়েছে যে, যে যত পেশাদার, পাকা খুনি, তাকে বাঁচানো তত সহজ। তবে আইনজ্ঞরা একটা বিষয়ে একমত হয়েছিল যে, পাকা বা কাঁচা, কোন খুনী নিজের মুখে স্বেচ্ছায় অপরাধ কবুল করে না। কালুর সত্যবাদিতায় আইনজীবীরা তাই খুব তাজ্জব বনে গেল।

কেউ বলল, বৌকে খুন করে কালু মালোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কেউ বলল, এটা নিছক ভড়ং, আসামী বেজায় ধুরন্ধর, পাগলের সাত খুন মাপ, এটা জেনে লোকটা পাগলের অভিনয় করছে।

কালুর পক্ষে যে সরকারী উকিল দাঁড়িয়েছিল, সে চটলো সবচেয়ে বেশী। অনেক শিখিয়ে পড়িয়েও, আমি খুন করিনি, এই কথাটা কালুর মুখ দিয়ে সরকারী উকিল বলাতে পারল না। কালুকে খেলিয়ে রাজকোষ থেকে কয়েক বছর ধরে পারিশ্রমিক দোহন করার এমন একটা মোক্ষম সুযোগ ফসকে যাওয়ায় কালুর মামলা নিয়ে সরকারি উকিলের সব আগ্রহ, উদ্যোগ নিভে গেল।

খুনের স্বীকারোক্তির ফলাফল কি হতে পারে জেনেও কালু কিন্তু একদম মুষড়ে বা ভেঙে পড়ল না। বরং জেলখানায় গল্প, আড্ডা, হাসি তামাশায়, দু'বেলা প্রচুর ভাত এবং দিস্তে দিস্তে রুটি খেয়ে বহাল মেজাজে সে ফুলে উঠতে থাকল। কালুর দিন যে ফুরিয়ে এসেছে, এটা জেনে জেলের কয়েদীরা খানিকটা কৃপা আর করুণায় কালুকে বাড়তি সুযোগ সুবিধে দিতে আপত্তি করল না। জেলের ভেতরে বুক চিতিয়ে কালু এমনভাবে হেঁটেচলে, গল্প করে বেড়াতো যে, তাকে দেখে মনে হ'ত, সে যেন কোন শৈলশহরে হাওয়া খেতে এসেছে। শরীরের রোগভোগ সেরে গিয়ে কালু সুস্থ হয়ে উঠল, তার ওজনও হুহু করে বেড়ে গেল। রুগ্ন, ভাঙাচোরা শরীর, কালুকে দেখে এতদিন আধবুড়ো বলে মনে হ'ত, এখন বোঝা গেল যে, সে চুয়াল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ বছরের তাজা তাগড়া, ফুর্তিবাজ জোয়ান। সহবন্দীদের কালু মাঝে মাঝে তার জীবন কাহিনী শোনাতো। এক দুপুরে হাতিবাড়ির শালবনের গভীরে তার জন্ম হয়েছিল। কালুর জন্মের কিছুদিন আগে, তার মা ফুল্লরা তখন ভরা পোয়াতি, এক রাত্তে পুলিস, কালুর বাবা দুখিরামকে চুরির মিথ্যে অভিযোগে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে

যায়। সংসারে ছুখিরাম ছাড়া আর কোনো পুরুষ না থাকায় ফুল্লরা খুব আতান্তরে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফুল্লরাও ছিল জাঁদরেল, গতরে খাটা মেয়েমানুষ। লাগাতার আট ঘণ্টা মাটি কাটতে পারতো। এক কলসী হাড়িয়া এক চুমুকে ঢকঢক করে খেয়ে নিয়েও একটু বেতাল হ'ত না। ঠিকাদারের মাটি কাটা, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনা থেকে শুরু করে সংসারের বারো আনা কাজ ফুল্লরা একাই করতো। কিন্তু পেটে বাচ্চা, মরদ জেলে, ভাই একটু দমে গেলেও ফুল্লরা কিন্তু ভয় পেল না। এক সকালে কাঠ কাটতে সে জঙ্গলে গেল। গাঁ থেকে অনেকদূরে, জঙ্গলের গভীরে, যেখানে ঠিকেদার বা বনরক্ষীদের পা পড়ে না, এরকম এক নির্জন জায়গায় সারা সকাল কাঠ কেটে ছুপুরের আগে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে ফুল্লরা গাঁয়ের দিকে রওনা হ'ল। সূর্য তখন মাঝ আকাশে, তবু ঘন জঙ্গলেও পথ ছায়াছায়া, অন্ধকার। বাড়ি পৌছতে একক্রোশ পথ বাকি থাকতেই ফুল্লরার প্রসববেদনা চাগিয়ে উঠল। তেষ্টায় গলা কাঠ, মাথা ঝিমঝিম, চোখের সামনে পৃথিবী ছুলছে, কষ্টে ছুমড়ে, বেঁকে যাচ্ছে শরীর, মাথায় বোঝা নিয়ে ফুল্লরা তবু কোনমতে নিজের ভিটেতে পেঁছিতে চাইছিল। কিন্তু সারা শরীরে দরদর ঘাম, পা ছুটো জড়িয়ে যাচ্ছিল, পেটের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল এক দামাল শিশু। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ফুল্লরা আর হাঁটতে পারল না। মাথার বোঝা মাটিতে রেখে একটা বড় শালগাছের তলায় শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকল। আধ ঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে সেই শাল-গাছের তলাতেই তার প্রসব হ'ল। প্রায় বেহুঁশ ক্লান্ত শরীর, মাথা, তবু ফুল্লরার জ্ঞান ছিল টনটনে। কাঠ কাটার ধারাল হেঁসো দিয়ে বাচ্চার নাড়ী কেটে, নিজের মাথার ছু'গাছা লম্বা চুল ছিঁড়ে শিশুর নাড়ী বেঁধে দিয়েছিল ফুল্লরা। গাছতলায় বাচ্চাটাকে রেখে, কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে আরও আধ-ঘণ্টা পরে ফুল্লরা বাড়ি ফিরেছিল। তখনও ছুপুর, পাড়া নিঝুম। চেনা কারো সঙ্গে রাস্তায় ফুল্লরার দেখা হ'ল না। শরীরের রস, কস, শক্তি ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেলেও দাওয়ার ওপর কাঠের বোঝা নামিয়ে রেখে ফুল্লরা আবার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছিল। ছেলেটাকে তো আনতে হবে! সেই শালগাছের কাছা-কাছি ফুল্লরা এসে দাঁড়াতেই তার পায়ের শব্দ শুনে পাশের ঝোপ থেকে একটা শিয়াল দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ধক করে উঠেছিল ফুল্লরার বুক! আর কয়েক সেকেণ্ড দেরি হলে বাচ্চাটা শিয়ালের পেটে যেত! কথাটা মনে হতে নিজের বোকামিতে ফুল্লরার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল। ফুল্লরা ভেবেছিল, গাছতলায় ছেলেটাকে রেখে গেলে কেউ ছোঁবে না, কিন্তু এত বড় একটা কাঠের বোঝা বেওয়ারিশ পড়ে থাকলে নিশ্চয় লোপাট হয়ে যাবে। পেটের বাচ্চার চেয়ে মেহনতের কাঠ অনেক বেশি দামী। তাই পেটের বাচ্চার বদলে কাঠের বোঝাটা ফুল্লরা আগে ঘরে রাখতে গিয়েছিল। ছু'হাতে বাচ্চাটাকে

বুকে জড়িয়ে, শেষদুপুরে ঘরে ফিরে ফুল্লরা বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। প্রতিবেশী মেয়েরা এসে মুখে মাথায় জল দিয়ে ফুল্লরার সেবা করেছিল। ছ'মাস বাদে জেল থেকে ফিরে ছেলে দেখে দখিরাম খুব খুশী। সেই ছেলেই কালু, শিয়ালের মুখ থেকে বেঁচে এখন সে খুনের আসামী।

কোর্ট ইন্‌সপেক্টর ম্যাজিস্ট্রেটের ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় কিছু বলছে। চেয়ারের বাঁদিকে ম্যাজিস্ট্রেট সামান্য কাত হয়ে পড়েছে। কোর্ট ইন্‌সপেক্টর কথা শেষ করতে ম্যাজিস্ট্রেট সোজা হয়ে বসল। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে টেবিলের ওপর পেস্‌কার মামলার কাগজপত্র রাখতে ঘরের ভেতরে গুঞ্জন কমে গেল। কালুর গাঁয়েরও কিছু লোক আজ কোর্টে এসেছে। কোর্টঘরের মেঝেতে তারা চাক বেঁধে বসে আছে। কালু যে বৌকে খুন করতে পারে, একথা তারা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। কালুর বৌ প্রায় এক বছর ভিটে ছাড়া, অনেক দূরে আসানসোল শহর ছাড়িয়ে সেই কার্মাটারের রেল কারখানায় ঠিকেদারের কুলিবাহিনীর সঙ্গে লোহা তোলার মজুর খাটতে গেছে। গোমতীর সঙ্গে গেছে তার এক বোন আর ভগ্নীপোত। খুনের ঘটনার দু'তিন মাস আগে গোমতী একবার গাঁয়ে ফিরেছিল, তারপর তাকে আর গাঁয়ে কেউ দেখেনি। কিন্তু সুবর্ণরেখার চড়া থেকে লাশ উদ্ধারের পর গোমতীর মা আর গাঁয়ের দু'তিনজন বুড়ি থানায় এজাহার দেওয়ার সময় বলেছে, খুন হওয়ার আটচল্লিশ ঘন্টা আগে গোমতী বাড়ি ফিরেছিল। নিজের চোখে গোমতীকে তারা ফিরতে দেখেছে। তাছাড়া কালু নিজে অপরাধ কবুল করেছে, এরপর আর কিছু বলার নেই। তবু গাঁয়ের লোকেদের, বিশেষ করে কালুর যারা সমবয়সী, ইয়ার, বন্ধু তাদের মনে একটা খিঁচ থেকে গেছে। কালুকে খুনী হিসেবে তারা ভাবতে পারছে না।

আসামীর খাঁচার মধ্যে কালু বীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ছিটেফোঁটা ভয় নেই তার চোখমুখে। ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল, মোক্তার, পেস্‌কার, পুলিস আর দর্শকদের রাজার মতো ঘুরে ঘুরে এমনভাবে দেখছে, যেন তার জন্যেই এত আয়োজন, অনুষ্ঠান, মানুষজনের সমাবেশ। অবাক, ভীত চোখে অনেকে তাকে দেখছে, এটা টের পেয়ে দেমাকে কালুর বুক ফুলে উঠল। গাঁয়ের লোকেদের দিকে তাকিয়ে কালু হাসল, হাত নাড়ল।

লিখিত সাতপাতার রায়ের ভূমিকায়, চালু আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দণ্ডবিধির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নিজের সারগর্ভ মতামত উল্লেখ করে কালু মালোর অপরাধের অংশটি ম্যাজিস্ট্রেট পড়া শুরু করতেই এজলাসের সামনে হৈচৈ বেঁধে গেল। বছর পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশের দজ্জাল চেহারার এক মেয়েমানুষ, মাথায় টানটান করে বাঁধা ভারী খোঁপা, রঙিন ডুরেশাড়ি, গাছকোমর করে

শরীরে জড়ানো, ডান হাতের চামড়ায় মস্ত উল্কি, ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, হুজুর আমার স্বামীকে খালাস দিন।

নিজের লেখা রায় পড়ায় ম্যাজিস্ট্রেট তখন এমন মোহিত, মুগ্ধ, যে স্ত্রীলোকটার কথা তার কানে গেল না। দজ্জাল মেয়েমানুষটা দ্বিতীয়বার, এবার আরও উঁচু গলায় একই কথা বলতে রায় পড়া বন্ধ রেখে বড় বড় চোখে তাকিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করল, এ মহিলা কে? এখানে হল্লা করছে কেন?

পেসকার কিছু বলার আগে স্ত্রীলোকটা বলল, হুজুর আমার নাম গুমতী মালো, আমি কালু মালোর ইস্ত্রী।

কোর্টঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়ল। নিমেষের নীরবতা, তারপর শুরু হ'ল তুমুল হট্টগোল। টেবিলের ওপর সজোরে দু-তিনটে ঘুঁসি কসিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বলল, অর্ডার, অর্ডার। কোর্টরুমে এসব কী হচ্ছে?

পেসকার, পুলিস আর উকিলবাবুদের চেষ্টায় গোলমাল একটু কমতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় গোমতীকে ম্যাজিস্ট্রেট ডেকে পাঠাল। গোমতীর সঙ্গে কাঠগড়ার পাশে এসে দাঁড়াল এক বুড়ি আর এক যুবতী। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিয়মমাফিক হলফ করে আত্মপরিচয় দিয়ে গোমতী যা বলল, তা হ'ল গত ছ'মাসেরও বেশি সে চিত্তরঞ্জন রেলইয়ার্ডে ঠিকে কামিনের কাজ করছে। ঘরে যে এতবড একটা বিপদ, সে খবর গতকাল ঝাড়গ্রামের এক মজুরের কাছে শুনে বোনকে নিয়ে লোধাগুলিতে ছুটে এসেছে। আজ সকালেই সে লোধাগুলি পৌঁছেছে। তারপর মা আর বোনকে নিয়ে লোধাগুলি থেকে মেদিনীপুরের আদালতে এসে হাজির হয়েছে।

কাঠগডার পাশে দাঁড়ানো দু'জন স্ত্রীলোকের দিকে আঙুল তুলে গোমতী বলল, ওই আমার মা আর বুন।

আদালত শব্দহীন। বডরকমের একটা ধাঁধায় পড়ে ম্যাজিস্ট্রেট ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। আসামীর খাঁচার মধ্যে কালু মালোকে হঠাৎ ভারী নিস্তেজ, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। একটু আগে তার চোখমুখে সে খুশীর দীপ্তি ঝিলমিল করছিল, এখন সেটা নেই। মাথা নিচু করে সে দাঁড়িয়ে আছে। গোমতীর পর তার মা সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে বলল, যে তার আগের সাক্ষ্য ঠিক নয়, লাশ চিনতে ভুল হয়েছিল। সামনে দাঁড়ানো মেয়ে আর খাঁচায় বন্দী জামাইকে গোমতীর মা নতুন করে সনাক্ত করল। তদন্তকারী পুলিস অফিসার আর সরকারি উকিল, যারা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মামলাটা পাকিয়ে তুলেছিল, আসামীকে ফাঁসিকাঠের অথবা যাবজ্জীবন হাজতবাসের চৌকাঠে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, ঘটনার হঠাৎ উল্টোগতিতে তারা থতমত খেয়ে গেল। আদালতের মধ্যে উত্তেজনা, ফিসফিস কথা, যারা

একটা কঠোর সাজার রায় শুনতে এসেছিল, তারা রীতিমতো হতাশ হ'ল। গোমতীর এই নাটকীয় আবির্ভা য় তারা খুশী নয়। এই স্ত্রীলোকটা আসল গোমতী কিনা, এ নিয়ে তারা সন্দেহ প্রকাশ করল। ম্যাজিস্ট্রেটেরও সন্দেহ ছিল। মামলার রায় পড়া বন্ধ রেখে কালুকে ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করল, উনি কী তোমার স্ত্রী?

কালু নীরব, নিশ্চুপ।

জবাব দাও, ম্যাজিস্ট্রেট ধমক দিল।

কালু তবু ঘাড় তুলল না, কথা বলল না।

দু-তিনজন উকিলবাবু কালুকে অনুরোধ করল, কন্‌টেম্‌পট অব কোর্ট, আদালত অবমাননার দরুণ যে নিদারুণ শাস্তি হতে পারে সে ভয় দেখাল, কিন্তু কালুর কোনো ভয়ডর নেই, সে একইরকম চুপচাপ, ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। সকলের সব চেষ্টা যখন প্রায় নিষ্ফল, তখন কালুর খাঁচার সামনে গোমতী গিয়ে দাঁড়াল। তারপর চড়া গলায় বলল, নিজের পরিবারকে চিনতে পারো না, কেমন ভাতার গা তুমি? এমন ভাতারের মুয়ে আগুন।

আরও কিছু কটু কথা গোমতী বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই খাঁচার মধ্যে খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো কালু গর্জে উঠল, তবে রে হারামজাদী, আজ তোর হাড়মাংস আলাদা করে ফেলবো।

গোমতীর চুলের মুঠি ধরার জন্তে গরাদের ফাঁক দিয়ে কালু হাত বার করতে গোমতী একটু সরে গেল। মুচকি হেসে বলল, আগে ঘরে ফেরো, তারপর।

চোখ পাকিয়ে কালু বলল, আমি ঘরে ফিরবো না। এখানে দু'বেলা পেট ভরে খাচ্ছি, ঘরে গেলেই তো উপোস। উপোসের কষ্ট থেকে বাঁচতে খুনের দায় মাথায় নিয়ে জেলে চলে এসেছি, সেটাও তোর সইছে না?

কালুকে আর কথা বলতে না দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সেদিনের মতো আদালত বন্ধের হুকুম দিল। অনেক শ্রম আর যত্নে লেখা একটা যুগান্তকারী রায় মাঠে মারা গেল। আবার নতুন করে রায় লিখতে হবে ভেবে ম্যাজিস্ট্রেটের চোখ-মুখে ক্ষোভ আর বিরক্তি ফুটে উঠল।

আরও কিছু তদন্ত ও খোঁজ খবরের পর ঠিক এক হপ্তা বাদে জেল থেকে খালাস পেয়ে কালু বাড়ি ফিরল। ঘরে এসে গোমতীর ওপর খুব খানিকটা তম্বি করলেও কালুর মনে হ'ল, তার সেই চণ্ডাল রাগটা যেন মাথার মধ্যে ঠিক জমাট বাঁধছে না। সবটাই যেন রাগের খেলা, ভাঁড়যাত্রা। কালু টের পেল গত ছ'মাস দু'বেলা পেট ভরে খেয়ে তার মেজাজ, মাথা ভারী নরম, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গোমতীকে পেটানো দূরের কথা, তার গায়ে এখন অনেকদিন কালু হাত তুলতে পারবে না।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর মাটির ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় প্লিচের মতো অন্ধকারে বৌকে নিয়ে কালু শুয়েছিল।

গোমতী চাপা গলায় ঠাট্টা করল, কী গো মারবেনি ?

গোমতীর তামাশায় কালুর সতেজ, পুষ্ট, সুস্থ শরীরে যৌবনের ঢল নামল, দু'হাতে বৌকে বুকের মধ্যে কালু আঁকড়ে ধরতে গোমতী আরামে ডুকরে উঠল, মাগো।

কালু জানে, এটা গোমতীর সুখের ফুৎকার। সুখের তাপেও মানুষ গোঙায়, জেগে ওঠে, বেঁচে ওঠে॥

চিতাভাসান

বিখ্যাত সমাজসেবী স্বর্গীয় অনিমেষ চন্দ্র ঘোষালের আত্মীয়, বন্ধু ও গুণমুগ্ধদের অভিযোগে, গত বিশে জুলাই, ক্যাওড়াতলা শ্মশান থেকে যে লোকটাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির অজামিনযোগ্য দুশো পঁচানব্বই-এর ক ধারা-বলে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল, অনেক চেষ্টাতেও তার আসল নাম, পিতৃ-পরিচয়, ঠিকানা, পুলিশ জানতে পারে নি। পুলিশের ডায়েরিতে বরাহনন্দন, নূরমহম্মদ, পাঁচু এবং ব্যাকা, এই চারটে নামই লেখা হয়েছিল।

অভিযোগে প্রকাশ, বিশাল শোকযাত্রা করে স্বর্গত অনিমেষচন্দ্রের মরদেহ শ্মশানে আনার সময়, মিছিলের কেউ এই লোকটাকে দেখেনি। শোকস্তব্ধ শ্মশানের ভাবগম্ভীর পরিবেশে, দাহ করার পর্ব চুকলে, অনিমেষচন্দ্রের ছেলেরা চিতায় জল দেওয়ার জন্যে কলসী হাতে যখন গঙ্গার ঘাটে নামছে, অভিযুক্ত লোকটা তখন অনিমেষের চিতার ওপর পেচ্ছাপ করতে শুরু করে। ঘটনাটা দেখে শোকাহত মানুষেরা কয়েক মুহূর্ত পাথর, নির্বাক, নিস্পন্দ, এমন যে হতে পারে, তারা কল্পনা করেনি। কিন্তু এই নিষ্ক্রিয় আড়ষ্টতা বেশীক্ষণ থাকল না। নিমেষের মধ্যে সেই বর্বর, অসভ্য লোকটার ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। শোকসন্তপ্ত মানুষের ক্ষোভ আর ক্রোধের শিকার হয় লোকটা। অল্পবিস্তর আহত সেই লোকটাকে পুলিশ তখনই গ্রেফতার করে। কে এই দুষ্কৃতকারী, তার পরিচয় জানার জন্যে তদন্ত চালিয়ে নির্ভুল কোনো তথ্য না পেলেও টুকরো টুকরো কিছু খবর পুলিশ জোগাড় করে। কয়েকজন ডোম, শ্মশানকর্মী জানায় যে, এই লোক আগেও এমন কাজ কয়েকবার করেছে। বিখ্যাত, নামী লোকেরা মারা গেলে কিভাবে যেন লোকটা খবর পায় এবং শ্মশানে এসে লুকিয়ে থাকে। তারপর দাহকর্ম শেষ হলে, চিতায় জল ঢেলে মৃতের আত্মীয়-স্বজন চলে গেলে, লোকটা এসে চিতার ওপর পেচ্ছাপ করে। সকলের চিতার ওপর নয়, খ্যাতিমান, শ্রদ্ধাভাজন, সর্বজনপরিচিত ব্যক্তিদের নিভে যাওয়া চিতার ওপর সে এই দুষ্কর্ম করে থাকে।

তদন্তে লোকটার আসল নাম, পরিচয় অজানা থাকলেও লুঠেরা, দাঙ্গাবাজ, মস্তান হিসেবে যে তার যথেষ্ট কুখ্যাতি, অনেকেই তার মুখ চেনে, ঘাঁটাতে সাহস করে না, এ খবর পুলিস জানতে পারল। শ্মশানের লোকজনও তাকে

চেনে এবং সমীহ করে। তা সত্ত্বেও কিছু একরোখা, সাহসী শ্মশানযাত্রীর সঙ্গে এই লোকটার আগেও বেশ কয়েকবার মারামারি আর সংঘর্ষ হয়েছে। দিন সাতেক হাজতে লোকটাকে কয়েদ রাখার পর পুলিশ আবিষ্কার করল, লোকটা ষোলআনা পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। তার কথা, চাউনি, আচরণের মধ্যে কোথাও কোনো সংগতি নেই। ফলে লোকটাকে থানা থেকে জেলখানায় পাগলা-ফাইলে পুলিস চালান করে দিল। সেখানকার এক তরুণ ডাক্তার, মানসিক রোগের চিকিৎসক, নানা কারণে লোকটার সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে খুব আন্তরিকভাবে তার চিকিৎসা শুরু করল। চিকিৎসার সঙ্গে লোকটার পরিচয় এবং ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও ডাক্তার খোঁজখবর সংগ্রহ করতে লাগল।

ডাক্তারের রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা গেল যে, এই উন্মাদ লোকটা সারা-দিনে, মাঝে মাঝে পাঁচ সাত মিনিটের জন্যে দু'তিনবার সহজ, স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তখন সে পুরোপুরি সুস্থ, তাকে দেখে ক্ষ্যাপা বা বিকারের রুগী বলে বোঝা যায় না। ডাক্তারের সমস্ত প্রশ্নের তখন সে সাধ্য মতো নির্ভুল, সত্য জবাব দেয়. কিন্তু তার এই মানসিক ভারসাম্য খুব অল্প সময় থাকে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার মাঝখানেই অনেক সময় বেতাল, অসুস্থ, অস্বাভাবিক মানসিকতা উত্তুঙ্গ ঢেউয়ের মতো লোকটার চেতনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন তার যুক্তি, চিন্তা, স্বাভাবিকতা দুকূল উপচে ভেসে যায়। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই তার পাগলামি এবং সুস্থতা। তীরের ওপর পর পর দুটো ঢেউ ভেঙে পড়ার মাঝখানে নির্জলা, স্থির যে বিরতিটুকু থাকে, ঢেউ নেই, নিরুপদ্রব, শান্ত, শিষ্ট তটভূমি, লোকটার মনের জগতেও সে রকম একটা ঘটনা, পাগলামির ঢেউ এবং স্বাভাবিকতার অবিরাম ওঠা পড়া চলছে। তবে সমুদ্রের সঙ্গে এই লোকটার কিছু তফাৎ আছে! সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এতো বেশী ভাঙচুর এবং এতো অল্প সময়ের বিরতির বদলে লোকটার মনের অস্বচ্ছতা এবং স্বাভাবিকতা, দুটো'ই একটু বেশী সময় থাকে। লোকটার মনের জটিল গতিপ্রকৃতি বুঝে নিয়ে রোজ যে সময়টা সে সুস্থ থাকে, দু'তিনবার, তখনই ডাক্তার আসা শুরু করল। কিছু লোকটার মুখে শুনে এবং শ্মশান ও সংলগ্ন এলাকা থেকে পাওয়া কিছু তথ্য জুড়ে তার একটা জীবনপঞ্জী, কিছুটা আনুমানিক, ডাক্তার তৈরী করল।

পাগলাফাইলে বন্দী লোকটার আসল নাম নন্দনন্দন বা নন্দু, বয়স ছাব্বিশ, সাতাশ, সোনামনি নামে কালিঘাটের এক পতিতা নন্দুর মা, নন্দুর পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত। ভদ্র পেশা বলতে যা বোঝায়, নন্দুর সেরকম কিছু ছিলনা। চুরি, জোচ্চুরি, ছিনতাই, এই ছিল তার জীবিকা। নন্দুর চেহারায় এমন একটা আলগা চটক আছে, যে ভালো জামা প্যাণ্ট পরলে তাকে সদ্বংশজাত বলে মনে

হয়। সুন্দরী মেয়েদের দেখা ছিল নন্দুর মূল অবসরবিনোদন। শুধু দেখা নয়, দু'একজনের সঙ্গসুখও সে ভোগ করেছিল এবং তার সঙ্গিনীদের মধ্যে অন্ততঃ দুজন, তারা বিবাহিতা, নন্দুর সংসর্গে গর্ভবতী হয়েছিল। তবে কালিঘাটের কাছাকাছি থেকেও সেখানকার পতিতাপল্লীর কোনো মেয়েকে নন্দু কখনো স্পর্শ করেনি। এ বিষয়ে নন্দুর মন্তব্য হ'লো, পকেটে টাকা থাকলে, মাঝে মাঝে বেশ মোটা টাকাই নন্দুর পকেটে থাকতো, ভদ্রঘরের মেয়েবৌদের যখন অবলীলায় পাওয়া যায়, এবং পয়সা খরচ করে তাদের বিছানাতেই তাদের ভোগ-দখল করা যায়, তখন শরীরবিক্রীর পেশায় যারা ব্যস্ত, তাদের ওপর চড়াও না হওয়াই ভালো। পকেট যখন খালি, পেটে দারুণ খিদে, শরীরে চিড়বিড় জ্বালা, নন্দু তখন বস্তির অন্ধকার ঘরে শুয়ে সম্ভোগের স্মৃতি বুকে নিয়ে ছটফট করতো। সুন্দরী, গৃহস্থ ঘরের মেয়েবৌদের নিয়ে সে নানা রোমাঞ্চকর স্বপ্ন দেখতো। নন্দু বলেছিল, বেশ্যাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখা যায় না।

নন্দুর স্বপ্নের ধরণটাও খুব আশ্চর্য। জেগে এবং ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখতো। তার চোখের সামনে ঘরের ফিকে অন্ধকার ধীরে ধীরে আলকাতরার মতো ঘন কালো হয়ে উঠলে, সেই নিশ্ছিদ্র, নিকষ অন্ধকারে ফুটে উঠতো ডজন ডজন কালো গোলাপ, নরম ভেলভেটের মতো পাপড়ি, ফুলগুলোর বুকের মধ্যে আফিমের দানা। আরামে, নেশায়, উপাস, অভাব ভুলে নন্দু ঘুমিয়ে পড়তো।

কোনো মেয়ের সঙ্গে নন্দুর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। প্রেম, ভালো-বাসার কথা শুনে ডাক্তারের সামনে মেঝের ওপর শব্দ করে এক খাবড়া থুথু ছিটিয়ে নন্দু একদিন তার ছেলেবেলার কাহিনী শুনিয়েছিল। অনেক পুরোনো স্মৃতিও মনে পড়েছিল নন্দুর। জ্ঞান হাওয়ার পর থেকেই নন্দু দেখেছে চারটে পায়ার নিচে ইট লাগিয়ে উঁচু করা একটা তক্তোপোষের তলায়, কুটকুটে ময়লা কাঁথার বিছানা। হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় যাতায়াত। তক্তাপোষের তলাতেই নন্দুর শিশুকাল আর ছেলেবেলা কেটেছিল। তক্তাপোষের ওপর ফি রাতেই একজন, দুজন, পুজো বা উৎসবের রাতে পরপর তিন, চারজন মক্কেল নিয়ে মা রাত কাটাতো। তক্তাপোষের ওপর কি যে হচ্ছে, অল্প-দিনেই নন্দু বুঝতে শিখল। বয়স যখন ছয় বা সাত, খুব জ্বর হয়েছিল একবার, রাস্তায় খেলতে না বেরিয়ে তক্তাপোষের তলায় নন্দু শুয়েছিল। তক্তাপোষের ওপর এক খদ্দের নিয়ে মা। খদ্দেরের সঙ্গে মায়ের ঠাট্টা, তামাশা আর কথা শুনে নন্দুও হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠতে তক্তাপোষের ওপর মায়ের মক্কেল আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছিল। তখন বর্ষাকাল, বাইরে অঝোরবৃষ্টি, সন্ত্রস্ত বাবুকে শান্ত করার জন্যে নন্দুকে মাদুর, কাঁথা সমেত ঘরের বাইরে রকের ওপর মা শুতে পাঠিয়েছিল। ওই বাবুটা ছিল খুব ধনী, মাকে অনেক টাকাকড়ি আর

উপহার দিত। এমন একজন শাঁসালো খদ্দেরের জেদকে সম্মান না জানিয়ে মায়ের উপায় ছিল না। এই বাবু দুপুর ছাড়া আসতো না। কিন্তু সেই ঘটনার পর, শীত বর্ষায় দুপুরেও এই বাবু এলে ঘরের বাইরে নন্দু বিছানা পাততো। সোনামনির অন্য খদ্দেররা জানতো না যে, তার একটা অল্পবয়সী ছেলে, তক্তাপোষের নিচে, অন্ধকারে শুয়ে আছে। আরো বছর দুই তিন পরে, নন্দুর বয়স কিছুটা বাড়লে, সোনামনি নিজেই নন্দুকে বাইরে পাঠিয়ে দিত।

মাঝে মাঝে, গভীর রাতে, পাশাপাশি কোনো ঘরে দাঙ্গা, মারামারি লেগে গেলে পুলিশ আসতো। একবার চুলের মুঠি ধরে সোনামনিকেও থানায় নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। সোনামনি, ওখানকার অন্য পাঁচটা মেয়ের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী, তার মেজাজও ঠাণ্ডা, কিন্তু পুলিশের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে সে রাত্রে অকথ্য গালাগাল করেছিল। অবাক চোখে মাকে দেখছিল নন্দু। পুলিশের বিরুদ্ধে রাগে, আক্রোশে ফেটে যাচ্ছিল তার বুক। পারুলমাসি আত্মহত্যা করার পরও পুলিশ এসেছিল। পারুলমাসির লাশ নিয়ে পুলিশ চলে যাওয়ার পর কানাঘুষো, গুজগুজ শুনে নন্দু জেনেছিল, পারুলমাসিকে খুন করে তার লাশটা গলায় দড়ি বেঁধে কড়িকাঠ থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল, চেতলার মস্তান কানাই বৈরাগী। সে এক দারুণ হৈহৈ কাণ্ড। তিন চার দিন সব কটা ঘর খালি, একটা খদ্দের এলো না।

একজন খদ্দের একবার খুন হওয়ার পরে কয়েকজন মেয়েকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। ছানুদা আর উড়িয়াখুড়ো, পতিতাপল্লীর দুই অভিবাবক, এই দুর্ঘটনার পর গা ঢাকা দিল। শীতের নিস্তব্ধ রাতে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে নন্দুর ভীষণ কান্না পেত, শরীরের কাঁপুনি থামতো না। যে কোনো দুর্ঘটনার পর দু'চার দিন পাড়ার ঘরগুলোয় খদ্দেরদের আসা যাওয়া বন্ধ হলে নন্দু বেশ খুশী হতো। ফাঁকা ঘরে তক্তাপোষে, মায়ের পাশে দারুণ আরামে ঘুমোতো সে। সেই সব রাতের সুখের স্মৃতি আজও নন্দুর মনে আছে। বছর বারো, তেরো বয়সের সময়, নন্দুর মনের মধ্যে বাবাকে দেখার এক তীব্র তাগিদ তৈরী হলো। বাবা কে, কোথায় থাকে সে মানুষটা, তাকে দেখা, খুঁজে বার করার জন্যে, নন্দু ছটফট করতে লাগল। সোনামনির কাছে একদিন বাবার নাম জানতে চাইলে, সোনামনির চোখজুটো ছলছল করে উঠেছিল। এক মুহূর্ত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সোনামনি বলেছিল, তোর বাবা যে সে লোক নয়, খুব মানী মানুষ।

ব্যস, ওই পর্যন্ত বলেই চুপ করে গিয়েছিল সোনামনি। মানুষটার নাম, পরিচয় বলা দূরের কথা, একটা শব্দ আর উচ্চারণ করেনি।

কিন্তু এক আঁবছা ধারণা, সন্দেহ, প্রশ্ন ঢুকে গেল নন্দুর মাথায়, মনে হলো, মা নাম না বললেও, মানুষটাকে সে চিনতে পেরেছে। গোলগাল, সুন্দর চেহারা, ধুতিপাঞ্জাবী পরা সেই বাবু, যে মাসে একবার বা দুবার, দুপুরে আসে, সন্ধ্যের আগে চলে যায়, তক্তাপোষের তলায় নন্দুর হাসি শুনে, অনেকদিন আগে. যে আঁতকে উঠেছিল, সেই লোকটাই যে তার বাবা, জনক, এ বিষয়ে নন্দু নিঃসন্দেহ হয়েছিল। সোনামনির মুখে নন্দু শুনেছিল, ওই সুন্দর চেহারার মানুষটাই নন্দুর নাম দিয়েছিল বরাহনন্দন। খুব অদ্ভুত নাম, তখন মনে হয়েছিল। কিন্তু এই নামটা বেশীদিন তাকে বয়ে বেড়াতে হয়নি। এক মুসলমান আতরওয়ালা, সোনামনির পাশের ঘরের পক্ষিমাসীর খদ্দের ছিল সে, সেই আতরওলা কেন যেন স্নেহ করতো নন্দুকে, তাকে পোষ্যপুত্র নেবে বলে নূরমহম্মদ নাম দিল, মসজিদে গিয়ে নন্দুর কলমা পড়ার দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল, তারপর পুরো ব্যাপারটা হঠাৎ ধামাচাপা পড়ে গেল। নূরমহম্মদ নামে নন্দুকে তখন অনেকে ডাকতে শুরু করেছিল

গোলগাল, সুন্দর চেহারা মানুষটা যে তার বাবা, এরকম এক বিশ্বাস মাথায় ঢুকতে নন্দুর বুকের মধ্যে কেমন এক ধুকপুকুনি শুরু হলো। মানুষটার সম্পর্কে কোন উৎসাহ নন্দুর এতোদিন ছিলনা, থাকার কথাও নয়। তাছাড়া রোজ দুপুরটা তার রাস্তাতেই কাটতো। তারই মতো বেজন্মা কয়েকটা ছেলের সঙ্গে খেলাধুলো, মারামারি, হৈচৈ, পাড়া বেড়ানো শেষ করে দুপুর কাটিয়ে সন্ধ্যের পর নন্দু যখন ঘরে ফিরতো, তখন ক্লান্তিতে, ঘুমে তার শরীর অবশ। সোনামনির খদ্দেরদের পরিচয় নেওয়ার সময় বা আগ্রহ নন্দুর আর থাকতো না। এ নিয়ে সে মাথাও ঘামায় নি কোনদিন। কিন্তু পিতৃপরিচয় জানার ভাবনাটা মাথায় ঢোকার পর থেকে দুপুরের খদ্দেরটির সম্পর্কে নন্দুর কৌতূহল ভীষণ বেড়ে গেল। একদিন শেষ বিকেলে, ধুতিপাঞ্জাবীপরা সেই গোলগাল, ফর্সাবাবুর সাদা এ্যাম্বাসাডার গাড়ীর পেছনে, বাম্পারে চেপে, তার বাড়ীটি নন্দু চিনে এসেছিল। কী বিরাট, সুন্দর বাড়ী, দেখেই তাক লেগে গিয়েছিল নন্দুর। গাড়ীর ভেতর থেকে নেমে বাবুটি গটগট করে বাড়ীতে ঢুকে গেল। গম্ভীর, অভিজাত চেহারা। রাস্তায় হতবাক নন্দু হাঁ করে দাঁড়িয়ে, হাঁটাচলার শক্তি নেই শরীরে, মিনিট দুই তিন দাঁড়িয়ে থেকে নন্দু পাড়ায় ফিরে এসেছিল।

এই সময়ে নন্দুর হঠাৎ লেখাপড়া শেখার ইচ্ছে হলো। পাড়ার এক সমাজসেবীর নাইটস্কুলে, নন্দু সামান্য লেখাপড়া, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা শেষ করল। নন্দুর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে ডাক্তার একদিন প্রশ্ন করেছিল, আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছেন ?

নন্দু জবাব দিয়েছিল, খুব শুনেছি. আপনারা যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেন, তার

আসল নাম খাটুয়া রবি, ঝাল্লার মাঠে, খাটুয়া রবি চোলাই বেচে, ওর রোজ আয়, পাঁচ সাতশো টাকা।

নন্দুর জবাব শুনে ডাক্তার হতবাক, আবার প্রশ্ন করেছিল, আপনি জ্যোতি বসুর নাম শুনেছেন?

একটু ভেবে নন্দু বলেছিল, নামটা খুব চেনা, জ্যোতি বসু হলো রাজীব গান্ধীর মামা. ইন্দিরা গান্ধীর চাচাতো ভাই।

নন্দু যে খানিকটা বেসামাল, তার সচেতনতা যে ক্রমশঃ ধূসর হয়ে মুছে যাচ্ছে, এটা আন্দাজ করে ডাক্তার শেষ প্রশ্ন করেছিল, ইন্দিরা গান্ধী কে?

তিনি ফুলনদেবীর মাসীমা, নন্দু নির্দ্বিধায় জবাব দিয়েছিল।

বিরক্ত, বিব্রত ডাক্তার বলেছিল, বাজে কথা ছাড়ুন। ইন্দিরা গান্ধী কারো মাসী নন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

তা হবে, চিন্তাক্লিষ্ট মুখে নন্দু বলেছিল, অনেকদিন আগে, তখন আমি স্কুলে পড়তুম, পড়বে যতো জানবে ততো, নামে আমার একটা বই ছিল, তাতে জ্যোতি বসু, ইন্দিরা গান্ধী, আরো অনেকের খবর ছিল। তখন সব পড়েছিলুম, এখন ভুলে গেছি। পড়বে যতো জানবে ততো, বইটা আজও হয়তো মায়ের তক্তাপোষের তলায়, আমার পুরোনো ভাঙা টিনের বাক্সে পড়ে আছে।

লুকিয়ে দেখা সেই বিশাল, ঝকঝকে বাড়ীটার ছবি কিন্তু নন্দুর মাথা থেকে মুছল না। সকাল, সন্ধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেই বাড়িটার দিকে নন্দু তাকিয়ে থাকতো। ফর্সা, গোলগাল, ধুতিপাঞ্জাবী পরা সেই ভদ্রলোক মাঝে মাঝে এলাহি বাজার করে কুলির মাথায় চাপিয়ে বাড়ী ফিরতো। সেই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা বারান্দায়, দালানে খেলা করতো। সকলেই ধীরে ধীরে চেনা হয়ে গেল নন্দুর। রোজ বিকেলে বারান্দায় উদাসীন, আনমনা ভঙ্গীতে দাঁড়ানো এক কিশোরীকে দেখে নন্দু ভাবতো, এই মেয়েটা কে! এর সঙ্গে কী সম্পর্ক আমার?

সেই কিশোরীর সঙ্গে একবার কথা বলার জন্যে উসখুস করতো নন্দু। কিন্তু ভয়ে, সংকোচে টু শব্দ করতে পারেনি। এক সকালে ধুতিপাঞ্জাবী পরা সেই ভদ্রলোককে বাড়ীর সামনে গেটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নন্দু হঠাৎ বাবা বলে ডেকে ফেলল। কী এক ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকা সেই ভদ্রলোক ডাকটা শুনে, আনমনা ভঙ্গীতে নন্দুকে একপলক দেখে চিনতে পারল না। নন্দু আবার ডাকল, বাবা!

একটু চমকে গিয়ে নন্দুকে দেখে ভদ্রলোক প্রশ্ন করল, কে তুই?

আমি সোনামনির ছেলে, নন্দু বলল।

সাপের পিঠে পা পড়লে মানুষ যেমন চমকে ওঠে, সেই মানুষটাও সেরকম কেঁপে গিয়ে প্রশ্ন করল, কে সোনামনি ?

কালিঘাটের সোনামনি, যার ঘরে মাঝে মাঝে দুপুরে আপনি যান, বিড়বিড় করল নন্দু।

গোলগাল উজ্জ্বল সেই মানুষটি কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, শুয়োরের বাচ্চা, আমাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে ? ভাগ, এখনি ভাগ এখান থেকে, তা না হলে পুলিশ ডাকবো'।

কোথা থেকে দু'চারজন লোক যেন সেখানে জুটে গেল। কেউ কেউ খেঁকিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল নন্দুর ওপর। অপমানে, ভয়ে প্রায় দৌড়ে নন্দু পালিয়ে এসেছিল সেখান থেকে। ঘরে ফিরে দেখল, এলো চুল, আলুথালু পোষাক, সারা মুখে রাত জাগার ক্লান্তি, তক্তাপোষেব ওপর হাত পা ছড়িয়ে সোনামনি ঘুমোচ্ছে। আক্রোশ, ঘৃণা, জ্বালায় চিড়বিড় করছিল নন্দুর মাথা। কিছু একটা ভাঙতে হবে, তছনছ, চৌপাট করতে হবে, এমন এক প্ররোচনা তার চেতনার মধ্যে নাচানাচি করছিল। তক্তাপোষের তলায়, অন্ধকারে, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা বুকে আঁকড়ে সারা দুপুর নন্দু চুপচাপ শুয়েছিল। নিঃশব্দ ঘর, গোটা পাড়া মৌন, নন্দুকে মাড়িয়ে দিয়ে একটা নেংটি ইঁদুর তাড়াতাড়ি ছুটে চলে গেল।

ঠিক তিনদিন পরে, এক দুপুরে নন্দু মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেল। তখন সারা দুপুর, পাড়ার এক সিনেমাহলের সামনে টিকিটের ব্ল্যাকার ছানুদার সাকরেদী করতো নন্দু। নানারঙের একবাণ্ডিল টিকিট দু'হাতে বুকে জড়িয়ে হলের অল্প দূরে নন্দু দাঁড়িয়ে থাকতো! শেষ বিকেলে ছানুদা দু চার আনা পয়সা নন্দুকে দিত। একবার কয়েকটা টিকিট হারিয়ে ফেলায় ছানুদার হাতে নন্দু এমন বেদম মার খেয়েছিল যে, দু'দিন বাড়ী থেকে বেরোতে পারেনি।

সেদিন দুপুরে সেই সাদা এ্যাম্বাসাডারের ভেতরে ধুতিপাঞ্জাবী পরা বাবুকে দেখেই নন্দুর মাথায় প্রতিহিংসা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। সিনেমাহল ছেড়ে গাড়ীটা বাঁদিকে ঘুরতেই নন্দু বুঝতে পারল যে, আজ সারাদুপুর এই লোকটা সোনামনির ঘরে থাকবে। ছানুদার হাতে টিকিটের গোছা জমা দিয়ে নন্দু ঘরের দিকে হাঁটা দিল। ঝাঁঝা, তপ্ত মাথা, নন্দু যা ভেবেছিল তাই, সোনামনির ঘরের দরজা বন্ধ। নন্দু জানে, এক দেড় ঘণ্টার আগে বন্ধ দরজা খুলবে না! দরজার ওপর চোখ রেখে একটু দূরে, নন্দু ওৎ পেতে অপেক্ষা করতে লাগল। সময় যেন কাটছিল না, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ল। রাস্তায় ছায়া নামছে। দু'ঘণ্টা পার হওয়ার পরেও কেন যেন সেদিন দরজা খুলছিল না। যতো দেরী হচ্ছিল, দাউদাউ অধৈর্যে পুড়ে যাচ্ছিল নন্দুর মাথা। বাঁ দিকে একটা রকের

ওপর মুরারিনাপিত তার কামানোর বাক্স পাশে রেখে ঘুমোচ্ছে। কী ভেবে শব্দহীন পায়ে মুরারির কাঠের বাক্স খুলে একটা ক্ষুর নন্দু বার করল। সরু গলিটা ফাঁকা, মানুষজন নেই। অনেক দূরে বড়ো রাস্তায়, বাবুর সাদা এ্যাম্বাসাডার গাড়ি। গাড়ির ভেতরে বসে ড্রাইভার ঝিমোচ্ছে। আসার পথে নন্দু এসব দেখে এসেছিল। গোলগাল, ফর্সা বাবুটাকে ঠিক কী শাস্তি দেওয়া যায়, নন্দু ঠিক করতে পারছিল না। প্রথমে ভেবেছিল ইঁট মেরে গাড়ীর কাঁচগুলো ভেঙে দেবে। পরে ভাবল, দরজা খুলে সোনামনি যখন কলতলায় যাবে, তখন দরজার খিলের বাড়ি লাগাবে বাবুর মাথায়; কিন্তু হঠাৎ ঘুমন্ত মুরারিনাপিত এবং তার কামানোর বাক্স দেখে নন্দুর ছকটা বদলে গেল। ক্ষুরটা নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে নন্দু ভাবল, এটা কোথায় কীভাবে চালাবে! গলায়, পেটে, ঘাড়ে অথবা বুকে? নির্জন এই গলি বিকেল ফুরোলেই জমজমাট, তখন কতো মানুষ, কথা, হল্লা, দরকষাকষি। হঠাৎ সোনামনির ঘরের দরজাটা খুলে যেতে নন্দুর বুক ধড়াস করে উঠল। নন্দু দেখল, ঘর থেকে বেরিয়ে রকের ওপর দিয়ে সোনামনি তাড়াতাড়ি কলতলায় চলে গেল। ক্ষুরটা খুলে চকচকে, ধারালো ফলাটার দিকে তাকিয়ে সিরসির করে উঠল নন্দুর শরীর। ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল নন্দু। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরে তাকিয়ে প্রথমে নন্দু কিছু দেখতে পেল না। ঘর ভর্তি ফ্যাকাসে অন্ধকার, ভারী বাতাস। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সে ঠাহর করল, বিছানায় সেই বাবু, শরীরে পোষাক নেই, দেওয়ালের পেরেকে পাঞ্জাবী ঝুলছে, ফিনফিনে দামী ধুতি বুকের ওপর তালপাকানো। দুচোখ বুজে বাবু লম্বা লম্বা শ্বাস ফেলছিল। চড়াক করে রক্ত উঠে গেল নন্দুর মাথায়। বেড়ালের মতো চুপচাপ ঘরে ঢুকে চোখের নিমেষে ধারালো ক্ষুরটা বাবুর শরীরের এমন একটা অঙ্গের ওপর নন্দু চালিয়ে দিল, যেখানে ক্ষুর ছোঁয়াবার কথা সে ঘুণাক্ষরে ভাবেনি। ক্ষুরটা চালাবার পর একটা আর্ত চিৎকার, এক ঝলক রক্ত, তারপর আর কিছু নন্দুর মনে নেই।

মায়ের আশ্রয়, পুরোনো পাড়া ছেড়ে সেই যে নন্দু পালাল, আর কোনদিন ঘরমুখো হয়নি। মাকে দেখার জন্যেও কখনো আসেনি।

ডাক্তারকে এই ঘটনাটা নন্দু বার দুই, তিন বলেছে। তিনবারের বর্ণনায় কিছু গরমিল থাকলেও মূল গল্পে খুব একটা অসঙ্গতি নেই। ঘটনাটা বলার সময়ে নন্দুর দুচোখের জমি ঘোলাটে হয়ে যায়, ঘন ঘন শ্বাস পড়ে এবং তারপরেই সে এলোমেলো, অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শুরু করে। ডাক্তার বুঝতে পারে, নন্দুর চেতনায় কুয়াশা জমেছে, ভেঙে পড়ছে বেতাল জগতের ঢেউ। নন্দুর কাছ থেকে কিছু মজার তথ্যও ডাক্তার পেয়েছে। নন্দু যখন তার কুখ্যাতির

তুলে, রাজার হালে তখন সে জীবন কাটাতো। টালিগঞ্জ রেলপুলের পাশে, টিনপেটা বস্তির একটা ঘরে তখন নন্দুর আস্তানা। প্রায় সতেরো হাজার লোক থাকতো টিনপেটা বস্তিতে। ঠিকে ঝি, চাকর থেকে শুরু করে স্মাগলার, চোর স্যুটকেস্‌লিফটার, চোলাইমদের কারবারী, মাসিক আয় কারো একশো টাকা, কারো দশ, বিশ হাজার। কিন্তু বস্তির কুঁজো ঘরগুলোয় নানা পেশার মানুষেরা সকলেই পাশাপাশি, গলাগলি, মারদাঙ্গা, খিস্তিখেউড় লেগেই থাকতো। আবার বস্তির কারো গায়ে বাইরের কেউ হাত দিলে লেগে যেতো ধর্মযুদ্ধ, বোমা, বন্দুক, পাইপগানের অভাব ছিল না টিনপেটা বস্তিতে। বস্তির একদিকে রেললাইন আর একদিকে হাজামজা আদিগঙ্গার খাল। বেশীর ভাগ শিশু, জন্মের পর থেকে রেললাইনের পাশে শুয়ে বড়ো হয়েছে। জ্ঞান হতে লাইনে দাঁড়ানো বিকল ইঞ্জিন বা মালগাড়ী ধরে দাঁড়াতে শিখেছে। হাঁটতে শিখেই চেপে বসেছে ওয়াগনের ওপর, তারপর কেউ হয়েছে ওয়াগন ব্রেকার, কেউ স্মাগলার বা এই রকম কিছু। ট্রেনে কাটা পড়ে ফি বছর কিছু শিশু মারা যায়।

টিনপেটা বস্তির উত্তরদিকে পিচের রাস্তা। এই রাস্তায় ভজনের চায়ের দোকানে নন্দু তখন আড্ডা দিত। চা ছাড়াও কিছু খাবার দাবার ভজন বানাতো। তাছাড়া কাঁচের বয়ামে থাকতো বিস্কুট আর কেক। রোজ সকালে নন্দুর জলখাবার ছিল চারটে কেক, দুটো ডিম, দু প্লেট গরম আলুর দম, হাফ পাউণ্ড পাউরুটি, এক লিটার দুধ আর পাঁচ কাপ চা। পাঁচ কাপ চা খেতো ভোর থেকে সকাল নটার মধ্যে। সকালের এই জলখাবার খাওয়াটাই ছিল নন্দুর সবচেয়ে বড়ো বিলাসিতা। পকেটে টাকা থাকলে রোজ সকালে, পনেরো বিশ টাকা জলখাবারে খরচ করতো নন্দু। কিন্তু ভালো জলখাবার খাওয়ার পরেই সে বিপাকে পড়তো। মনে হতো এতো টাকা বেকার খরচ হলো, পায়খানা করার জন্যে খালপাড়ে গিয়ে বসতে হবে। টিনপেটা বস্তিতে যে কটা পায়খানা ছিল, মেয়েরা ব্যবহার করতো, ছেলেরা ঢোকার সুযোগ পেত না। নন্দু ঠিক করে ছিল, বাড়ী ঘর না হলেও মোজাইক করা একটা পায়খানা সে বানাবে।

পাঞ্জাবী পরা, গোলগাল, ফর্সা সেই ভদ্রলোককে ক্ষুর মেরে বাড়ী আর পাড়া ছেড়ে পালালেও খুব বেশী দূরে নন্দু যায় নি। কাছাকাছি, চেতলায় আশ্রয় নিয়েছিল। কালিঘাট স্টেশন আর খালের ধারে তিন, চার রাত কাটিয়ে ছিল নন্দু। ভয়ে উদ্বেগে প্রায় এক মাস বড়ো রাস্তা মাড়ায় নি। ধীরে ধীরে সাহস আর আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে চেতলা এলাকায় নন্দু ঘোরাফেরা শুরু করল। টিনপেটা বস্তির চোলাই মদের কারবারী খাটুয়া রবির সঙ্গে কিভাবে যেন তখন একদিন পরিচয় হলো নন্দুর। টিনপেটা বস্তিতে রবির

তখন খুব রমরমা, জমিয়ে ব্যবসা করছে। বস্তির খদ্দের ছাড়াও, পুলিশের লোকজন, এমন কি দু'দশ জন ভদ্রলোকও রবির চোলাইএর ঠেকে আসতো। ফাইফরমাস খাটার ছোকরা চাকর হিসেবে নন্দুকে খুব পছন্দ হলো রবির। নাম, পরিচয় ঠিকানা গোপন করে নন্দু নিজেকে পাঁচু বলে পরিচয় দিয়েছিল, বাড়ী সোনারপুর। পাঁচ সাত বছর খাটুয়া রবির আশ্রয়ে নন্দু ছিল। এখানে সকলে তাকে ব্যাঁকা পাঁচু নামে চিনল। রবির সাকরেদী ছেড়ে বছর খানেক এলোমেলো ঘুরে নন্দু নিজের দল গড়ল। পাতালরেলের মাল লোপাটের সুবাদে তড়বড়িয়ে বেড়ে উঠল নন্দুর দল। এই সময়ে নন্দু বহু টাকা কামিয়েছিল। তখন রোজ সকালে পনেরো, বিশ টাকার জলখাবার খেয়ে মোজেক করা একটা ঝকঝকে নতুন পায়খানা বানানোর কথা নন্দু ভাবতো। নানা কাজ, ব্যস্ততা, বিপদ, উত্তেজনার মধ্যেও সেই বিশাল বাড়ীটার সামনে নন্দু মাঝে মাঝে গিয়ে দাঁড়াতো। ছবির মতো সুন্দর সেই বাড়ীর বারান্দায় কখনো তিন চার জন বাচ্চা খেলতো, কখনো বারান্দার রেলিংয়ে বুক চেপে দাঁড়িয়ে থাকতো একজন মলিন, সুন্দরী যুবতী। মেয়েটা কে? বারান্দার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে নন্দু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতো। ক্রোধ, জ্বালা, অসহায়তায় হুহু করতো তার বুক। বোমা মেরে এই ঝকঝকে সুন্দর বাড়ীটা উড়িয়ে দিলে কেমন হয়? রাগ আর অনুতাপ মেঘের মতো নন্দুর মাথায় ঘনিয়ে উঠতো।

চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবেই সমাজবিরোধী, গুণ্ডা, বদমাসদের নিয়ে লেখা, একজন নামী ঔপন্যাসিকের একটা উপন্যাস ডাক্তার একবার পড়তে দিয়েছিল নন্দুকে। বইটা পড়ে আলোড়িত হয়েছিল ডাক্তার। ভেবেছিল, এমন একটা উপন্যাস পড়ে নন্দুর উপকার হবে। বিষে বিষক্ষয়, মোক্ষম অ্যাবরেগেশনই মনের চিকিৎসায় অব্যর্থ দাওয়াই। উপন্যাসটা পড়ে শেষ করতে নন্দু প্রায় দেড় মাস নিয়েছিল। ডাক্তার একদিন, বইটা কেমন লাগল প্রশ্ন করতে নন্দু জবাব দিল, বাজে, বানানো, ঝুটা মাল। ডাক্তার আহত, অবাক হলো। নন্দুর চোখের ওপর নজর পড়তে ডাক্তার দেখল, ঘোলাটে, জটিল হয়ে উঠছে নন্দুর দু'চোখের জমি আর দৃষ্টি। ব্যক্তিগত জীবনের দুর্ঘটনা আর কোনো আবেগময় সত্য বলতে গেলে নন্দুর এরকম হয়।

উপন্যাসটা সম্পর্কে নিজের মতামত জানিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নন্দু বলল, এই বইয়ের লেখকের চিতাতেও আমি পেচ্ছাপ করেছিলুম।

কেন, ডাক্তার প্রশ্ন করেছিল।

আমাদের টিনপেটা বস্তির চারপাশটা দুদিন ঘুরে গিয়ে এই লেখক আমাদের বস্তি নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছিল। যাচ্ছেতাই, ষোলআনা ভেজাল।

উপন্যাসটা তুমি পড়েছিলে ?

ডাক্তারের প্রশ্ন শুনে নন্দু বলেছিল, নাহ্ তখন আমার সময় ছিল না। বইটার কিছু জায়গা, আমার এক বন্ধু, তার খুব গল্প পড়ার নেশা, সেই বন্ধু পড়ে শুনিয়েছিল আমাকে। যেটুকু শুনেছিলুম, তাতেই রাগ চড়ে গিয়েছিল আমার মাথায়। লেখকের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিলুম, সে খবরের কাগজের লোক, রিপোর্ট লিখে লিখে আর না পড়ে পড়ে তারা সবজান্তা। এই রিপোর্টার লেখক যে টিনপেটা বস্তির কিছু জানে না, এটা আমি বুঝতে পেরেছিলুম।

পাঁচ, সাত মিনিট সুস্থ সচেতনভাবে কথা বলেই নন্দুর বিকার শুরু হয়। চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাষা বদলে গিয়ে চোয়াল, চিবুক শক্ত হয়ে ওঠে। নন্দু একদিন বলল, সে ইচ্ছে করে ধরা না দিলে শ্মশান থেকে তাকে কোনদিন পুলিস ধরতে পারতো না।

ধরা দিলে কেন, ডাক্তার জানতে চেয়েছিল।

জানি না।

কথাটা বলে নন্দু গুম হয়ে গেলেও ধরা পড়ার কাহিনী, ডাক্তার নন্দুর মুখে আগেই শুনেছে। আরো এক, দু'বার শুনলে কাহিনীর তুলনামূলক সত্যতা যাচাই করতে ডাক্তারের সুবিধে হবে। কাহিনীর মিল এবং গরমিলগুলো খুঁজে পেলে নন্দুর অন্তর্লোকের রহস্যময়, জটিল গিঁটগুলো সহজেই খুলে ফেলা যায়। ধরা পড়ার ঘটনা নন্দু যা বলেছিল, তা অনেকটা এইরকম।

পাতাল রেলের চোরাই লোহালক্কড়ের একটা লরি চালান দিয়ে মোটা টাকা পকেটে, তখন প্রায় মাঝ রাত, পায়ে হেঁটেই নন্দু তার ডেরায় ফিরছিল। হঠাৎ নন্দু দেখল, সেই ছবির মতো সুন্দর বাড়ীটার সামনে অনেক মানুষের ভীড়। বাড়ীটার সামনে কেন, কখন, কীভাবে যে এলো, নন্দু টের পায় নি। হাট করে খোলা দুটো লোহার গেট। সেখানে চোখ পড়তে নন্দু পাথর হয়ে গেল। দামী, নতুন খাটে ফুলে, মালায় সাজানো যার দেহ, সে মানুষটার মুখ নন্দুর চেনা, মানুষটার নামও সে খোঁজ খবর করে জেনেছে। রাত প্রায় বারোটা, তবু গেটের সামনে বেশ ভীড়, দু'চারজন করে মানুষ তখনও আসছে। কারো হাতে মালা, কেউ এনেছে পুষ্পস্তবক, খালি হাতেও এসেছিল অনেকে। রাস্তার দু'পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ী। শোকস্তব্ধ মানুষজন, নিচু গলায় কথা বলছিল। সেই ফিসফিস কথার কিছু কিছু নন্দুর কানেও ঢুকছিল।

অনিমেষবাবুর মতো এমন উদার হৃদয়, সজ্জন মানুষ আমি দেখিনি, একজন বলল।

ধুতিপাঞ্জাবী পরা একজন বয়স্ক মানুষ মন্তব্য করল, সত্যিকারের মানব-প্রেমিক ছিলেন ঘোষালমশাই।

বাচ্চাদের ভালোবাসতেন খুব, একজন জানাল।

ধুতিপাঞ্জাবী পরা মানুষটি সায় দিল, ঠিক তাই। একটা শিশু হাসপাতালে প্রায় লাখ টাকা দিয়েছেন ঘোষালমশাই।

রাত বাড়ার সঙ্গে ভীড় ভারি হচ্ছিল, আরো লম্বা হচ্ছিল গাড়ীর লাইন।

মানুষটার মুখের দিকে অবোধ বিস্ময়ে নন্দু তাকিয়েছিল। বিরাট শোক-মিছিলের সামনে, লরিতে মৃতদেহ, রাত একটার পর শ্মশানযাত্রা শুরু হলো। কাছেই ক্যাওড়াতলা শ্মশান। সেখানেও জড়ো হয়েছিল বিস্তর লোক। পকেটে প্রায় দু'হাজার টাকা, তখনই নন্দুর ডেরায় ফেরা উচিৎ, কিন্তু নন্দু পারল না। মিছিলের সঙ্গে মিলে গেল। রাত প্রায় দুটোর সময় চিতা জ্বলল, তার আগে অনিমেষ ঘোষালের তিন ছেলে পাটকাঠি জ্বেলে, চিতার চারপাশ ঘুরে বাবার মুখাগ্নি করেছে। ক্রমশঃ ঘন আগুনে ঢেকে গেল মৃতদেহ। সামান্য দূরে অন্ধকারে মেয়েলী গলায় কে যেন ডুকরে কেঁদে উঠতে নীরব শ্মশান চমকে উঠল।

কে কাঁদে, ধুতিপাঞ্জাবী পরা সেই বয়স্ক মানুষটি প্রশ্ন করল।

পাগলী, টাগলী হবে, জবাব দিল একজন।

অনিমেষ ঘোষালের এক ছেলে বিরক্ত মুখে বলল, পাগলীটাকে সরিয়ে দাও এখান থেকে।

এসব কথা নন্দু শুনছিল না। মেয়েলি গলার কান্না শুনে সে দেখল, চিতার বেশ কিছুটা দূরে, আবছা আলোয়, ছায়ার মতো যে দাঁড়িয়ে আছে, তার নাম সোনামনি, সে নন্দুর মা। চিতার দিকে সোনামনির অপলক দৃষ্টি, দুচোখমুখ জলে ভেসে যাচ্ছে, নন্দুকে দেখতে পায়নি। নন্দু হতবাক, স্তব্ধ, কী করবে ভেবে পেল না। তখনই নন্দু দেখল, দুজন লোক প্রায় জোর করে ঠেলে শ্মশানের বাইরে সোনামনিকে পাঠিয়ে দিল। এতোক্ষণের বিভ্রম, সম্মোহন কেটে গিয়ে চিতার দাউদাউ আগুন ছড়িয়ে পড়ল নন্দুর মাথায়।

চোখের নিমেষে ষণ্ডা লোকদুটোর পথ আগলে নন্দু দাঁড়িয়ে গেল। দু'হাতে মুখ ঢেকে সোনামনি ফুঁপোচ্ছে।

একে তাড়াচ্ছেন কেন, একজনকে প্রশ্ন করল নন্দু।

সে লোকটা নন্দুর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দরকার বোধ করল না।

নন্দু ফের বলল, ওকে ছেড়ে দিন।

শোক মিছিলের কয়েকজন তখন নন্দুকে ঘিরে ধরেছিল। একজন তার কোমরে সজোরে লাথি কসাল। নন্দু দেখল, তার দিকে তাকিয়ে সোনামনি

চিনতে পারল না। শ্মশানের বাইরে অন্ধকার কালিঘাট রোড ধরে ধীর পায়ে পূর্বদিকে নন্দু হাঁটতে শুরু করল। একটা লাথি এবং কয়েকটা চড়চাপড় খেয়ে শ্মশানের পাশে স্মৃতিস্তম্ভের অন্ধকার বাগানে নন্দু চুপচাপ বসেছিল অনেক্ষণ। মাথার মধ্যে ধিকিধিকি আগুন, রাগ, অভিমান, কান্না। এখনই দলবল নিয়ে পুরো শ্মশান সে কাঁপিয়ে দিতে পারে, বোমায়, গুলিতে এমন তাণ্ডব শুরু করতে পারে যে, আধপোড়া মড়া চিতায় ফেলে রেখে লোকগুলো পালাতে পথ পাবে না। কিন্তু নাহ্, নন্দু আজ ভারী ক্লান্ত, দুর্বল, নড়তে ইচ্ছে করছে না। বিলুয়া, ভীম আর কালুকে বাড়ী থেকে ডেকে আনার শক্তি বা উৎসাহ তার শরীরে নেই। সোনামনি কেন তাকে চিনতে পারল না? নিজের পেটের ছেলে কতোটা বদলে গেলে মা চিনতে পারে না তাকে? কী এক বিষাদ আর ধাঁধা মাথায় নিয়ে নন্দু বসে থাকল। একবার তার মনে হলো, সেই দুপুরে, ঘোষালবাবুর শরীরের গোপনতম জায়গায় ক্ষুর চালানোর ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা মনে রেখেই মা এড়িয়ে গেল নন্দুকে। কিন্তু কী অপরাধ নন্দু করেছে?

কখন যেন আগুন কমে গিয়ে চিতা নিভতে শুরু করেছে। শ্মশান এবং চিতার চারপাশে ভীড়ও অনেক পাতলা। নন্দু দেখল চিতায় জল দেওয়ার জন্যে কলসী হাতে মৃতের তিন ছেলে গঙ্গার ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হরিধ্বনিতে শেষবার শ্মশান কেঁপে উঠল।

সেই কদর্য, দুষ্কর্মের নেশাটা নন্দুর শরীরে যেন জেগে উঠছে। অন্ধকার মাঠ ছেড়ে চুপচাপ নন্দু শ্মশানে এসে ঢুকল। শ্মশানযাত্রীরা এখন সংখ্যায় অনেক কম, যারা আছে তাদের চোখমুখেও ক্লান্তি, অবসাদ, এদিকে ওদিকে বসে ঢুলছে কেউ কেউ। ভোর হতে আর দেরী নেই। নিভন্ত চিতার পাশে গিয়ে প্যান্টের বোতাম খুলে নন্দু সেই অপকর্ম শুরু করল। জ্বলন্ত কাঠের ওপর ছ্যাঁৎ করে জলের শব্দ হলো। এর আগেও বহুবার নন্দু এই অপকর্ম করেছে। কিন্তু নন্দুর মতে সেদিন ভোররাতে চিতা ভাসিয়ে সে যা আনন্দ আর আরাম পেয়েছিল, এমন আর কখনো পায় নি।

নন্দুর এই রহস্যময়, বিকৃত মানসিকতার কারণ সম্পর্কে কেসডায়েরীতে কিছু না লিখলেও ডাক্তারের ধারণা, নন্দু একটা কিছু ভাসিয়ে দিতে চাইছে। সেটা কী, নন্দু এখনো স্পষ্ট জানে না, জানলে হয়তো সে পুরোপুরি সেরে উঠবে। আপাততঃ তার দীর্ঘ চিকিৎসা দরকার॥

আবহমান স্বদেশ

দুপুর একটা নাগাদ ট্রেনটা ধানবাদে ঢোকার আগেই কামরার মধ্যে খবরটা রটে গেল। চলন্ত ট্রেনের কামরায় বসেও ট্রানজিস্টার শোনা যাদের বাতিক, দিল্লি থেকে প্রচারিত বিশেষ সংবাদ বুলেটিনটা তাদের কেউ একজন শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি। দ্বিতীয়বার শুনে বুঝল, ঘটনা সাংঘাতিক, দিল্লিতে নিজের বাসভবনে, প্রধানমন্ত্রী তাঁর দেহরক্ষীদের গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছেন। সংজ্ঞাহীন প্রধানমন্ত্রী এখন হাসপাতালে। আততায়ীদের যে তিনজনকে ধরা হয়েছে, তাদের মধ্যে দু'জন শিখ।

বিদ্যুৎ গতিতে খবরটা কামরার মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে ভেতরটা থমথমে, গুমোট হয়ে গেল। নানা জাতের, [illegible]ভাষীর কিছু মানুষ, যারা এতক্ষণ গায়ে গা লাগিয়ে কথা, আলোচনা, হাসির [illegible] সদ্য গড়ে ওঠা পরিচয়কে গাঢ়, গভীর ক'রে পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসছিল, তারা সকলেই হঠাৎ কেমন গুটিয়ে গেল।

খবরটা প্রথমে কেউ বিশ্বাস করেনি। যে লোকটা ট্রানজিস্টার শুনছিল, তার কাছ থেকে খবরটা পেয়ে, তাকে ঘিরে ধরল অনেকে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন যাত্রীর ব্যাগ, স্যুটকেস থেকেও নানা আকারের গুটিকয়েক ট্রানজিস্টার বেরোল। দশ, পনেরো মিনিট অন্তর এই ভয়ঙ্কর খবর, সারা দেশের সঙ্গে দিল্লিগামী এক চলন্ত ট্রেনের কামরার মধ্যে বারবার আছড়ে পড়তে থাকল।

এমন এক মারাত্মক খবর শুনে অমলেন্দু বেশ ঘাবড়ে গেলেও জানলার ধারে নিজের সিটটায় সে চুপচাপ বসেছিল। প্রধানমন্ত্রীর জন্যে উদ্বেগের সঙ্গে তার মাথায় জমে উঠল অন্য দুশ্চিন্তা। জরুরী ব্যবসার কাজে সে দিল্লি যাচ্ছে। কাল দুপুরে দিল্লি পৌঁছে, পরশু, তরশু মোট আটচল্লিশ ঘণ্টায় সব কাজ শেষ করে, তরশু বিকেলেই তাকে আবার হাওড়ার ট্রেনে চেপে বসতে হবে। গুরুতর আহত প্রধানমন্ত্রী যদি হাসপাতালে মারা যান, তাহলে দিল্লির সব অফিস-কাছারি নিশ্চয় দুতিন দিন বন্ধ থাকবে। তার মানে অমলেন্দুর যাবতীয় পরিকল্পনা, কাজ গুবলেট!

বছর তিন, চার হলো, অমলেন্দু কেমিক্যালের একটা ব্যবসা শুরু করেছে।

শুরুতে খুব ছোট্ট থাকলেও তার ব্যবসা এখন বাড়ছে। এই বাড়ের মুখে প্রতিটি দিন, প্রত্যেকটা যোগাযোগ, অ্যাপয়েন্টমেন্ট, সাক্ষাৎকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যবান। কোনো একটা যদি বাদ পড়ে, ফসকে যায়, বিপদ হতে পারে। ব্যবসার ছোট, বড়, খুটিনাটি নানা তাগিদ সম্পর্কে অমলেন্দু বেশ সতর্ক, সজাগ। ব্যবসা আজ বাড়লেও কাল পড়ে যেতে পারে। তাই অমলেন্দু খুব হিসেবী, মিতব্যয়ী, নিয়মনিষ্ঠ, ঝুঁকি নিতে, দুঃসাহস দেখাতে সে রাজী নয়। ব্যবসার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকা সে ধার নিয়েছে, নিয়মিত সুদসহ ধীরে ধীরে সে টাকা শোধ করে দিচ্ছে অমলেন্দু। তার ধারণা, আগামী দু-বছরের মধ্যে ব্যাঙ্কের পুরো টাকা সে মিটিয়ে দিতে পারবে।

জায়গা থেকে না উঠেও প্রধানমন্ত্রীর আহত হওয়ার খবর শুনে কামরার মধ্যে যে অস্বস্তি, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে, অমলেন্দু টের পেল। লম্বা, থ্রি-টায়ার এই শোবার গাড়ি, প্রায় পুরোটা ভর্তি। তার মানে যাত্রীসংখ্যা পঁচাত্তরের কাছাকাছি। দুর্ঘটনার খবরটা শুনে সকলেই কেমন বিহ্বল। চুপচাপ হয়ে গেছে। দিল্লি থেকে প্রচারিত [illegible]ও বিশদ খবর শোনার জন্যে প্রতি ট্রানজিস্টার ঘিরে এক ঝাঁক ম[illegible]

হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ার সময়ে এই পাঁচমিশেলী জনতার আলাদা কোন পরিচ[illegible]না, সকলেই যাত্রী, ভারতবাসী। কিন্তু দুর্ঘটনার খবরটা শোনার পর পাঁচ, সাতটা ট্রানজিস্টার ঘিরে দাঁড়ানো মানুষগুলোর নতুন পরিচয় অমলেন্দু খুঁজে পেল। কামরার পেছন দিকে একটা জাপানী ট্রানজিস্টারের চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা মাড়ওয়ারি, ডানদিকে একটা পকেট ট্রানজিস্টারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যে ছ-সাতজন খবর শোনার চেষ্টা করছে, তারা নিশ্চয় দক্ষিণ ভারতীয়, সম্ভবত কেরালা বা অন্ধ্রের মানুষ, কামরার একদম সামনে জনাদশেক মোটাসোটা লোক, খুব হইচই করে শোক প্রকাশ করছে, ওরা বিহার এবং উত্তরপ্রদেশবাসী। একই প্রদেশের মানুষ হয়েও ট্রেন ছাড়ার পর থেকে গত তিন, সাড়ে তিন ঘণ্টা ওরা কামরার মধ্যে অচেনার মতো ছড়িয়ে বসেছিল। অথচ দিল্লির দুর্ঘটনার খবর শুনে কী তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে থাকা মানুষগুলো প্রাদেশিক জোট বেঁধে ফেলেছে!

অমলেন্দুর সিটের সামান্য আগে, নানা বয়সী নারী পুরুষ মিশিয়ে ছ'সাত জনের একটা বাঙালী পরিবার জায়গা পেয়েছে। কামরায় যাত্রীদের এই ছানা কেটে যাওয়া চেহারা দেখে, বাঙালী পরিবারের এক প্রৌঢ় এসে অমলেন্দুকে ফিসফিস করে বললেন, আমাদের ওখানে চলে আসুন।

কেন, জানতে চাইল অমলেন্দু।

অমলেন্দুর সামনের সিটে বসা বছর চোদ্দ, পনেরোর এক শিখ কিশোরকে

চোখের ইসারায় দেখিয়ে বয়স্ক ভদ্রলোক কিছু একটা বলতে চাইলেন!

ট্রেনে ওঠার সময় ছেলেটাকে এক পলকের জন্যে অমলেন্দু দেখেছিল। এখন ভাল করে নজর করল। মাথায় পাগড়ি বাঁধা এক কিশোর, ছিপছিপে, মজবুত স্বাস্থ্য, এতো উত্তেজনা, অস্থিরতায় বেশ বিব্রত হলেও অমলেন্দুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে হাসল। বয়স্ক মানুষটার চোখের ইসারা দেখে, তাকে নিয়েই যে কথা হচ্ছে, এটা বুঝে একটু সংকুচিত হয়ে জানলার বাইরে বিস্তীর্ণ পৃথিবীর দিকে কিশোরটি চোখ রাখল।

চলে আসুন, চাপা গলায় বয়স্ক ভদ্রলোকটি আবার ডাকলেন অমলেন্দুকে। ভদ্রলোকের কথায়, আচরণে আন্তরিকতা থাকলেও সিট ছেড়ে তার সঙ্গী হতে লজ্জা করছিল অমলেন্দুর। সে বলল, দরকার হলে আপনাদের ওখানে চলে যাব।

ভদ্রলোক চলে যেতে পাগড়ী বাঁধা ছেলেটা কামরার শেষ মাথায় শুধুমাত্র মেয়েদের থাকার জন্যে যে খুপরিটা আছে, সে দিকে তাকাল। অমলেন্দু জানে, ছেলেটার মা আর ছোট বোন ওখানে আছে। হাওড়ায় [illegible] আগে, মাঝবয়সী এক শিখ ভদ্রলোক [illegible] বলেছিলেন, আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে দিল্লি যাচ্ছে, ওদের একটু দেখবেন।

এক লহমা ছেলেটাকে দেখে তখন ঘাড় নেড়েছিল অমলেন্দু। [illegible] সেই শিখ আবার বললেন, একসঙ্গে সিট পেলাম না। বৌ আর মেয়ের জায়গা হল মেয়েদের কামরায়, আর ছেলের সিট আপনার সামনে। আমি যাচ্ছি না। আমার তিন বন্ধু, দেশের লোক, ফ্যামিলি নিয়ে তাঁরা পাশের কামরায় আছেন। তাঁরাও দিল্লি যাবেন। খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে তাঁদেরও বলে গেলাম।

ভদ্রলোকের সব কথা অমলেন্দু শুনছিল না। এবং তিনি নেমে যেতেই সামনে বসা কিশোরটির কথা অমলেন্দু ভুলে গিয়েছিল। এটাই স্বাভাবিক দূরপাল্লার ট্রেনে অল্পবয়সী ছেলে, মেয়ে বা স্ত্রীকে একা পাঠালে বেশিরভাগ অভিভাবক খুব উতলা হন। নিজের ঘরের লোকটিকে দেখাশোনা করার জন্যে যাত্রীদের দু একজনকে অনুরোধ করেন। যাত্রীরাও নিয়মমাফিক আশ্বাস দেন। কিন্তু কোন পক্ষেরই কাউকে বিশেষ দরকার হয় না। অমলেন্দু এসব জানে। তাই এমনিতে লাজুক, অমলেন্দু ট্রেনে উঠে কম কথা বলে, বই পড়ে ঘুমিয়ে বা খোলা জানালার বাইরে পৃথিবীর মাটি, আকাশ, গাছপালা দেখে সময় কাটিয়ে দেয়। অমলেন্দু জানে, ট্রেনের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে একজন যাত্রীর কয়েকঘণ্টা সময় লাগে। সেই সময়টুকু পার হলে, সে অনেক নমনীয়, সহনশীল, বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। আলাপ করা, কথা বলা, তখনই

শুরু করা উচিত। ট্রেনে উঠে তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব করতে গেলে শুরুতেই ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে।

ধানবাদ স্টেশনে যে দশ মিনিট ট্রেন দাঁড়াল, তখনও প্ল্যাটফর্মে অনেক লোক, তাদের কিছু যাত্রী, কিছু এসেছে আত্মীয় বন্ধুদের ট্রেনে তুলে দিতে। ফেরিওলা, দোকানদার সওদা নিয়ে ব্যস্ত, বেশ কয়েকজন যাত্রী ট্রেনে উঠল। অমলেন্দুদের কামরাতেও উঠলেন এক প্রবীণ দম্পতি। প্রধানমন্ত্রীর জখম হওয়ার খবরটা ইলেকট্রিক চাবুকের মতো দেশের পিঠের ওপর আছড়ে পড়ার ঠিক পরে অসাড় হয়ে গেছে সাধারণ মানুষের চিন্তা, অনুভূতি। প্ল্যাটফর্মের নানা জায়গায় দাঁড়িয়েছিল চাপ চাপ মানুষ, তাদের কেউ সন্ত্রস্ত, কারও চোখে মুখে, চাউনি আর চলাফেরাতে অস্থির উত্তেজনা। এখন যে ঠিক কী করা উচিত, মানুষগুলো ভেবে পাচ্ছে না। জানলার পাশে বসা শিখ তরুণটিকে [illegible] চোখে দেখল কেউ কেউ। নিরীহ, সরল কিশোরটি কিছু একটা বিপদের [illegible] ক্রমশ ম্লান হয়ে যাচ্ছিল। হুইসিল্ দিয়ে ট্রেন ছাড়তে অমলেন্দু হাঁপ ছে[illegible]চল পরের স্টে[illegible]খানায় গাড়ি ঢুকবে দুপুর দুটোয়, তারপর বিকেল পাঁচটায় কিউল [illegible]

স্টেশন ছেড়ে রুক্ষ, পাথুরে, দিগন্তবিস্তৃত সমভূমি, ছোট ছোট গ্রাম, শর[illegible]ল রোদে চারপাশ ডুবে আছে, হুস করে চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে ছোট একটা স্টেশন। অল্পবয়সী কয়েকটা ছেলে মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়োচ্ছে। লাইনের অদূরে, এক চিলতে ডাঙাজমির ওপর কয়েকটা মোষ দু-চোখ বুজে জাবর কাটছে, সব কিছু শান্ত, নিস্তরঙ্গ, স্বাভাবিক। কিন্তু কামরার মধ্যে কথা, হাসি, হইচই কমে গিয়ে অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমেছে। কামরার বিভিন্ন অংশের জটলাগুলো সম্পর্কে অমলেন্দু যা ভেবেছিল, অনেকটা মিলে গেল। ধানবাদ পর্যন্ত যাত্রীদের বেশিরভাগ হয় ইংরিজীতে অথবা হিন্দিতে কথা বলছিল। এখন বিভিন্ন জটলায় যে যার মাতৃভাষা, মালয়ালাম, হিন্দি, তামিল, গুজরাটি, বাংলা এমন কি ওড়িয়াও বলছে। কিন্তু সকলের কণ্ঠস্বরই চাপা, খুব নিচু গলায় কথা বলছে তারা। দরজার মুখে কালো কোটপরা যে কণ্ডাক্টর বসেছিল, তাকে দেখতে পেল না অমলেন্দু। লোকটা গেল কোথায় ?

বয়স্ক সেই বাঙালী ভদ্রলোক এসে অমলেন্দুর সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন।

আবহাওয়া ভাল নয়, ভদ্রলোক বললেন, বিবিসির খবর প্রধানমন্ত্রী সকালেই মারা গেছেন।

খবর শুনে অমলেন্দু দমে গেল। প্রধানমন্ত্রী মারা যাওয়া মানে দিল্লিতে তার ব্যবসার, কাজের সমূহ ক্ষতি। হয়ত তিন, চার দিন রাজধানীতে আটকে

যেতে হবে অমলেন্দুকে। বাড়িতে বৌ, ছেলে, মেয়ে, বুড়ি মা, দুশ্চিন্তায় অধীর হবে। তাছাড়া অমলেন্দুর নিজের কারখানা, সে না থাকলেই কারখানায় কিছু গোলমাল লেগে যায়। কর্মচারীদের নিয়মিত খরচ বাবদ কিছু না দিলে তারাও চটে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর খবর শুনে অমলেন্দুর দুর্ভাবনা বেড়ে গেল। খানিকটা প্রশ্নের ভঙ্গিতে ভদ্রলোক ফের বললেন, নিজের বাড়িতে দেহরক্ষীদের হাতে প্রধানমন্ত্রী যদি খুন হয়ে যান, তাহলে অবস্থাটা ভেবে দেখুন;

অবস্থা সম্পর্কে তার যে কী ভাবার আছে, অমলেন্দু ভেবে পেল না। সে শুধু নিঃশব্দে ঘাড় নাড়তে লাগল। ভদ্রলোক নিচু গলায় বললেন, খুনীদের দুজন শিখ।

সামনে বসা পাগড়ী বাঁধা কিশোরটি ভদ্রলোকের কথাটা শুনল কিনা, অমলেন্দু আন্দাজ করতে পারল না। গাড়ির মধ্যে বিভিন্ন জটলায় এখন একই আলোচনা। নানা ভাষায় নিজেদের মধ্যে এই শোচনীয় দুর্ঘটনা নিয়ে যাত্রীরা চুলচেরা বিচার করছে। গত কয়েকমাস ধরে দেশ জুড়ে যে অরাজকতা, খুনখারাবি চলেছে, তা নিয়ে সকলেই উদ্বিগ্ন। সেই উদ্বেগের সঙ্গে ক্রমশ মিশছে অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক, ভয়। নির্বিঘ্নে, নিরাপদে দিল্লি পর্যন্ত যেন ট্রেনটা যেতে পারে, এখন সকলে এটা চাইছে।

বরকাখানা স্টেশনে যখন ট্রেন ঢুকল, দুটো বেজে গেছে। ঠিক সময়ে হাওড়া থেকে ছেড়েও ট্রেনটা আধঘণ্টার বেশি লেট। এখানে ট্রেন দাঁড়াবে দশ মিনিট। প্ল্যাটফর্মের চেহারা দেখে অমলেন্দু বেশ অবাক হল। প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফাঁকা, ভেণ্ডারদের ট্রলিগুলো নেই, ফিরিওয়ালারা বেপাত্তা, শুধু কয়েকজন আতঙ্কিত যাত্রী হুড়োহুড়ি করে গাড়িতে উঠে পড়ল। স্টেশনের বাইরে অনেক মানুষের গলা, কি যেন একটা গণ্ডগোল লেগেছে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা পাথরের বড় টুকরো এসে অমলেন্দুর পাশে জানলার বাইরে লেগে প্ল্যাটফর্মের ওপর পড়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গিয়েছিল অমলেন্দু। শিখ ছেলেটাকে লক্ষ্য করে আড়াল থেকে যে কেউ পাথরটা ছুঁড়েছে, এটা বুঝতে অমলেন্দুর অসুবিধে হল না। কিন্তু নিরীহ, সরল ছেলেটা ব্যাপারটা ধরতে পারে নি। ঘাড় কাত করে লোহার শিক লাগান জানলায় রেখে, কে পাথর ছুঁড়েছে ছেলেটা দেখার চেষ্টা করল। প্ল্যাটফর্মে রেলপুলিসের উর্দিপরা কয়েকজন কর্মী, তাদের হাতে কুচকুচে কালো বেয়োনেট লাগান রাইফেল। শিখ ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দুই রেলপুলিস কি যেন বলাবলি করছে। ছেলেটাকে কোন কথা না বলে পাশাপাশি দুটো জানলা অমলেন্দু বন্ধ করে

দিল। বিশুদ্ধ বাংলায় ছেলেটা বলল, আর একটু হলে পাথরটা আপনার মাথায় লাগত।

ছেলেটার মুখে নিখুঁত বাংলা শুনেও অমলেন্দু কথা বলল না। বোকা ছেলেটা এখনও বোঝেনি যে, তার মাথা ফাটাবার জন্যেই পাথরটা ছোড়া হয়েছিল। বরকাখানা স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পর অমলেন্দু খুঁটিয়ে দেখল ছেলেটাকে। প্রশ্ন করল, তোমার নাম কী?

সুরেন্দ্র সিং গেলট, ছেলেটা জবাব দিল।

এতোক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ছেলেটার যেন দম আটকে গিয়েছিল। অমলেন্দু কথা শুরু করতে তাই সুরেন্দ্র বেঁচে গেল। অমলেন্দু দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করার আগেই সুরেন্দ্র মহা উৎসাহে শুরু করল নিজের কথা। সে খালসা স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। মিশন রোডে তার বাবার মোটর পার্টসের দোকান। নভেম্বরের পাঁচ তারিখে সুরেন্দ্রর মাসীর বিয়ে। তাই মা আর বোনকে নিয়ে দিল্লিতে, মামারবাড়ি যাচ্ছে সে। কলকাতায় তার বন্ধুদের বেশিরভাগ বাঙালী। শুধু গড়গড় করে বাংলা বলা নয়, সুরেন্দ্র বাংলা পড়তে এবং লিখতেও পারে।

সুরেন্দ্র সিংএর সব কথা অমলেন্দুর কানে ঢুকছিল না। সে ভাবছিল, আপাতত ঘণ্টা তিনেকের জন্যে শান্তি। পরের স্টেশন ডেহরিঅনসোনে যখন ট্রেন পৌঁছোবে, তখন দিন প্রায় শেষ, সন্ধ্যে শুরু হবে। তাড়াতাড়ি রাত হয়ে গেলে মানুষজন বাড়ি ফিরে যাবে। রাতে বিপদ, ঝামেলার সম্ভাবনা তাই কম। নিজের সিট থেকে উঠে সুরেন্দ্র সিং বলল, মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসছি।

প্রায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা ছেলেটা কামরার শেষ মাথায় মেয়েদের খুপরির দিকে এগিয়ে গেল। অনেকটা পথ। দু-পাশের আসনে বসা যাত্রীদের অনেকে খর চোখে দেখছিল সুরেন্দ্রকে। কী এক অশুভ অনুভূতি অমলেন্দুর শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল, সে ভাবছিল, পাশের কামরা থেকে সুরেন্দ্রর বাবার বন্ধুদের কেউ এসে সুরেন্দ্রকে নিয়ে যেতে পারে! সুরেন্দ্রর পক্ষে সেটা ভাল হবে। গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে থাকা সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু সুরেন্দ্রর বাবার বন্ধুদের কেউ একজনও একবার খোঁজ করতে এল না কেন? হয়ত ডেহরিঅনসোনে খোঁজ করবে। তা না হলে কিউলে কেউ একজন নিশ্চয় আসবে। কিন্তু কিউলে খুব অল্প সময়ের জন্যে, মাত্র দু-তিন মিনিট ট্রেনটা দাঁড়ায়। পাশের কামরা থেকে সুরেন্দ্রর জাতভাইদের কেউ যদি কিউলেও না খোঁজখবর নেয়, তাহলে মোগলসরাই স্টেশনে অমলেন্দু নিজে সুরেন্দ্রকে পাশের কামরায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

এতোটা ভাবার পর অমলেন্দু সংযত করল নিজেকে। সে এমন উত্তলা হচ্ছে কেন? কী ঘটেছে? যে কোন সময়ে, স্বাভাবিক অবস্থাতেও একটা দুষ্টু ছেলে রাস্তা থেকে ট্রেনের কোন যাত্রীকে পাথর ছুঁড়ে মারতে পারে। এমন ঘটনা প্রায় হয়। তা নিয়ে এতো দুশ্চিন্তার কোন মানে হয় না। সে নিজেই ভয় পেয়েছে। ঝোলভাত খাওয়া বঙ্গসন্তানের এটাই স্বভাব, অল্পেই বিস্তর কিছু ভেবে নেয়। সুরেন্দ্র সিংএর ক্ষতি হবে, এমন একটা ধারণা করা খুব ভুল। নিজের সঙ্গে একটা ফয়সালা করে অমলেন্দু কিছুটা হাল্কা হল। পাশের একটা জানলা খুলে দিতে শেষ বিকেলের ফুরফুরে শীতল হাওয়া অমলেন্দুর মাথায়, মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ভারী আরাম লাগল তার। ঠিক তখনই পঁচিশ, ছাব্বিশ বছরের এক ডাগডাই যুবক, রাজস্থানী বা উত্তরপ্রদেশী জটলার একজন, হিন্দীতে অমলেন্দুকে প্রশ্ন করল, শিখ ছেলেটা কী আপনার চেনাজানা? আত্মীয়?

প্রশ্ন শুনে একটু থতমত খেয়ে গেলেও সহজ গলায় অমলেন্দু বলল, নাহ, ট্রেনে আলাপ।

ঠিক আছে।

একটি চলে যেতে, ভাব আসাযাওয়া, প্রশ্ন, কথা বলা, সবকিছু ভারী রহস্যময়, হেঁয়ালির মতো লাগল অমলেন্দুর। মাথামুণ্ডু কিছু সে বুঝতে পারল না। দু বিনুনি বাঁধা, টানাটানা চোখ, চোখা নাক, দুটো গাল লালচে, বছর দশেকের ফুটফুটে একটি মেয়েকে নিয়ে এসে সুরেন্দ্র বলল, আমার বোন, অঞ্জু।

লাজুক মেয়েটা অমলেন্দুর দিকে তাকাল না। দাদার একটা হাত আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। সুরেন্দ্র বাংলায় কথা বলছে শুনে বয়স্ক সেই বাঙালী ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, তোমার বোন নাকি?

হ্যাঁ, সুরেন্দ্র জবাব দিল।

ভদ্রলোকের পাশ থেকে ফ্রক পরা বছর দশেকের একটা মেয়ে সাগ্রহে দেখছিল অঞ্জুকে। শ্যামলা, ডাগর চোখ সেই মেয়েটার সঙ্গে অঞ্জুর চোখাচোখি হতে দুজনে একসঙ্গে ফিক করে এমন ভাবে হাসল, যে দেখে মনে হল, তাদের বহুদিনের আলাপ পরিচয়। শ্যামলা মেয়েটা নিজের জায়গা ছেড়ে অঞ্জুর পাশে এসে দাঁড়াল। দুজনে পরস্পরের হাত ধরল। অমলেন্দু দেখল, একঝলক হাসির সুবাদেই দুই বালিকায় বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, এটি আমার নাতনি, সায়ন্তনী। আমরা ডাকি সানী বলে। সানি ক্লাস ফোরে পড়ে।

অঞ্জু বলল, আমিও ক্লাস ফোরে…।

সানী হাত ধরে টানতে তার সঙ্গে অঞ্জু, অবলীলায় চলে গেল। আরও

পাঁচ, সাত মিনিট পরে অমলেন্দু দেখল, অঞ্জু, সানির সঙ্গে তাদেরই বয়সী আরও দুটো মেয়ে, দুজনেই অবাঙালী, চারজনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। বয়স্ক যাত্রীদের গুজগুজ আলোচনা, কথার কামাই নেই। গোষ্ঠীবদ্ধ জটলার বাইরে কেউ যেতে চাইছিল না। কথাও বলছিল মাতৃভাষায়। এই বিপজ্জনক মুহূর্তে নিজেদের গোষ্ঠী আর ভাষা যেন সবচেয়ে নিরাপদ, বিশ্বস্ত আশ্রয়। হয়ত ভাষা এবং গোষ্ঠীগত পরিচয় দিয়ে তারা নিজেদের নির্দোষ, নিরীহ প্রমাণ করতে চাইছিল। একটু আগে সুরেন্দ্র সিং সম্পর্কে যে যুবকটি প্রশ্ন করেছিল অমলেন্দুকে, সেই যুবক একজন স্থূলকায়া মহিলাকে, সম্ভবত যুবকটির মা, সঙ্গে নিয়ে অমলেন্দুর সিটের পাশে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ কামরার শেষ প্রান্তে মেয়েদের খুপরির দিকে আঙুল তুলে যুবকটি হিন্দিতে বলল, ওই তো গুড়িয়া, ওইখানে........।

অমলেন্দু দেখল, অঞ্জু আর সানির সঙ্গে যে দুটি মেয়ে কথা বলছিল, তারা মেয়েদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মা দাদার সঙ্গে নিজের জায়গায় ফেরার সময় গুড়িয়া তার নতুন তিন বন্ধুকে ধরে আনল। গুড়িয়াদের সিটের সামনে শুরু হল চারবন্ধুর গল্পের আসর। গুড়িয়ার দাদার পাশে একজন স্বাস্থ্যবতী, বিবাহিতা যুবতী, সম্ভবত তার স্ত্রী, দুজনে মন দিয়ে চারবন্ধুর গল্প শুনে মিটিমিটি হাসছে। সুরেন্দ্রর মা, মিসেস গেলট হঠাৎ সিটের পাশে এসে প্রশ্ন করলেন, অঞ্জু কোথায়?

সুরেন্দ্র আঙুল তুলে অঞ্জুকে দেখাতে মিসেস গেলটের মুখে হাসি ফুটল। একপলক অমলেন্দুকে দেখে মিসেস গেলট এগিয়ে গেলেন মেয়ের দিকে। সিট ছেড়ে গুটিগুটি সুরেন্দ্র গিয়ে দাঁড়াল মায়ের পেছনে। অমলেন্দু বুঝতে পারছিল যে, মিসেস গেলটকে পাশে বসিয়ে গুড়িয়ার মা আড্ডা জুড়তে চাইছেন। মিসেস গেলট বসলেও কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কেমন উসখুস করেছিলেন। এমন রূপবতী মহিলা অমলেন্দু জীবনে বেশি দেখেনি। বয়স, চল্লিশের কম, ঝক-ঝকে একহারা শরীর, দেখে মনে হয় ত্রিশ পেরোননি। হাসলে মিসেস গেলটের দু-গালে গভীর টোল পড়ছে। কিন্তু কি এক উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা মুখের হাসিকে ছায়ার মতো জড়িয়ে আছে। মিনিট পাঁচ সাত পরে অঞ্জুকে নিয়ে মিসেস গেলট চলে যেতে সুরেন্দ্র এসে নিজের জায়গায় বসে বলল, ওমপ্রকাশ, গুড়িয়ার দাদা, পাশের কামরায় বাবার বন্ধুদের কাছে আমাকে পৌঁছে দিতে চাইছিল, আমি রাজি হলাম না। কেন যাব? এখানেই তো বেশ ভাল······।

অমলেন্দু কোন সাড়া করল না। দিন শেষ হয়ে আসছিল। চোখের সামনে ধীরে ধীরে ধূসর হয়ে উঠছিল পৃথবী। চলন্ত ট্রেনের কামরায় বসে দিনের শেষ আর রাতের শুরু খুব পরিষ্কার দেখা যায়। আলো অন্ধকারের

এই শব্দহীন, বিচিত্র যাওয়া আসার খেলার দিকে অমলেন্দু তাকিয়ে থাকল। পরতে পরতে খুলে যাচ্ছে দিগন্ত জোড়া একটা কালো গোলাপের পাপড়ি, ঢেকে দিচ্ছে গ্রাম, মাঠ, গাছপালা, দৃশ্যমান পৃথিবী। সারাদিনের ক্লান্তি শরীরে মেখে ঢিমে তালে করুণ ভঙ্গিতে উড়ে যাচ্ছে একদল বক। ট্রেনের তলায় লাইনের সংখ্যা বাড়ছে, ক্রমাগত লাইন বদলে ছুটে চলেছে চাকাগুলো, সামনে ডেহরিঅনসোন। আগের দুটো স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম পড়েছিল অমলেন্দুর জানলার পাশে। ডেহরি অন সোনে সেটা হবে না, লাইনের দিকেই থাকবে অমলেন্দু আর সুরেন্দ্রর সিট। সামনের সবগুলো স্টেশনে যদি একই জিনিস হয়, তাহলে ইট বা পাথর খাওয়ার আশঙ্কা নেই। সুরেন্দ্র যে পাশের কামরায় তার বাবার বন্ধুদের কাছে যাবে না, অমলেন্দু এটা জেনে গেছে। ডেহরিঅনসোনে পনের মিনিট, বেশ লম্বা সময় গাড়িটা দাঁড়াবে। তারপর কিউল ছুঁয়ে মোগলসরাই স্টেশনে যখন ট্রেন পৌছোবে, তখন নিশ্চয় স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম খালি হয়ে যাবে, যাত্রীরা ছাড়া বাইরের লোকজন থাকবে না। রাত নটায়, বেনারসে পৌছোনোর কথা থাকলেও সেখানে দশটার আগে ট্রেন ঢুকবে না। ফলে বেনারসেও কোন বিপদ নেই। রাত ফুরোলেই আবার নতুন দিন, গতদিনের ক্লান্তি, ক্ষোভ, শোক, বিচ্ছেদ, রাগ, হতাশা মানুষ ভুলে যাবে। বরকাখানা থেকে অমলেন্দুর মনে যে অশান্তি, ভয় উদ্বেগ মেঘের মতো জমে উঠছিল, ধীরে ধীরে তা যেন কেটে যাচ্ছে। মানুষের ওপর আস্থা, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা ফিরে আসছে। আত্মবিশ্বাসে ভরে উঠছে মন। বছর দশেকের চারটে মেয়ে, গোটা দেশের বিবেক আর শুভবুদ্ধির প্রতিনিধি হয়ে চারটে রঙিন প্রজাপতির মতো কামরার মধ্যে ঘুরছে। বোধহয় ওই চার নাবালিকাই চিন্তামুক্ত, নির্ভার করে তুলছিল অমলেন্দুকে। ওদের দেখে বড়ো মেয়ে তানিয়ার কথা, সে পড়ে ক্লাস ফাইভে, অমলেন্দুর মনে পড়ল। বড়ো মেয়ের মুখটা মাথায় আসতেই ছেলে গোগোল, স্ত্রী বাসবী, অসুস্থ বুড়ি মা আর গোটা সংসারটাই ঢুকে পড়ল অমলেন্দুর মাথার মধ্যে। রোজ সকালে তিন বছরের গোগোলকে সঙ্গে নিয়ে তানিয়াকে স্কুল বাসে তুলতে যায় অমলেন্দু। দিদি বাসে উঠে চোখের আড়ালে চলে গেলে গোগোল স্কুলে যাওয়ার বায়না ধরে। নানা গল্পে ছেলেকে ভুলিয়ে দুধের ডিপো থেকে দুধ নিয়ে বাড়ি ফিরে কারখানায় যাবার জন্যে অমলেন্দু তৈরি হয়। একটা দিন সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ বাসবীকে করতে হবে। অমলেন্দুর সবচেয়ে বেশী দুশ্চিন্তা মাকে নিয়ে। গত তিন বছরে মায়ের দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। সত্তর বছরের সেই বৃদ্ধা অন্তিম মারটির জন্যে এখন অপেক্ষা করছেন। অমলেন্দুর অনুপস্থিতিতে সেরকম কিছু হলে বাসবী একা সামলাবে কী করে? তার ওপর অসুস্থতার দরুন রাতে মায়ের ভাল ঘুম হয় না। ঘুম না হওয়া মানেই দুশ্চিন্তা করা।

অমলেন্দুর জন্যে দুশ্চিন্তায় মা যে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নানা দুর্ভাবনায় অমলেন্দুর মাথাটা ভারী হয়ে উঠলে বাড়ির কথা সে ভুলতে চাইল। ঘরে, বাইরে সবজায়গাতেই সঙ্কট, সমস্যা, এগুলো কী বানান অথবা সত্য, ভাবতে গিয়ে 'বিভ্রান্ত হল অমলেন্দু।

ট্রানজিসটারের খবর শুনে উত্তরপ্রদেশীদের জটল থেকে কে যেন ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, প্রধানমন্ত্রীকো ডেথ্ হো গিয়া।

নিমেষে কামরায় সবগুলো ট্রানজিস্টার চালু হয়ে যেতে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ সেগুলোকে ঘিরে দাঁড়াল। প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর খবর দিয়ে সংবাদদাতা বলল, দুই শিখ আততায়ীর একজন ঘটনাস্থলেই অন্য একদল রক্ষীর গুলিতে নিহত হয়েছে, দ্বিতীয়জনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। দিল্লিতে লেগে গেছে খুনোখুনি, দাঙ্গা। নয়াদিল্লিতে একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারী করে পুলিস নামান হয়েছে।

সারা কামরা শব্দহীন, নিস্পন্দ, এমন ভাবে তারা খবর শুনছে যেন একটা শব্দও বাদ না যায়। সিটে বসেই খবরের টুকরো অংশ শুনতে পাচ্ছিল অমলেন্দু। সকাল দশটায় আহত হওয়ার সময়ে বা কিছু পরে যে প্রধানমন্ত্রী মারা গেছেন, বি বি সির খবর শুনে অমলেন্দু এটা ধরতে পেরেছিল। সরকারি নানা কারণে মৃত্যুর খবরটা প্রচারমাধ্যম দেরিতে জানাল। কিন্তু খবরের একটা অংশ বারবার শুনে অমলেন্দু খুব অস্বস্তি বোধ করেছিল। রেডিওতে আততায়ীদের ধর্মীয় পরিচয় জানান হচ্ছে কেন? যারা খুন করেছে, তারা শিখ, হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীস্টান, এটা জানান কি খুব দরকারী, খুনী বা অপরাধীর কোন জাত আছে নাকি? গান্ধীজীকে যে খুন করেছিল, সে ছিল হিন্দু। সরকারি প্রচারমাধ্যমে গান্ধীজীর আততায়ীকে কি বারবার হিন্দু বলে প্রচার করা হয়েছিল? যীশুখ্রীস্টের হত্যাকারীদের ধর্ম কি খ্রীস্টানরা মনে রেখেছে?

কামরার মধ্যে যে সহজ, হাল্কা পরিবেশ গড়ে উঠছিল, খবর শেষ হওয়ার আগেই তা মুছে গেল। গম্ভীর, কঠিন হয়ে উঠল অনেকের মুখ। নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা দশ মিনিট পরে গাড়ি ঢুকল ডেহরিঅনসোনে। অন্ধকারে ডুবে থাকা জনমানবহীন স্টেশনের ঠিক বাইরে থেকে ভেসে আসছে অনেক মানুষের কোলাহল, গুলির শব্দ। এবারেও লাইনের দিকে অমলেন্দুর সিট। সন্তর্পনে জানলা খুলে মুখ বাড়িয়ে সমানে দৃষ্টি মেলে অমলেন্দু দেখল, সিগন্যালের লাল আলো, অন্ধকারে স্থির জ্বলছে। ট্রেনের সামনে পেছনে, সবগুলো সিগন্যালেই লাল আলো, হলুদ বা সবুজ সংকেতের কোন চিহ্ন নেই।

স্টেশন মাস্টারের অফিসের লোকজন সব গেল কোথায়? সিগন্যালিং এর কর্মীরাই বা কী করছে? বাইরের নির্জন অন্ধকারের ওপর চোখ রেখে অমলেন্দু টের পেল, সব কিছু খুব এলোমেলো, অস্বাভাবিক, রেডিওর খবরের চেয়ে অবস্থা আরও খারাপ। বরকাখানায় কিছু রেল পুলিসকে অমলেন্দু দেখেছিল, এখানে কেউ নেই, থাকলে স্টেশনের আলোগুলো অন্তত জ্বলত। দক্ষিণ ভারতীয় এক ভদ্রলোক ইংরিজীতে অমলেন্দুকে বললেন, শুধু শুধু ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে দরজাগুলো ভেতর থেকে লক করে দেওয়া ভাল। ভদ্রলোকের কথায় সায় দিয়ে অমলেন্দু উঠে দাঁড়াল। সেই বিকেল থেকে কণ্ডাক্টরের দেখা নেই। দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক, আর গুড়িয়ার দাদা ওমপ্রকাশকে নিয়ে সবগুলো বন্ধ দরজা ভেতর থেকে অমলেন্দু লক করে দিল। সেই পৌঢ় বাঙালীও হাত লাগালেন।

বিকেল থেকে এক কাপ চায়ের জন্যে অমলেন্দুর গলা শুকিয়ে আছে। ভেবেছিল, দেওঘরি আসানসোলে কিছু খাবার আর এক কাপ চা খাবে। কিন্তু কোথায় কী? মোগলসরাইএ রাতের খাবার পাওয়া যাবে কিনা সে নিয়েও সন্দেহ জাগল অমলেন্দুর। চুপচাপ ঝিম মেরে বসে থাকা সুরেন্দ্রকে দেখে অমলেন্দুর মনে হলো, ছেলেটা ভয় পেয়েছে। বন্ধ জানালার ঠিক তলা দিয়ে অন্ধকার রেললাইন ধরে একদল মানুষ এমন হইহই করে ছুটে গেল যে কামরা-ভর্তি লোক আতঙ্কে চমকে উঠল। লাইন দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় লোকগুলো কিছু বলছিল। অমলেন্দু কথাগুলো বুঝতে পারল না। হাতছানি দিয়ে অমলেন্দুকে ডেকে চাপা গলায় ওমপ্রকাশ প্রশ্ন করল, লোকগুলোর কথা শুনলেন?

বুঝতে পারলাম না, অমলেন্দু বলল।

খুন করার জন্যে ট্রেনের কামরায় কামরায় ওরা সর্দারজীদের খুঁজছে। পেছনের কোন একটা কামরায় কয়েকজন শিখ আছে জেনে ওরা সেদিকে গেল।

ওমপ্রকাশের কথাগুলো শুনে ধড়ফড় করে উঠল অমলেন্দুর হৃৎপিণ্ড। ওমপ্রকাশ বলল, অঞ্জুর দাদাকে ওর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিন।

লাভ কী, জানতে চাইল অমলেন্দু।

হয়ত মেয়েদের ঘরের দিকে ওরা নাও যেতে পারে।

যারা খুন করার জন্যে আসে, তারা লুঠও করে, মেয়েদেরও রেহাই দেয় না।

অমলেন্দুর কথা শুনে ফ্যাকাসে মুখে ওমপ্রকাশ তার যুবতী স্ত্রীর দিকে একবার তাকাল।

অনেকগুলো লোহার শাবল নিয়ে পেছনের একটা কামরার ওপর খুনীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বন্ধ দরজায় লোহার শাবল পড়ার কর্কশ শব্দে নিঃস্তব্ধ প্ল্যাটফর্ম আর গোটা গাড়ি থরথর করে কাঁপছে। ভয় পাওয়া মানুষের চীৎকার, কান্না, গোঙানি ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিটা কামরায়। অমলেন্দু দেখল, সহযাত্রীরা সকলে নির্বাক, চুপ, যেন পাথরের মূর্তি, শ্বাস বন্ধ করে বসে আছে। একটু আগে যারা বাথরুমে ঢুকেছিল, বেরোচ্ছে না। হঠাৎ হুইসিল বাজিয়ে আড়মোড়া ভেঙে ট্রেনটা চলতে শুরু করল। পেছনের সেই কামরায় তখনও চীৎকার, কান্না থামেনি। কামরার কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা অমলেন্দু জানতে পারল না। লম্বা একটা লোহার ব্রিজ ঝমঝম করে পেরিয়ে নীরন্ধ্র অন্ধকারের টানেলের মধ্যে ট্রেনটা ঢুকে পড়ল। অমলেন্দুর সি.টর কোনাকুনি একটা বন্ধ বাথরুমের দরজা খুলে তিন-জনের একটা গোটা পরিবার বলির পশুর মতো কাঁপতে কাঁপতে নিজেদের জায়গায় গিয়ে বসল।

ট্রেন এখন পুরোদমে ছুটছে। কামরার সব দরজা জানলা বন্ধ করে গোটা চারেক নীল আলো জেলে রেখে বাকিগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাপা গলার ফিসফিস কথা আর খুব নিচু লয়ে ট্রানজিসটারের শব্দ ছাড়া কামরার মধ্যে আর কোন আওয়াজ নেই। বাচ্চাদের তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়িয়ে মায়েরা শুইয়ে দিতে চাইছে। জেগে থাকার চেয়ে এখন ঘুমিয়ে পড়াই যেন নিরাপদ।

বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ কখনও এক ঝলক আলো কামরার মধ্যে ঢুকে চকিতে মিলিয়ে গেলে বোঝা যাচ্ছে যে, একটা ছোট স্টেশন পার হল। মানুষের গলা, কুকুরের ডাকও অমলেন্দু শুনতে পাচ্ছিল মাঝে মাঝে। রাত আটটা নাগাদ কিউল স্টেশনে ট্রেন ঢুকতে জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দেখে খুব অবাক হল অমলেন্দু। আলোয় ঝলমল স্টেশনে কর্মব্যস্ততা। লোকজন কম থাকলেও স্টেশনের চেহারা খুব সহজ, স্বাভাবিক। গরম চা হেঁকে একজন চাওলাকে কামরার পাশ দিয়ে যেতে শুনে বন্ধ জানলাটা অমলেন্দু সামান্য খুলতেই কামরার লোকেরা হাহা করে উঠল। এক মুহূর্তে অমলেন্দু দেখল, ট্রেনের সবগুলো কামরার প্রতিটা দরজা, জানলা বন্ধ দেখে চাওলা ভারী অবাক হয়েছে। দুমিনিট দাঁড়িয়ে ট্রেন চলতে শুরু করল। পাটনা পর্যন্ত একঘণ্টার রাস্তা, যাত্রীরা শব্দহীন বসে থাকল। পাটনায় ট্রেন দাঁড়াল না। গতি কমিয়ে স্টেশন ছেড়ে অন্ধকারের মধ্যে গাড়িটা আসতেই প্রায় প্রতিটা কামরার ওপর শুরু হলো ইট-পাথরের এলোপাথাড়ি বৃষ্টি। অমলেন্দুর মনে হল, কয়েকশ লোক অন্ধকারে গা ঢেকে ট্রেনটা ঘিরে ধরেছে। সমস্ত দরজা জানলা ইট পাথরের ঘায়ে এখনই গুঁড়িয়ে যাবে। ট্রেনটার গতি হঠাৎ এমন কমে এল যে, ভয় হল, অন্ধকার মাঠের মধ্যে সেটা দাঁড়িয়ে পড়বে। ইঞ্জিনড্রাইভার আহত হল নাকি? ধীরগতি ট্রেনের কাটা জানলার খাঁজ দিয়ে অমলেন্দু

দেখল, শহরের একপাশের আকাশের মেটে লাল রঙ, বড কিছু একটা পোড়ার জন্যেই এরকম লেলিহান শিখা আকাশকে জড়িয়ে ধরেছে। সবকটা কামরা নিঃশব্দ, নিথর, এক পেট শবদেহ গিলে অজগর সাপের মতো লম্বা গাড়িটা ফোঁসফোঁস করে এগিয়ে চলেছে। ইট, পাথরের বৃষ্টির জন্যে ট্রেনটা না থামলেও কিউল স্টেশনে অমলেন্দুর মনে যে সামান্য শান্তি আর নিরাপত্তা ফিরে এসেছিল, তা আবার মুছে গেল। ভয় আর উত্তেজনার একটা সীমা আছে বলেই বোধহয় রাত দশটায় মোগলসরাই স্টেশনে যখন ট্রেনটা ঢুকল, অমলেন্দু দেখল, ভয়ে উদ্বেগে কাহিল যাত্রীদের অনেক ঘুমিয়ে পড়েছে। নাক ডাকছে কেউ কেউ।

ক্ষিধেতে চোঁচো করছিল অমলেন্দুর পেট। ক্ষিধের জ্বালাতে জানলাটা একটু তুলে অমলেন্দু দেখল, প্ল্যাটফর্মে থিকথিক করছে রেলপুলিস। তার মানে আগের কোন একটা গাড়িতে গণ্ডগোল হয়েছে। পুলিস দেখে সাহস পেয়ে অমলেন্দু জানলার আধখানা খুলতে তার পেছনের ভদ্রলোকও সিকিভাগ জানলা খুলল। প্ল্যাটফর্মে, স্টেশনমাস্টারের অফিসে সব আলো জ্বলছে। স্টেশনমাস্টারের ঘরের সামনে তুতিনজন সাধারণ পোশাকের লোক, সম্ভবত রেলকর্মী, নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। সাদা চোখে স্টেশনে কোন গোলমাল না দেখে অমলেন্দুর আশা হল, রাতের খাবারটা নিশ্চয় এখানে পাওয়া যাবে। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের ওপর মিনিট চার, পাঁচ চোখ রেখে বসে থাকার পরেও সাদা উর্দিপরা রেলক্যান্টিনের কোন কর্মীকে অমলেন্দু দেখল না। কালো কোট পরা সেই কণ্ডাক্টর হঠাৎ আকাশ ফুঁড়ে পাশে এসে দাঁড়াতে অমলেন্দু প্রশ্ন করল, এখানে রাতের খাবার দেওয়ার কথা, পাওয়া যাবে কি?

ভাবলেশহীন চোখে অমলেন্দুর দিকে তাকিয়ে গার্ড বলল, আমার ডিউটি এখানে শেষ, আমি নেমে যাচ্ছি, নতুন যে আসবে, সব খবর সে দেবে।

দ্বিতীয় কোন কথা না বলে চামড়ার ব্যাগটা হাতে নিয়ে কণ্ডাক্টর ট্রেন থেকে নেমে গেল। অবস্থা দেখে অমলেন্দু বুঝে গেল যে এখানেও খাবার দাবার মিলবে না। ক্ষিধে আর ক্লান্তিতে তার মাথার ভেতরটা ভনভন করছিল। নতুন কণ্ডাক্টর কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করার তুমিনিট পরে ট্রেনটা ছাড়ল। সিটের পেছনে ঠেস দিয়ে তুচোখ বুজে বসে থাকা সুরেন্দ্রকে দেখে অমলেন্দুর মনে হল, বেচারীর ঘুম পেয়েছে। ট্রেনের এদিকটায় ওপর নিচে তুটা বাঙ্ক। ওপরেরটা অমলেন্দুর, নিচেরটা সুরেন্দ্রর। অমলেন্দু না শুলে সুরেন্দ্রকেও বসে থাকতে হবে।

তুমি শুয়ে পড়, আমি ওপরে যাচ্ছি, অমলেন্দু বলল সুরেন্দ্রকে।

আমার ঘুম পায় নি, সুরেন্দ্র বলল, তাছাড়া আমার খাওয়া হয় নি।

কী খাবে, অমলেন্দু জানতে চাইল।

বাড়ি থেকে মা খাবার বানিয়ে এনেছে।

অমলেন্দু আর কোন প্রশ্ন করল না। খিদে, ক্লান্তিতে তার শরীর এমন আনচান করছে যে, সে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে চাইছিল। অঞ্জু এসে সুরেন্দ্রকে ডেকে নিয়ে যেতে অমলেন্দু বুঝল, ওরা এখন খাবে। বালিশ আর একটা চাদর নিয়ে বাঙ্কের ওপর ওঠার তোড়জোড় করার সময়ে অমলেন্দুর খেয়াল হল যে, তাকেও টিফিনক্যারিয়ারে করে বাসবী খাবার দিতে চেয়েছিল। অমলেন্দু নেয়নি। বাজার থেকে চিপ, বিস্কুট আর চানাচুর কিনে একটা ঠোঙায় ভরে অমলেন্দুর জন্যে রেখে দিয়েছিল বাসবী। ইচ্ছে করে ঠোঙাটা বাড়িতে ফেলে এসেছে অমলেন্দু। বাজারে, স্টেশনে যখন সব কিছু পাওয়া যায়, তখন এসব বাড়তি বোঝা বহনের কোন মানে হয় না, এই ছিল অমলেন্দুর যুক্তি। দরজা, জানলা বন্ধ, গুমোট কামরার মধ্যে বসে অমলেন্দু বুঝল, সে গবেট, মূর্খ, জীবন সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা খুবই কম।

কাচের একটা প্লেট হাতে মিসেস গেলটকে আসতে দেখে অবাক অমলেন্দু ভাবল, এতো রাতে মহিলা চললেন কোথায়? অমলেন্দুর সিটের সামনে এসে, তার দিকে প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে সলজ্জ, স্মিত মুখে মিসেস গেলট বললেন, খেয়ে নিন।

খিদেতে খুব কাতর হলেও লজ্জায়, সংকোচে ঘেমে উঠে অমলেন্দু বলল, না না, কোন দরকার নেই। বেনারস স্টেশনে নিশ্চয় খাবার দেবে। অর্ডার দেওয়া আছে।

পাবেন না, শান্ত গলায় ভদ্রমহিলা বললেন, তাছাড়া বেনারসে গাড়ি কখন পৌঁছোবে কে জানে!

সসংকোচে প্লেটটা হাতে নিয়ে মিসেস গেলটের মুখের দিকে কৃতজ্ঞ চোখে অমলেন্দু তাকিয়ে থাকল। ফুলকাটা কাচের প্লেটে পরিপাটি করে সাজান গোটা দশেক পুরি, আলু কড়াইশুঁটির তরকারি আর কাঁচা লঙ্কার আচার। আচারে ভুরভুর করছে তেল, ঝালের গন্ধ! হাল্কা নীল আলোয় মিসেস গেলটকে দেবীপ্রতিমার মত দেখাচ্ছিল। অমলেন্দুর দিকে তাকিয়ে মহিলা সস্নেহে হাসলে অমলেন্দু বলল, সত্যি আমার খুব খিদে পেয়েছিল।

সুরেন্দ্রর হাতে জল পাঠিয়ে দিচ্ছি, মিসেস গেলট কথাটা বলতে, অমলেন্দু জানাল, জলের দরকার নেই, তার সঙ্গে ওয়াটার বটল্ আছে।

অন্ধকার পৃথিবীর ওপর দিয়ে দ্রুতগামী মেলট্রেন হুহু করে ছুটে চলেছে। খুব তৃপ্তির সঙ্গে পুরি, তরকারি আর আচার খেয়ে অমলেন্দু শরীরে

মনে যথেষ্ট জোর পেল। কাচের প্লেটটা ধুয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে অমলেন্দুর মনে হল, বেশ ঝরঝরে, সুস্থ, সাহসী হয়ে উঠছে তার দেহ আর মেজাজ। এতো আতঙ্ক, উদ্বেগ আর ভয়ের কোন বাস্তব কারণ নেই।

বিদায়ী কণ্ডাক্টরের ওপর চটে গিয়ে নতুন কণ্ডাক্টরের সঙ্গে প্রথমে অমলেন্দু কথা বলল না। তারপর কীভাবে যেন কথা শুরু হতে অমলেন্দু দেখল, মানুষটি সাদাসিধে, ভাল লোক। নাম রামশরণ ত্রিবেদী, কানপুরে বাড়ি। মোগলসরাই স্টেশন থেকে কামরায় উঠে ফ্যাকাসে, বিবর্ণ মুখে ত্রিবেদী নিজের জায়গায় বসেছিল। খাওয়া সেরে ত্রিবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে অমলেন্দু প্রশ্ন করল, আপনি অসুস্থ নাকি?

ত্রিবেদীর মুখ আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল, বলল, ঠিক অসুস্থ নয়, সারাদিন মোগলসরাই স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে বাস করে আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেছে।

কেন, জানতে চাইল অমলেন্দু।

অমলেন্দুকে একপলক দেখে চাপা গলায় ত্রিবেদী বলল, পাটনা, মোকামা, মোগলসরাইতে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা শুরু হয়েছে। কয়েকডজন শিখ বিকেলের আগেই খুন হয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি, দোকান, গদী যারা লুঠ করেছে, তাদের বেশীরভাগ স্থানীয় ব্যবসাদারদের পোষা গুণ্ডা।

অমলেন্দুর গায়ের কাছে আরও একটু সরে এসে প্রায় ফিসফিস করে ত্রিবেদী বলল, দিল্লিতে তো কচুকাটা শুরু হয়েছে। এখানেও তাই। রিটায়ারিং রুমের দোতলার জানলা ফাঁক করে সারাদুপুর যা দেখলাম, মনে হল, চিড়িয়াখানার বন্ধ খাঁচা খুলে উপোসী, ক্ষুধার্ত, হিংস্র যত পশু ছিল, তাদের সবগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের বিবেক নেই, মানবিকতা, স্নেহ, মমতা নেই, নরখাদক বাঘের মত তারা নিষ্ঠুর, রক্তপিপাসু। আমার চোখের সামনে ঝুঁটি বাঁধা একটা দশ বছরের শিশুকে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে স্কুল থেকে সে ফিরছিল... ...কথাটা শেষ করতে না পেরে ত্রিবেদী দু'হাতে মুখ ঢাকল। দুতিন মিনিট পরে বলল, আমার ছোট ছেলের বয়সও দশ।

কষ্টে, ভয়ে অস্থির হয়ে স্টেশনমাস্টারের ঘরে গিয়ে বসেও রেহাই পেলাম না, ত্রিবেদী আবার বলতে লাগল, টেলিফোনে নানা স্টেশন থেকে এমন সব খবর আসছিল যে, আমার মনে হয়েছিল গোটা দেশটাই জঙ্গল, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নেতা, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আমার মত রেল কর্মচারীরা সকলেই পশু, কিংবা আরও খারাপ, মাফিয়া, খুনে, গুণ্ডা।

অমলেন্দু চুপ।

নিজের মনে আরও কিছুক্ষণ বকে ত্রিবেদী যেন কেমন নেতিয়ে পড়ল।

অমলেন্দু দেখল সিটে বসেই সুরেন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত সুরেন্দ্রকে আরও অল্পবয়সী, নিরীহ দেখাচ্ছে। সুরেন্দ্র যে একা শোবে না, অমলেন্দুর সামনে বসে তাকে আঁকড়ে থাকবে, এমন একটা ধারণা অমলেন্দুর আগেই হয়েছিল। তাই নিজের সিটে ফিরে অমলেন্দু আর জাগাল না সুরেন্দ্রকে। ট্রেন বেনারসের কাছাকাছি ঘড়ি না দেখেও অমলেন্দু আন্দাজ করতে পারল। তন্দ্রায় ভারী হয়ে আছে দুচোখ, সিটের পেছনে ঠেস দিয়ে অমলেন্দু ঢুলতে শুরু করল। হঠাৎ এক প্রবল ঝাঁকুনি, মনে হল, এক দারুণ দুর্ঘটনায় ট্রেনের কামরাগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। নিজের সিট থেকে অমলেন্দু ছিটকে পড়ল। অমলেন্দু চিৎ হয়ে পড়েছিল। কামরার মেঝে থেকে উঠতে গিয়ে সে দেখল, তার ঠিক কোলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্রকে ধরে তুলতে সে হঠাৎ অমলেন্দুর কাঁধের ওপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ট্রেনের প্রতি কামরাতেই হইচই, কান্না, অসহায়, ভয়ার্ত, মানুষের বেদনায় শিউরে উঠছে পৃথিবী। কী এক গভীর মমতায় সুরেন্দ্রকে ধরে দাঁড় করিয়ে অমলেন্দু বলল, ভয় নেই, কোন ভয় নেই।

কামরার মধ্যে আবছা নীল আলো, বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ট্রেনের পেছনের দিকের কামরায় মানুষের গোঙানি, আর্তনাদ তীব্রতর হচ্ছে। সেখানে কয়েকটা কামরার, আগেই আধখানা ভাঙা দরজা, এখন পুরো ভেঙে কিছু মানুষকে বাছাই করে কারা যেন অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ত্রিবেদী বারবার বলল, আমি যাই, দেখি কি হচ্ছে। আর সহ্য হচ্ছে না আমার।

বিকারের রুগীর মত কামরা থেকে বেরোবার জন্যে সে ছটপট করতে লাগল। কামরার যাত্রীরা কেউ দরজা খুলতে দিল না ত্রিবেদীকে। ত্রিবেদী বলল, বেনারস এখান থেকে মাইল চার পাঁচ। লাইনের ফিশপ্লেট খুলে খুনেরা গাড়িটা আগেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

পৃথিবীতে প্রায় মধ্যরাত। একদল মানুষের কদর্য হল্লা আর অসহায় যাত্রীদের কান্না, কাতরতায় মধ্যরাতের নীরবতা ভেঙে গেছে। হঠাৎ অন্ধকারে কে যেন চড়া গলায় হুকুম দিল, ফায়ার!

তখনই অনেকগুলো রাইফেলের আওয়াজ, দুপদাপ দৌড়ের শব্দ, সন্ত্রস্ত পৃথিবী যেন খানিকটা ঝিমিয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত রেল পুলিস নেমেছে, ত্রিবেদী বিড়বিড় করল।

ফিশপ্লেট সারিয়ে বেনারস স্টেশনে ট্রেন ঢুকল রাত তিনটের পর। সকাল হতে আর খুব দেরি নেই, স্টেশনে অনেক পুলিস, আলো। মাইকে ঘোষণা হল, সকালের আগে কোন ট্রেন ছাড়বে না।

সারারাত অমলেন্দু প্রায় জেগে কাটাল। স্টেশনের অফিস থেকে কিছু সময়ের জন্যে ঘুরে এসে অমলেন্দুকে একান্তে পেয়ে ত্রিবেদী বলল, ফিশপ্লেট সরিয়ে যারা ট্রেন আটকে ছিল, তিনটে কামরা থেকে সতেরজন শিখকে তারা তুলে নিয়ে গেছে। তিনজনের মৃতদেহ লাইনের কাছেই ঝোপের মধ্যে পাওয়া গেছে, বাকি চোদ্দজনের হদিশ নেই।

অমলেন্দুর কান মাথা আবার অসাড় হয়ে আসছিল। ত্রিবেদীর কাছ থেকে নতুন কোন খবর তার শুনতে ইচ্ছে করছিল না। ভোরের দিকে, সূর্য তখনও ওঠেনি, হাল্কা সবুজ আলো জাগছে আকাশে, কামরার প্রায় সকলেই ঘুমোচ্ছে, মিসেস গেলট হঠাৎ অমলেন্দুর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

চোখ বুজে থাকার জন্যে অমলেন্দু প্রথমে খেয়াল করে নি। হঠাৎ চোখ খুলে সামনে মিসেস গেলটকে দেখে তার মনে হলো, স্বপ্ন দেখছে।

মিসেস গেলট বললেন, ভাইয়া, আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম।

ভাইয়া ডাক শুনেই সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অমলেন্দু বলল, আপনার ছেলেকে বাঁচাবার সব দায়িত্ব আমার।

অমলেন্দুর কথা শুনে তরল, সজল হয়ে উঠছিল মিসেস গেলটের চোখ। হঠাৎ এত বড় একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে অমলেন্দুও যেন বেশ ভয় পেল। নিজের কথাটা সামান্য শুধরে নিয়ে সে বলল, এই কামরায় অনেক বিবেকবান, ভাল লোক আছেন, সকলেই সুরেন্দ্রকে দেখবেন।

এক পলক ছেলের দিকে তাকিয়ে দু চোখের উদগত কান্না লুকোবার জন্যেই যেন মিসেস গেলট তাড়াতাড়ি মেয়েদের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

সুরেন্দ্রকে বাঁচাবার কথা ভাবতেই তানিয়া আর গোগোলের মুখ, বাসবী আর রুগ্ন মায়ের কথা মনে পড়ল অমলেন্দুর। কেমন অবশ, বিকল হয়ে গেল তার শরীর, মন। কীভাবে যে সুরেন্দ্রকে বাঁচাবে, ভেবে কূল পেল না অমলেন্দু।

সকাল ছ'টায় বেনারস ছেড়ে ট্রেনটা তিন ঘণ্টায় এলাহাবাদে এলেও সেখান থেকে কানপুর স্টেশনে পৌঁছোতে সময় নিল, প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। কানপুর স্টেশন থেকে দুপুর দুটোর সময় যখন ট্রেন ছাড়ল, তখন ট্রেনের বাথরুমে, বেসিনে এক ফোঁটা জল নেই। যাত্রীদের খাদ্য আর জলের ব্যক্তিগত ভাঁড়ার অনেক আগে নিঃশেষ হয়ে গেলেও সাহস করে কামরা থেকে এলাহাবাদ বা কানপুর স্টেশনে নেমে দু'চারজন ছাড়া, বেশিরভাগই জল নেয় নি। শেষ দুপুরের বন্ধ কামরায় ভ্যাপসা গরমে খিদে, তেষ্টায় বাচ্চারা চিলের মত চেঁচাচ্ছে। টুনডলা পেরিয়ে আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়াতে

দুঃসাহসে ভর করে অমলেন্দু কামরা থেকে নেমে অনেকের জলের জায়গা ভরে দিল। বাচ্চাগুলো একটু জল খেয়ে বাঁচুক। অমলেন্দুকে নামতে দেখে ওমপ্রকাশও আগ্রা স্টেশনে নেমে নিজেদের এবং অন্য আরও দু'চারজনের ফ্লাস্ক, কুঁজো, ওয়াটারবটলে জল ভরে দিল। সকলেই ভেবেছিল, রাত এগারটার মধ্যে নিউ দিল্লি স্টেশনে ট্রেনটা পৌঁছে যাবে। কিন্তু কানপুর স্টেশন থেকে টিকটিক করে লোকাল ট্রেনের মত প্রায় সব স্টেশনে থামতে থামতে ট্রেনটা গাজিয়াবাদ স্টেশনের আউটার সিগন্যালে ঢুকলো রাত দুটোর একটু আগে। গাজিয়াবাদ স্টেশন তখন ফাঁকা, মরুভূমির মত ধুধু করছে, স্টেশনের চারপাশ আগুনে লাল, জলছে। নিউদিল্লি স্টেশনে ঢোকার জায়গা না পেয়ে আশপাশের সবগুলো লাইনে যাত্রীবাহী অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশনের বাইরে যেখানে গাড়ি দাঁড়াল, সে জায়গাটা প্ল্যাটফর্ম থেকে এতো দূরে যে, প্ল্যাটফর্মের আলোগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। পাশের লাইনের একটা গাড়িতে হঠাৎ এক মহিলা ডুকরে কেঁদে উঠল। তারপর শুরু হল নানা বয়সী মানুষের হাহাকার আর আর্তনাদ। অমলেন্দুদের কামরায় বন্ধ দরজায় কেউ লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ঘা মারল। প্রথমে একটা, তারপর অনেকগুলো। কাল রাত থেকেই সুরেন্দ্রকে পাশের কোনো কামরায় হঠিয়ে দেওয়ার জন্যে কিছু যাত্রী ঘোঁট পাকাচ্ছিল। চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে তারা ফিসফাস আলোচনা করছিল। একজন, দু'জন করে তাদের শলাপরামর্শে ক্রমশঃ লোক বাড়ছিল। ত্রিবেদীর মুখে যাত্রীরা যখন শুনল যে, ঘাতকদের হাতে শিখদের তুলে দিয়েও বাকীরা রেহাই পাইনি, বাছবিচার না করে সমস্ত যাত্রীর মালপত্র লুঠতরাজ হয়েছে, পরামর্শকারীরা তখন একটু দমে গিয়েছিল। কিন্তু কামরা থেকে সুরেন্দ্রকে ভাগানোর মতলবটা তাদের মাথা থেকে যায়নি।

কামরার দরজায় লোহার ডাণ্ডা পড়ার শব্দে সেই লোকগুলো এখন ফুঁসে উঠল। বন্ধ দরজা সজোর আঘাতে থরথর করে কাঁপছে। কামরার মধ্যে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, সর্দারকো নিকাল দো ইঁহাসে...।

হৈ হৈ করে বেশ কয়েকজন এই প্রস্তাবে সায় দিল। যারা সুরেন্দ্রকে কামরায় আশ্রয় দিতে চায়, তারা নিঝুম, হতবাক। এখনই কিছু করা দরকার। পাশের কামরার দরজাটা ভেঙে পড়ার শব্দ পেয়েই বন্ধ জানলার পাল্লা তুলে মাথাটা অল্প বার করে অমলেন্দু হিন্দিতে চেঁচিয়ে বলল, তোমরা যাদের খুঁজছ, তাদের একজনও এখানে নেই।

কথাটা শেষ হতেই মাথার ওপর লোহার ডাণ্ডার বাড়ি খেয়ে অমলেন্দু বেহুঁশ হয়ে গেল। জ্ঞান হারাবার আগে সে দেখল, পাশের কামরার ভাঙা দরজার সামনে একজন জ্যান্ত মানুষ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। প্রায় বার ঘণ্টা

গাজিয়াবাদ স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার পর, সেখান থেকে সরাসরি নিউ-দিল্লি স্টেশনে ট্রেনটা ঢোকার সুযোগ পেল। নিউদিল্লি স্টেশনে ঢোকার অনেক আগেই জ্ঞান ফিরেছিল অমলেন্দুর। ঝিমঝিম মাথা, ভারি দুর্বল লাগছিল নিজেকে। চোখ খুলে মাথার পাশে অমলেন্দু দেখল, মিসেস গেলটকে। মিসেস গেলটের দু'চোখে জল। অমলেন্দুকে ঘিরে নানা সম্প্রদায়ের আরও কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়েছিল। দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোকটি বললেন, আপনার মাথায় ডাণ্ডা মারলেও আপনার কথা ওরা বিশ্বাস করেছিল। তাই আমাদের কামরার দরজা ভাঙেনি।

একটার পর একটা ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে যাত্রীদের উজাড় করে দিচ্ছে। কিন্তু যাত্রীদের সেই ভীড়ে একজনও শিখ নেই। প্ল্যাটফর্মে পুলিসের পাশাপাশি কদাকার যে লোকগুলো ঘুরছে, ওরা কারা? ওরা যদি সাদা পোশাকের পুলিস হয়, তাহলে ওদের হাতে বেতের ছড়ির বদলে লোহার ডাণ্ডা কেন? বেনারস স্টেশনে কাল ভোররাতে মিসেস গেলটকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা অমলেন্দুর মনে পড়ল। শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, আরো এক কঠিন জেদ, আহত, রক্তাক্ত অমলেন্দুর মাথা থেকে বৌ, ছেলে, মেয়ে আর সংসারের চিন্তা ফু দিয়ে কিছু সময়ের জন্যে উড়িয়ে দিল।

সুরেন্দ্রকে নিয়ে মেয়েদের ঘরের সামনে গিয়ে অমলেন্দু দাড়াল। নানা জাতের জনাদশেক মহিলা যাত্রীর মধ্যে কয়েকজন যে মুসলমান আছেন, পরশু রাতে খাবারের প্লেট ফিরিয়ে দিতে এসে অমলেন্দু আঁচ করেছিল। অমলেন্দু জানত, এই বিপদে মুসলমান মহিলারাই সুরেন্দ্রকে সাহায্য করতে পারে মেয়েদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত জুড়ে অমলেন্দু বলল, এই ছেলেট আপনাদের, একে আপনারা বাঁচান।

অমলেন্দু যা ভেবেছিল, তাই হল। মাঝবয়সী এক মুসলমান মহিলা সুরেন্দ্রকে কামরার মধ্যে টেনে নিয়ে তার পাগড়ীটা ফেলে দিয়ে চুল খুলে দিলেন জট পাকান চুলে তাড়াতাড়ি কয়েকবার চিরুনি চালিয়ে সুরেন্দ্রর পিঠের ওপর মেলে দিলেন তার এলো চুল। সেই মহিলার সঙ্গী আর একজন মহিলা, বয়স বাইশ বা তেইশ, সুটকেস থেকে দু'তিনটে বোরখা বার করে সবচেয়ে লম্বা বোরখাটা বয়স্ক মহিলার হাতে দিল। বোরখাটা খুলে তিনি পরিয়ে দিলেন সুরেন্দ্রকে। তারপর মিসেস গেলটের দিকে তাকিয়ে উর্দুতে তিনি বললেন, আপনি ভাববেন না, ছেলেকে সময় মত ঠিক আপনার কাছে পৌঁছে দেব।

মিসেস গেলটের মুখের দিকে তাকাবার সময় হল না অমলেন্দুর। সে নজর করেছিল, যে বোরখাটা একটু ছোট হওয়ায় সুরেন্দ্রর টাউজার্স দেখা যাচ্ছে। দ্রুত হাতে টাউজার্সের দুটো পা গুটিয়ে দিয়ে আরও একবার সুরেন্দ্রকে খুঁটিয়ে দেখল অমলেন্দু।

কামরার খোলা দরজা দিয়ে পুরুষ যাত্রীরা প্রায় সকলেই বেরিয়ে গেছে। বাকি দু'তিনজনের সঙ্গে অমলেন্দু প্ল্যাটফর্মে নামল।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে যাওয়ার দুটো গেটে দুজন চেকার। চেকারের হাতে টিকিট দিয়ে যাত্রীরা বেরিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীদের চেহারা, হাঁটাচলা দেখে মনে হচ্ছে, তারা যেন কোন যুদ্ধ থেকে ফিরছে। দুটো গেটের বাইরে চেকারের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে যারা তীক্ষ্ণ চোখে যাত্রীদের পরীক্ষা করছে, তাদের মুখ, চোখ দেখে অমলেন্দুর বুক কেঁপে উঠল। ফাটা কপাল, ক্লান্ত শরীর, সুটকেস হাতে প্ল্যাটফর্মের বাইরে যাবার আগে পাশের গেটে চেকারের সামনে দাঁড়ানো বোরখাপরা পাঁচ মুসলমান মহিলাকে অমলেন্দু দেখতে পেল। আরও একবার প্রবলভাবে নড়ে উঠল তার হৃৎপিণ্ড। পেছন ফিরে তাকাবার সাহস নেই তার। একটা কিছু হৈচৈ, বচসা শোনার জন্যে কানখাড়া করে সে রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করল। নাহ্, সেরকম কোন গোলমাল, কান্না, কোলাহল অমলেন্দু শুনল না। রাস্তায় নেমে অমলেন্দু দেখল, সামনে আলোয় ঝলমল রাজধানী, তার স্বদেশ, প্রবহমান ভারতবর্ষ

থাবা

সান্ধ্য আসর, শিলিগুড়ি হোটেল

হোটেলের ঘরে বসে সৃজন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। কথা, গল্প, হাসি, ইয়ার্কিতে রাত যে সাড়ে দশটা, কাল ভোরে উঠতে হবে, তারপর বিস্তর কাজ, এসব সৃজন ভুলে গিয়েছিল। বাইরে আলো ঝলমল শিলিগুড়ির বাজার-এলাকা, রাত সাড়ে দশটাতেও সচল, জেগে আছে। একটু আগে জোর একপশলা বৃষ্টি হওয়ায়, বৃষ্টির সঙ্গে হুহু করে কিছুটা পাহাড়ি ঠাণ্ডাও সমতলে নেমে এসেছে, বাতাসে তাই শীতল ভাব। অন্ধকার আকাশে জমাট ঘন মেঘ, আবার বৃষ্টি হবে।

এখনও পড়ে আছে আধবোতল হুইস্কি, দুটো প্লেটে ফিশ্‌ টিকিয়া আর ডিমের বড়া, গরম গরম, রুম্‌ বেয়ারা জগদীশ এইমাত্র দিয়ে গেল। সিনেমা, সাহিত্য, রাজনীতি, ক্রিকেট, সব বিষয় ছুঁয়ে, বারবার আলোচনা, চুটকি, শেষপর্যন্ত সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতায় গিয়ে পৌঁচোচ্ছে। এর কারণ সৃজন, সে কলকাতার বহুল প্রচারিত এক বাংলা দৈনিকের সাংবাদিক। খবরের খোঁজে আজ দুপুরেই সৃজন শিলিগুড়ি পৌঁচেছে। সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা নিয়ে মজা, রসিকতা, হাসাহাসি, সৃজনই উস্কে দিচ্ছিল এবং উপভোগ করছিল। সংবাদের নামে কতো ফাঁকা, ফাঁপা ভুয়ো জিনিস যে চলে যায়, সৃজন তার কিছু কিছু উদাহরণ তুলে ধরতেই, সে বিষয়ে সরস একটা গল্প কমল শোনাচ্ছিল। সৃজনের সঙ্গে কমলও কলকাতা থেকে এসেছে। একই কাগজে কমলও চাকরি করে। সে আলোকচিত্রী, সংবাদপত্রের চিফ্‌ ফটোগ্রাফার।

মুণ্ডেশ্বরী নদীতে প্রবল বন্যার রিপোর্ট লিখেছিলাম, ডায়মণ্ডহরবার ডাকবাংলোয় বসে, সৃজন বলল, বন্যার একটা অসাধারণ ছবি দিয়ে কমল সাহায্য করেছিল। বন্যার ছবিটা কমল অবশ্য তার বাগবাজারের বাড়িতে বসে তুলেছিল।

সৃজনের কথা শুনে রাঘব হাঁ। বিক্রম প্রশ্ন করল, কী রকম?

কমল বলল, চৌবাচ্চার জলে টেবিল ফ্যানের জোরালো হাওয়া দিয়ে উদ্দাম ঢেউ তৈরী করে ক্যামেরায় তুলে নিলাম। ব্যস্‌!

বিক্রম আর রাঘবের অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে কমল যোগ করল,

বন্যায় সেই ছবি পাঠকদের খুব প্রশংসা পেয়েছিল। দু'একজন সমালোচক ছবিটা সর্বভারতীয় আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন আমাকে।

কাছাকাছি কোথাও সজোরে বাজ পড়ল। হুইস্কির বোতলটা ফুরিয়ে আসছে দেখে রাঘব বলল, আমার খুব টেন্‌শন্ হচ্ছে।

কেন, বিক্রম প্রশ্ন করল।

মাল শেষ, ভারী ইনসিকিওরড্ ফিল্ করছি।

আর কতো টানবে চাঁদু, বিক্রম প্রশ্ন করল।

কি আর খেলাম!

কথাটা বলে রাঘব একটা লম্বা শ্বাস ফেলল।

রাঘবকে ভরসা দিয়ে মুচকি হেসে কমল বলল, ভয় নেই, স্টক্ আছে।

কলকাতা থেকে কাজ নিয়ে সৃজন আর কমল, অথবা ওদের দুজনের কেউ একজন শিলিগুড়িতে এলে, রাঘব আর বিক্রমকে আগেই খবর দিয়ে রাখে। রাঘব আর বিক্রম দুজনেই কলকাতার মানুষ, সৃজনের পুরোনো বন্ধু, এখন কমলের সঙ্গেও ওদের দুজনের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। চাকরীর জন্যে রাঘব আর বিক্রম শিলিগুড়িতে আছে। রাঘব একটা সরকারী প্রতিষ্ঠানের পার্চেজ অফিসার, বিক্রম হলো বিদ্যুৎ দফতরের এক্জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার।

সৃজন বলল, বছর চারেক আগে হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, এই তিন জেলা জুড়ে দারুণ খরা হয়েছিল। ফি-বছরই বন্যা অথবা খরা হয়। কোনো-বার বেশী হয়। সে বছরও প্রচণ্ড খরা হয়েছিল। রিপোর্ট করতে যাওয়ার আগে হাওড়া আর মেদিনীপুর জেলার বর্ডারে সেচদপ্তরের একটা চমৎকার বাংলো খোঁজ নিয়ে জোগাড় করে ফেললাম। কলকাতার বাইরে খবরাখবর নিতে যাওয়া মানেই রাত্রিবাস, একটা বা দুটো রাত থাকতেই হয়, তাই থাকার জায়গা ঠিক না করে বের হওয়ার অনেক বিপদ। দু'জেলার মাঝখানে সেচদপ্তরের যে বাংলোটায় আমরা, মানে কমল আর আমি গিয়ে উঠলাম সেটা ছিল উঁচু পাঁচিলে ঘেরা ঝকঝকে, ছবির মতো একটা প্রাসাদ। সাদা রঙের বাড়ী, চারপাশে সযত্নলালিত ফুল, ফলের বাগান, দুদিকে বিশাল বারান্দা, সামনে লোহার গেট্। বাংলোর ভেতরেও আয়োজনের ত্রুটি নেই। ফোমের গদীমোড়া বিছানা, সোফা, কৌচ, ড্রেসিং টেবিল, ফ্রিজ, এলাহি ব্যবস্থা। বেলা এগারোটার মধ্যে বাংলোয় পৌঁছে পোশাক বদলে, চা নিয়ে যখন আমরা বারান্দায় বসলাম, তখন প্রায় বারোটা। মাঝ আকাশে দাউদাউ সূর্য, ফাঁকা মাঠে হুহু লু হাওয়া, চারপাশ ঝলসে যাচ্ছে। ঠিক করেছিলাম, দুপুরের খাওয়া সেরে গ্রাম প্রদক্ষিণে বেরোব। চৌকিদারকে তাড়াতাড়ি রেঁধে

খাবার দিতে বলেছিলাম। কিন্তু আকাশ আর প্রকৃতির মারমুখী চেহারা দেখে দুপুরের বদলে সূর্যাস্তের পর আমরা বাইরে যাওয়া ঠিক করলাম। তখনই সুটকেস্ থেকে বিয়ার, জিন, হুইস্কি বেরোল। চৌকিদারকে ডেকে বরফের হুকুম দিয়ে বললাম, দুপুরের খাবারের জন্যে তাড়াহুড়োর দরকার নেই। আপাতত কিছু ভাজাভুজি দাও।

চৌকিদার ছিল ওস্তাদ রাঁধুনী। আমাদের খাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে সে পাপড়ভাজা, আলুভাজা, ডিমভাজা, কুঁচো পেঁয়াজ আর আদা দিয়ে যাচ্ছিল। বাইরে কাঠফাটা রোদ আর তাপ থাকলেও ঘরের ভেতরটা মোটামুটি আরামদায়ক। মাথার ওপর দুটো ফ্যান শব্দহীন, বাঁইবাঁই ঘুরছিল। বেলা তিনটের সময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দুপুরের খাওয়া কোনোমতে শেষ করে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো সন্ধের পর। পৃথিবীতে তখন ছায়া নামছে, অথচ বাতাসে আগুনের আঁচ। প্রথমে কমল উঠেছিল। ও ডেকে তুলল আমাকে। বারান্দা থেকে দেখলাম, ফাঁকা, ধুধু, ফুটিফাটা মাঠ, কোথাও একটা ঘাস নেই। থমথমে, নীরব চারপাশ, জনপ্রাণী চোখে পড়ল না। অজানা, অচেনা জায়গা, অন্ধকার নামছে, মাথায় নেশা, চোখে ঘুম, শরীরে অবসাদ, বুকে তৃষ্ণা। কমলের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করলাম, আজ নয়, কাল খুব ভোরে, সূর্যোদয়ের আগে, বাংলো থেকে বেরিয়ে পাঁচ সাতটা গ্রাম ঘুরে আসব। আমি আমার কাজ করব, কমল ছবি তুলবে। অন্ধকার ঘন হল। নির্মেঘ ফিকে নীল আকাশে ফুটে উঠল অসংখ্য তারা। কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই, পৃথিবীতে আর কোনোদিন যেন বৃষ্টি হবে না। ঘরের সামনে বারান্দায় বোতল, গ্লাস সাজিয়ে আবার আমরা বসে গিয়েছিলাম। গুমোট কমে ঝিরঝির হাওয়া বইছিল। রাত ন'টা নাগাদ টের পেলাম বাংলোর বাইরে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে। তাদের গুজগুজ কথা, পায়ের শব্দ, চাপা কাশির খনখনানি শুনে কমল আর আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এক প্লেট গরম পেঁয়াজি টেবিলের ওপর রেখে চৌকিদার বলেছিল, কীভাবে খবর রটে গেছে যে, কলকাতা থেকে দুই রিপোর্টারবাবু খরার খবর করতে বাংলোয় এসে উঠেছে। সাতগাঁয়ের লোক তাই তাদের দুঃখের কাহিনী শোনাতে এসেছে। শদুয়েক মানুষ ইতিমধ্যে জড়ো হয়েছে, আরো অনেকে আসছে।

চৌকিদারের চোখে জুলজুল নজর, খবরটা দিয়ে ধীর পায়ে সে চলে গিয়েছিল। গরমের জন্যে বাংলোর সব দরজা, জানলা হাট করে খুলে দিয়েছিলাম। বারান্দা থেকে দেখলাম, পাঁচিলের বাইরে উপোসী, কঙ্কালের মতো মানুষের দঙ্গল, ছেলে, মেয়ে, জোয়ান, বুড়োবুড়ি বাংলোর ভেতর থেকে আলো

ছিটকে পড়েছে তাদের শরীরে। আতঙ্কে ধুকপুক করছিল আমার বুক। বাইরে গুনগুন বাড়ছে। চৌকিদার এসে বলল, আপনাদের সঙ্গে ওরা দেখা করতে চায়।

কেন, আমি প্রশ্ন করলাম।

ওদের নাকি কিছু কথা বলার আছে।

চৌকিদারের জবাব শুনে খুব বিরক্ত হলাম। কমলও রেগে গিয়েছিল। রাগারই কথা। কেননা খরাক্লিষ্ট মানুষদের জন্যে আমাদের কিছু করার নেই। আমরা নেতা, প্রশাসক বা মন্ত্রী নই, রাজস্ব, রাজকোষ, জনকল্যাণ, যাঁদের হাতে, উপোসী, গরীব মানুষদের সঙ্গে তাঁরাই কথা বলবেন। আমরা কে? তাছাড়া সেই দুপুর থেকে প্রচুর মদ্যপান করে আমাদের মাথা ঘুরছে, দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, শরীর শিথিল, যুক্তি, বুদ্ধি ধোঁয়াটে, খরা, বন্যা, যুদ্ধ, মহামারী, সবকিছু তখন আমাদের চোখে নিছক ছেলেখেলা।

চৌকিদারকে বললাম, ওদের কাল আসতে বলো, কাল সকালে... ।

চৌকিদার চলে গেল। আমাদের দুজনের সামনে গ্লাসভর্তি মদ, স্যুটকেসের ভেতর একাধিক বোতল, তবু আর চুমুক দিতে পারলাম না। শব্দহীন, অগ্নিগর্ভ কিছু মুহূর্ত, যে কোনো ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। চৌকিদারের জন্যে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। বাংলোর বাইরে চাপা গলার গুঞ্জন, ভাঙা ভাঙা কথা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। আমার গা ছমছম করছিল, কমল চুপচাপ, গম্ভীর।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে ফিরে এসে চৌকিদার বলল, ওরা আজ রাতেই আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে চৌকিদার যোগ করল, গাঁয়ের অবস্থা দেখাবার জন্যে ওরা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চায় আপনাদের।

চৌকিদারের কথা শুনে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, এটা একটা ষড়যন্ত্র। অন্ধকার, অচেনা একটা গাঁয়ে দুজন নিরীহ সাংবাদিককে ধরে নিয়ে গিয়ে, এই ক্ষুধার্ত, ক্ষিপ্ত মানুষগুলো খুন করার মতলব এঁটেছে। নাহ্, কিছুতেই ওদের সঙ্গে যাওয়া নেই। আমরা স্বাধীন সাংবাদিক, বিবেকের সায় না থাকলে কারো চাপে পড়ে কিছু করব না। কিন্তু সে মুহূর্তে কী করার আছে, ভেবে পেলাম না। অন্ধকার রাস্তায় মানুষের ভীড় বাড়ছে, কিন্তু খুব বেশী হৈচৈ, চীৎকার নেই। বিদ্যুৎগতিতে চিন্তা যাতায়াত করছিল আমার মাথায়। বাংলো থেকে পুলিশ থানা পাঁচমাইল দূরে। আমাদের সঙ্গে গাড়ি নেই, থাকলেও থানায় যাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। নেশার একটা মজা আছে। নেশা যেমন মানুষকে অবশ,

বুঁদ করে রাখে, তেমনি বিশেষ জরুরী মুহূর্তে ভারী সাহসী, সক্রিয় করে দেয়। সেদিনও এরকম কিছু ঘটেছিল। আমি হঠাৎ খুব সাহসী, আত্মবিশ্বাসী হয়ে গেলাম। ঘর ছেড়ে বাংলোর সদরের দিকের বারান্দায় এসে চৌকিদারকে বললাম, গেট খুলে দাও, আসতে বলো সকলকে....।

গেট খুলে গেল। গেটের বাইরে অন্ধকার রাস্তায় অভুক্ত, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত যে সব লোকগুলো খানিক আগেও আমাদের খিস্তি করছিল, অভিশাপ দিচ্ছিল, আলো ঝলমল বারান্দায়, মুখোমুখি আমাকে দেখে, তারা হঠাৎ চুপ মেরে গেল। এরকমই একটা প্রতিক্রিয়া আমি আশা করছিলাম। অন্ধকারে দাঁড়ানো মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে নরম অথচ উঁচু গলায় বললাম, আপনারা ভেতরে আসুন....। আমার ডাক শুনে অন্ধকারে মিশে থাকা ছায়ামূর্তিরা নিঃশব্দ, অনড়, কেউ একপা এগোল না। কাঁধে ক্যামেরা, ফ্লাশ, নিয়ে বারান্দায় আমার পাশে কমল এসে দাঁড়িয়েছিল। অনেক দূরে ঘন কালো একটা মলমলের মতো স্থির আকাশ, আকাশের রঙ যেন হঠাৎ বদলে গেছে। মেঘ জমছে নাকি? দু'একজন মানুষ আবার ফিসফিস কথা শুরু করেছে।

বারান্দায় অল্প সময় দাঁড়িয়েই আমি যথেষ্ট সাহস, তেজ, আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলাম। বুঝেছিলাম পুরো খেলা এখন আমার হাতে, সতর্ক, নির্ভুল চালে খেলতে হবে। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনাদের কষ্ট, দুর্দশা, নিজের চোখে সরেজমিনে দেখে রিপোর্ট লেখার জন্যে আমরা এখানে এসেছি। কাল সকাল থেকেই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে, আপনাদের সঙ্গে কথা বলে, যা জানার জেনে নিয়ে কাজ শুরু করবো। তবে আজ নয়, কাল···।

চাপা গলায় কে একজন বলল, আজই চলুন, আমাদের ভারী দুর্গতি, ঘরে ভাত নেই, পুকুরে, নদীতে, ক্যানেলে জল নেই, বৃষ্টি নেই, মাঠ, ঘাট শুকিয়ে, পুড়ে খটখটে, খাক হয়ে গেছে।

অন্য একটা গলা বলল, খিদের জ্বালায় গলায় দড়ি দিয়ে গত দু'দিনে আমাদের গাঁয়ে তিনজন আত্মঘাতী হয়েছে। শুনেছি, শহর থেকে রিলিফের টাকা, চাল এসেছে। কিন্তু আমাদের বরাতে ছিটেফোঁটা জোটেনি। বিডিও আর পঞ্চায়েতীরা সব হজম করে নিচ্ছে। কিছু বলতে গেলে তারা ধমক লাগায়, ফৌজদারী করার হুমকি দেয়।

লোকটার কথার মধ্যেই শকুনছানার মতো তীক্ষ্ণ গলায় একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল। ভাঙাভাঙা, কাটাকাটা, অপুষ্ট শিশুর কষ্টের কান্না! কমল আর আমি বারান্দার সামনে, লোকগুলোর খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিলাম। আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল তাদের মুখ, মুখ নয়, মোমের ঢালাই, নির্বিকার, উদাসীন, লোভ, ক্ষোভ, হতাশা, রাগ, ঘৃণার সব দাগ মুখ থেকে মুছে গেছে। প্যাকাটির মতো চেহারা, পিঠ, পেট এক হয়ে যাওয়া এই

মানুষগুলো, ঠিক মানুষ নয়, চলন্ত লাশ, এরা যে কীভাবে এতোটা পথ হেঁটে এলো, অভিযোগ জানাল, কীভাবে গ্রামে ফিরবে, আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমার কথা শুনে তাদের ক্ষোভ, উত্তেজনা যেটুকু ছিল, তাও গলে জল হয়ে গেল। অনেকের নাম, গাঁয়ের নাম, প্রশ্ন করে আমি জেনে নিলাম। একটু পরেই তারা লাইন দিয়ে অন্ধকারের দিকে হাঁটা শুরু করল। এইসব কথার মধ্যে বেশ কয়েকবার ঝলসে উঠেছে কমলের ক্যামেরা, দরকারী ছবি-গুলো তার তোলা হয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন দুপুরে ব্রিগেড্ প্যারেড্ গ্রাউণ্ডের কেন্দ্রীয় সমাবেশে আমার আর কমলের হাজির থাকার কথা ছিল। খুব জরুরী সভা, বড়ো বড়ো নেতারা থাকবেন। ঠিক সময়ে সেখানে পৌঁছোতেই হবে। তাই ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে খরাপীড়িত গাঁগুলোতে যাওয়ার বদলে আমরা কলকাতা রওনা হয়েছিলাম। কলকাতার ট্রেন ধরার জন্যে স্টেশনে যাওয়ার পথে স্থানীয় থানায় ঢুকে, পরিচয়পত্র দেখিয়ে, গতকাল রাতে যাদের নাম, ঠিকানা লিখে রেখেছিলাম, তাদের বিরুদ্ধে ডাইরি করলাম। অভিযোগ মারাত্মক, মাঝরাতে চড়াও হয়ে ডাকাতি, লুঠপাট আর খুনের চেষ্টা।

ডাইরি করার পর থানার বড়োবাবুকে বললাম, ঘটনাটা মহাকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেও আমরা জানাবো। আইনশৃঙ্খলার যা অবস্থা..।

বেশ ঘাবড়ে গিয়ে বড়োবাবু বললেন, দয়া করে আমাকে ডোবাবেন না। আমি কথা দিচ্ছি, যে কটা গাঁয়ের নাম আপনারা দিয়েছেন, দরকার হলে আরো কয়েকটা গাঁ ঘিরে সকলকে থানায় তুলে এনে সদরে চালান দেবো।

তারপর, আমি প্রশ্ন করলাম।

বলুন কি করতে হবে, অনুগতের মতো বড়োবাবু জানতে চাইলেন।

অন্ততঃ তিনমাস, হ্যাঁ তিনমাস, একটা দিনও কম নয়, ওদের জেলে পুরে রাখতে হবে, আমি বললাম।

তাই হবে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বড়োবাবু বললেন, এটা কোনো শক্ত কাজ নয়।

পরের দিন আমাদের কাগজে হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, এই তিন জেলার খরার ওপর যে রিপোর্ট বেরিয়েছিল, ঝানু সাংবাদিকদের মতে তা ছিল, বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত বছরের সেরা রিপোর্ট।

সুজন গল্প শেষ করতে অট্টহাসিতে রাঘব ভেঙে পড়ল। গম্ভীর গলায় বিক্রম বলল, গরীব মানুষগুলোকে জেলে পাঠানো কিন্তু উচিত হয়নি।

বিক্রমের কথা শুনে কমল মিটিমিটি হাসছে। সুজন বলল, সাংবাদিক জীবনে ওইরকম একটা দুটো ভালো কাজ আমরা করেছি। জেলহাজতে পাঁচ

গাঁয়ের প্রায় তিনশো লোকের তিনমাসের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। বাইরে থাকলে মানুষগুলো না খেয়ে শুকিয়ে, ধুঁকে ধুঁকে মরে যেত।

বিক্রম এবং রাঘব তাজ্জব, অবাক হয়ে তারা সৃজনের দিকে তাকিয়ে আছে। সৃজন বলল, রাতে, বাংলোয় বসে কমল আর আমি পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে সৃজন বলল, এই ঘটনার বছরখানেক পরে বাগনান স্টেশনে ওই বড়োবাবুর সঙ্গে দেখা, সব বললাম ভদ্রলোককে। শুনে বড়োবাবু হেসে গড়াগড়ি, বললেন, জীবন সম্পর্কে আপনাদের ধারণাটাই ভুল। মানুষ যতোই গরীব, ক্ষুধার্ত হোক, কোনো কিছুর জন্যেই সে স্বাধীনতা হারাতে চায় না।

আমাদের ট্রেন এসে গিয়েছিল। ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বড়োবাবু বলেছিলেন, আর যা করুন, আগামী দশবছর আর ওই বাংলোর তল্লাটে যাবেন না।

হুইস্কির নতুন বোতল খোলা হতে জগদীশ দু'প্লেট গরম শিক কাবাব দিয়ে গেল। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। নতুন বোতল খোলা হতে বেসিনে হাতমুখ ধুয়ে রাঘব বেশ গ্যাঁট হয়ে বসেছে। খুশীতে, আবেগে চকচক করছে তার মুখ, চোখ। একটুকরো শিককাবাব মুখে পুরে সৃজন শিলিগুড়িতে আসার কারণ ব্যাখ্যা করছে। এবারেও তাদের ঘাড়ে কাগজের দায়িত্ব, সাংবাদিকের কাজ। সৃজন বলছিল, এক সাংঘাতিক রোগ উত্তর বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। রোগটা ভারী অদ্ভুত, ডাক্তারী শাস্ত্রে এ রোগের উল্লেখ নেই, কিন্তু ভীষণ ছোঁয়াচে, আক্রান্ত হলে মৃত্যু অনিবার্য। কলকাতার সব কাগজে এই রোগের খবর ছাপা হয়েছে। সরেজমিন তদন্ত করে একটা বিস্তৃত প্রতিবেদন লেখার জন্যে কমল আর আমি এসেছি।

বিক্রম বলল, রোগটার কথা আমি শুনেছি, শিলিগুড়িতেও কয়েকজনের হয়েছে, কিন্তু বিশদ কিছু জানি না।

সৃজন বলল, আমিও খুব অল্প জানি। শুনেছি প্রথম দিনে জ্বর হয়, গা, হাত-পায়ে সামান্য ব্যথা, দ্বিতীয় দিনে তেড়ে জ্বর আসে, একশো তিন, চার পাঁচে গিয়ে ঠেকে থার্মমিটারের পারদ, তৃতীয় দিন একই রকম থাকে, মনে হয়, এবার জ্বর কমবে, কিন্তু কমে না, চতুর্থ দিনে শুরু হয় তড়কা, শরীরের খিঁচুনি, অসহ্য কষ্টে শরীর দুমড়ে, মুচড়ে যায়, জবাফুলের মতো টকটকে লাল হয়ে ওঠে দুচোখ, তারপর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব কষ্ট, তাপ শেষ, রক্তমাংসের শরীর নিষ্প্রাণ, নিথর হয়ে যায়। এ রোগের নাম, লক্ষণ, জানা না থাকায় ডাক্তাররা খুব অসহায় বোধ করছেন, নিরাময়ের কোনো পথ বাতলাতে পারছেন না।

রোগটা নিয়ে সৃজন আরো কিছু বলার আগেই রাঘব জানাল, এ রোগটার নাম কাটাও....।

ভারী অদ্ভুত নাম তো, কমল বলল।

চাপা গলায় রাঘব বলল, তোমাদের রুমবেয়ারা জগদীশের পাড়ার একজন এই রোগে কয়েকদিন আগে মারা গেছে।

খবরটা শুনে সৃজন কৌতূহলী হলো। একটু পরে জগদীশ ঘরে প্লেট নিতে এলে সৃজন কথাটা তুলতে জগদীশ জানাল, খবরটা ঠিক। তার বাড়ির পাঁচ সাতটা বাড়ি পরে অমূল্য গুঁই-এর বাড়ি, তার বছর সতেরো, আঠারোর ছেলেটা দু'হপ্তা আগে কাটাও রোগে মারা গেছে। আড্ডা, গল্প, মদ্যপানের মধ্যে প্রতিবেদনের একটা খসড়া সৃজন মনে মনে বানিয়ে তুলল। অমূল্য গুঁই এবং আরো কয়েকজন শোকাহত মানুষ, কিছু রুগী এবং কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে, একটা রিপোর্ট লিখে, তার সঙ্গে কমলের তোলা পুত্রহীনা মা, মুমূর্ষু রুগী, ডাক্তার, হাসপাতাল আর শিলিগুড়ির একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য, এরকম কয়েকটা ছবি, পরপর সেঁটে দিলে বেশ লোমহর্ষক একটা অন্তর্তদন্ত দাঁড় করিয়ে দেওয়া যাবে। কাগজের সুনাম বাড়বে।

শিলিগুড়ির বেশির ভাগ ডাক্তার, রাঘব আর বিক্রমের চেনা, কেউ কেউ বন্ধু। দু'চারজন ডাক্তারের সঙ্গে সৃজন আর কমলকে যোগাযোগ করানোর দায়িত্ব রাঘব আর বিক্রম নিল। আগামীকাল সন্ধ্যেতেই রাঘবের বাড়িতে দেখাসাক্ষাৎ হবে। সৃজন আর কমলকে রাতে খাওয়ার জন্যে রাঘব নেমন্তন্ন করল। বিক্রম কথা দিল, কাল সন্ধ্যেতে সে তার ডাক্তার বন্ধু বিমান সেনকে নিয়ে রাঘবের বাড়ীতে চলে যাবে। বিমান সেন শিলিগুড়ির খুব নামী, ব্যস্ত চিকিৎসক।

একটু আগে একপশলা বৃষ্টির পর চারপাশ যেরকম ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, এখন আর সেটা নেই। ঘরের ভেতরে বলেই হয়তো গুমোট ভাব। মাথার ওপর বন্‌বন্‌ করে ফ্যান ঘুরলেও মিন্‌মিনে ঘামে সৃজনের পাঞ্জাবির বুক, পিঠ ভিজে উঠছে। দ্বিতীয় বোতলের প্রায় অর্ধেক শেষ। বিক্রম বলল, আর নয়, এরপর গাড়ি চালাতে অসুবিধে হবে।

গ্লাসে নতুন এক পেগ হুইস্কি ঢেলে রাঘব বলল, লাস্ট ফর দ্য রোড, এই শেষ....।

রাঘবের কথা একটু জড়ানো। তার দিকে তাকিয়ে বিক্রম হাসল। চারজনের মুখের কথাই কমে এসেছে, আড্ডার মৌতাতে চারজনই বুঁদ। বাড়ি ফেরার তাড়া না থাকলে বিক্রম আর রাঘব আরো খানিকক্ষণ এখানে

থেকে যেত। তাছাড়া রাতও হয়েছে। একতলার রিসেপশনের দেওয়াল ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ সৃজন শুনেছিল বেশ কিছু আগে।

জগদীশের সঙ্গে কাল সকাল দশটায় অমূল্য গুঁই-এর বাড়িতে সৃজন যাওয়া ঠিক করেছে। অমূল্য হলো জগদীশের পড়শি, অনেক দিনের পারিবারিক চেনাজানা। সকাল দশটায় জগদীশের বাড়ীতে পৌঁছোতে হলে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে নিতে হবে।

ঘণ্টাখানেক আগেও কাল সকালের কাজগুলো মাথার মধ্যে সৃজন পরপর সাজিয়ে নিতে পারছিল। এখন একটু এলোমেলো, মাথার মধ্যে ধোঁয়াটে শিথিল ভাব। যে ভয়ংকর রোগটা গত এক দেড়মাসে উত্তর বাংলার তিন-চারটে জেলায় ত্রিশ, চল্লিশ জন তরুণের মৃত্যু ঘটিয়েছে, সে রোগের ভয়ংকরতা, সৃজনের চেতনায় এই মধ্যরাত্রে কেমন ধূসর, আবছা হয়ে গেছে। রোগ, ভোগ, মৃত্যু আছেই, অমোঘ, অনিবার্য, এ নিয়ে দুশ্চিন্তার মানে হয় না, এরকম এক নিরাসক্তি, দার্শনিকতা সৃজনের মাথায় কাজ করছে।

কমল নতুন গল্প ফেঁদেছে।

কুমারডুবি ষ্টেশন থেকে মাইল সাতেক দূরে এক কয়লা খনিতে ধ্বস নামায় প্রায় তিপান্নজন মানুষের খনির নিচে জীবন্ত সমাধি হয়েছিল। সৃজন আর আমাকে রিপোর্ট করার জন্যে অফিস পাঠাল। আমাদের গাড়িটা রাস্তায় গণ্ডগোল করাতে দুর্ঘটনার জায়গায় পৌঁছোতে আমাদের দেরী হয়ে গিয়েছিল। বিধ্বস্ত খনির কাছে দুর্ঘটনার তিনদিন পরে এক দুপুরে আমরা যখন পৌঁছোলাম, তখন জায়গাটা শ্মশানের মতো খাঁখাঁ নির্জন, অল্প দূরে কুলিলাইন, চুপচাপ, শব্দহীন। বেশীরভাগ কাগজের সাংবাদিকরা কাজ সেরে সেদিন সকালে ফিরে গেছে। খবর, ছবি, যা জোগাড় করার ঝেড়ে, মুছে নিয়ে গেছে। এমনিতে আমাদের দেরী হয়ে গিয়েছিল, সকলের শেষে, সব কাগজের চব্বিশ ঘণ্টা পরে, বাসী ছবি, খবর নিয়ে, কলকাতায় পৌঁছে কী যে করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। অনেকটা জায়গা জুড়ে ধ্বস নেমেছিল। ধ্বসের নিকট হাঁমুখের চারপাশে সৃজন আর আমি ঘুরছিলাম। কিছু একটা খবর এখান থেকে উদ্ধার করতে হবে। বাতাসে তখনও কালো ধুলো উড়ছে। হঠাৎ দেখলাম, ধ্বসের এক কোণে বছর দশ, এগারোর একটা রোগা ছেলে, কুচকুচে কালো রঙ, খালি গা, কোমরে ছেঁড়া ইজের, একা বসে আছে। ছেলেটার মুখে, চোখে আতঙ্ক, বিহ্বলতা, ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলে যেমন হয়। মনে হল, ছেলেটার কোনো আপনজন, হয়ত বাবা, মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। যে কোনো মুহূর্তে খনির ভেতর থেকে বাবা বেরিয়ে আসবে ভেবে ছেলেটা মাঝদুপুরে জনমানবহীন সেই মৃত্যুকূপের পাশে বসে

ছিল। ছেলেটাকে নাম, ঠিকানা, বাবার নাম ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে কোনো জবাব পেলাম না। আমাদের জিজ্ঞাসাবাদে ছেলেটা ভড়কে গেল। একটা ঘেয়ো কুকুর ধ্বংসস্তূপের মাটি শুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। খনির তলায় যে মাংস জমে আছে, কুকুরটা বোধ হয় টের পেয়েছে। অনেকটা দূরে, খনির আর একটা মুখ থেকে বন্দী মানুষদের উদ্ধার করার কাজ চলছিল। কিন্তু সবটাই বৃথা, খনির পেটের ভেতর থেকে একজনকেও বার করা যায়নি। সেই শূন্য ধ্বংসস্তূপের ছবি তুলে যে কী লাভ, ভেবে পেলাম না। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সৃজনকে ডেকে চাপা গলায় পরামর্শ করার পর ক্যামেরা বাগিয়ে সেই ছেলেটাকে লেন্সে ধরলাম। ধীর পায়ে ছেলেটার দিকে এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা মামুলি প্রশ্ন করার ফাঁকে তার গালে সৃজন এক সপাট চড় কষিয়ে দু'পা সরে গেল। আমি যা আশা করেছিলাম, তাই ঘটল। আকাশের দিকে দুহাত তুলে শরীর মুচড়ে ছেলেটা ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। ক্যামেরায় পর পর তিনটে ছবি নিলাম তার। সৃজন তখন ছেলেটার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে ভোলাতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত পাঁচটা টাকা আর চকোলেট দিয়ে তাকে শান্ত করা হয়েছিল। কান্না থামার পরেও ছেলেটা ফোঁপাচ্ছিল, দমকে দমকে কেঁপে উঠছিল তার শরীর। ওই একটা ছবি দিয়েই আমরা খবরের বাজী মাত করে দিয়েছিলাম। পরদিন কাগজে সচিত্র খবর ছাপা হয়েছিল। ছবিটার শিরোনাম ছিল, আমার বাবাকে ফিরিয়ে দাও।

ওই ছবিটা দু'বছর আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বছরের সেরা ছবি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। বিচারকেরা বলেছিলেন, এত জীবন্ত, বাস্তব, মানবিক আলোকচিত্র সহজে চোখে পড়ে না।

কমলের গল্প শুনে বিক্রম হেসে গড়িয়ে পড়ল। একতলার দেওয়ালঘড়িতে রাত বারোটা বাজার পর, আর কোনো শব্দ হয়নি। ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেল নাকি? শিলিগুড়ি শহর এখন শান্ত, চুপচাপ। রাস্তা দিয়ে একটা ভারী ট্রাক চলে গেল। এবার সৃজনের সঙ্গে তার স্ত্রী নন্দিনী আর ছেলে নালক শিলিগুড়িতে আসতে চেয়েছিল। নালক পড়ে ক্লাস এইটে, তার এখন স্কুল ছুটি। নন্দিনীর ইচ্ছে ছিল, সৃজনের শিলিগুড়ির কাজ শেষ হলে, সেখান থেকে তিনজনে মিরিক, মংপু ঘুরে কলকাতায় ফিরবে। নালকও বায়না জুড়েছিল। বৌ আর ছেলেকে পুজোর ছুটিতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সৃজন রেহাই পেয়েছে। পরশু সৃজনকে কলকাতায় ফিরতেই হবে। পরের দিন থেকে চেম্বার অব কমার্সের জরুরী অধিবেশন বসবে। সেখানে সৃজনের থাকার কথা। তাছাড়া অফিসের কাজে ফ্যামিলি নিয়ে ঘোরানো সৃজন পছন্দ করে না। তবে সৃজন একটা জিনিস দেখেছে যে,

বৌ, ছেলে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার আলাদা মজা আছে।' নিয়মমাফিক, উত্তেজনাহীন সে ভ্রমণে অন্যরকম এক আকর্ষণ আর তৃপ্তি মিশে থাকে।

মাঝরাতে আবছা ঘুমের মধ্যে নন্দিনী আর নালকের মুখটা দেখে সৃজন দু'তিনবার জেগে উঠল। পাশের খাটে কমল ঘুমোচ্ছে। ভোরের দিকে সৃজনের মনে হলো, কলঘরে কেউ বমি করছে। কমল বমি করছে নাকি? উঠবো উঠবো করেও সৃজন আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সান্ধ্য আসর, রাঘবের বাড়ি

কয়েক পেগ্ হুইস্কি খাওয়ার পর জড়তা, সঙ্কোচ কাটিয়ে ডাঃ সেন এখন বেশ সহজ, সাবলীলভাবে কথা বলছেন। তাঁর গলার স্বরে অল্প আবেগ, উত্তেজনা সৃজন টের পেল। ডাঃ সেন বললেন, গত একমাসে প্রায় পঞ্চাশজন কাটাও রুগীকে পরীক্ষা করে আমার মনে হয়েছে, এটা ঠিক অসুখ নয়, একধরনের নাশকতা, মানুষের জীবন নিয়ে কেউ গোপন পরীক্ষা চালাচ্ছে।

রাঘবের সাজানো ড্রইংরুম আলোয় ঝলমল করছে। রাঘবের স্ত্রী দময়ন্তী, দু'হাতে দুটো প্লেট, একটায় পাঁপড়ভাজা, অন্যটায় মাংসের বড়া নিয়ে ঘরে ঢুকল। গতরাতের বমি, অসুস্থতার কথা ভুলে গিয়ে কমল এখন বেশ চনমনে, উদ্দীপ্ত।' ক্যামেরায় ফ্লাশ্ লাগিয়ে সে দুটো ছবি তুলল দময়ন্তীর। তারপর দময়ন্তীকে বলল, মাদাম, একটা ছোট জিন...?

দময়ন্তী বেশ সুন্দরী। দুচোখে খুশীর বিদ্যুৎ ছিটিয়ে বলল, ছোট কিন্তু....।

ডাঃ সেনের কথাগুলো সৃজন এমন নিবিষ্ট হয়ে শুনছে যে, ঘরের বাকী লোকদের আলোচনা, হাসি, মন্তব্য কিছুই তার কানে ঢুকছে না।

একটা মাংসের বড়ায় কামড় দিয়ে ডাঃ সেন বললেন, এ রোগের উৎস, কার্যকারণ খুঁজে বার করতে না পারলে দেশ, গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। আমরাও বাঁচবো না। মালদহ, রায়গঞ্জ জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল থেকেও এ রোগের কিছু রিপোর্ট আমি পেয়েছি। রিপোর্টগুলো দেখে আমার মনে হচ্ছে, রোগটা খুব ছোঁয়াচে, কিন্তু সংক্রমণটা ভাইরাল না ব্যাক্‌টিরিয়াল, সেটা বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা ভাইরাল ইন্‌ফেকশন্, মারাত্মক ধরনের এক রোগজীবাণু, প্রতি সেকেণ্ডে লক্ষগুণ বেড়ে শরীরের ষোল আনা রক্ত বিষিয়ে দেয়।

ডাঃ সেনের কথাগুলো মাথার মধ্যে গেঁথে নেওয়ার জন্যে সৃজন আজ খুব ধীরে ধীরে হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছে। এখনও দু পেগ হয় নি। সৃজনের কাজের সুবিধের জন্যে ডাঃ সেনকে বিক্রম আজ রাঘবের বাড়ীতে ধরে এনেছে। রাঘবও ডাঃ সেনের পূর্বপরিচিত।

ডাঃ সেন বললেন, রুগীর রক্তের মধ্যে হুহু করে রোগজীবাণু বেড়ে গিয়ে রক্তের লোহিত কণিকাগুলো খেতে শুরু করে, রক্ত জল হয়ে যায়।

বাহক কী, কীভাবে ছড়াচ্ছে রোগটা, সৃজন প্রশ্ন করল।

জল বাতাস, দৈহিক সংযোগ, একটা বা সবগুলোই বাহক, সঠিক জানিনা, ডাঃ সেন বললেন।

এই ভাইরাস্ বা ব্যাক্‌টিরিয়া এলো কোথা থেকে, সৃজন জানতে চাইল।

সেটাই রহস্য, খুঁজে বার করা দরকার।

কথাটা বলে হুইস্কির গ্লাসে ডাঃ সেন চুমুক দিলেন।

আমাকে যে এবার উঠতে হবে, গ্লাসটা শেষ করে হাতঘড়ি দেখে ডাঃ সেন বললেন।

স্মিত হেসে সৃজন বলল, আর একটু বসুন।

সৃজনের কথার মধ্যেই ডাঃ সেনের খালি গ্লাসে এক পেগ্ হুইস্কি ঢেলে সোডা আর জল মিশিয়ে দিয়ে কমল বলল, আর একটা খান, ডাক্তার খেলে আমরাও খাওয়ার ভরসা পাই..।

ডাক্তার হেসে গ্লাস তুললেন। জিন, লাইম, সোডা মিশিয়ে জিমলেট্ তৈরী করে দময়ন্তীকে এগিয়ে দিল কমল।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে ডাঃ সেন বললেন, বেশ কিছু রুগী ঘেঁটে আরো নানা অদ্ভুত তথ্য আমি পেয়েছি। রোগীদের শতকরা নব্বই জনের বয়স ত্রিশের নিচে এবং মৃত্যুর আগে তাদের জননেন্দ্রিয় ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছিল। অক্ষম, ক্লীব হয়ে যাচ্ছিল তারা।

এটা একটা নতুন খবর। আরো কিছু শোনার জন্যে সৃজন নড়েচড়ে বসল। ডাক্তার বললেন, রোগটার ব্যবহার পঙ্গপালের মতো। কোনো জেলাতে বেশীদিন থাকছে না, এক জেলা থেকে আর এক জেলায় সরে যাচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গের দিকেই এগোচ্ছে। সব জেলাতেই রোগের প্রকোপ অল্পবয়সী তরুণদের মধ্যে, লক্ষণও একরকম, জ্বর, গাব্যথা, তড়কা। মৃত্যু যত এগিয়ে আসে রোগীদের শরীরে ততই ফুটে ওঠে ক্লীবত্বের ছাপ।

কী এক উত্তেজনায় সামনে রাখা মদের গ্লাস তুলে নিয়ে চোঁচো করে অর্ধেকটা সৃজন খেয়ে ফেলল।

ডাক্তার বললেন, আমার মনে হচ্ছে, কেউ যেন রিমোট্ কন্ট্রোল থেকে রোগটাকে রোলারের মতো এক জেলা থেকে অন্য জেলায় গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ডাক্তারের আলোচনা থেকে সরে গিয়ে বিক্রম বসেছে কমল আর দময়ন্তীর

সঙ্গে। রাঘবও সেদিকে উঠে গেল। সাংবাদিক জীবনের নানা গালগল্প বলে কমল ওদের প্রচুর আনন্দ দিচ্ছে। শব্দহীন, দাঁতচেপা হাসির বদলে দময়ন্তীও এখন গলা তুলে হাসছে।

আলোচনার মধ্যে নিজের হাতে খালি গ্লাসে ডাক্তার হুইস্কি ঢেলে নিলেন। ওঠার তাগিদটা তাঁর চলে গেছে।

ডাক্তার বললেন, আমার এক পুরোনো বন্ধু, ডাঃ বীরেন দত্ত, মালদহের ডি. এম. ও. গতকাল শিলিগুড়ি এসেছিল। তার মুখে শুনলাম, মালদায় এই রোগের নাম ঝিন্‌ঝিন্‌। মালদহের সদর হাসপাতালে তিন, চারদিন আগে পর্যন্ত এত রুগী আসছিল, যে বীরেন নাওয়, খাওয়ার সময় পেত না। রোগটা বীরভূমের দিকে সরে যেতে, গত পরশু থেকে বীরেন একটু হাফ ছাড়ার সময় পেয়েছে। বীরেন বলছিল যে, ঝিন্‌ঝিন্‌ রোগে আক্রান্ত কয়েকজন মহিলাকে পরীক্ষা করার সময় সে দেখেছে, যে রোগিণীদের স্তন শুকিয়ে গেছে। শরীরের তাপ, যন্ত্রণা কমাতে হাসপাতালের রুগীরা পরস্পরের মাথায় বালতি বালতি জল ঢেলেছে। তাতেও শরীরের তাপ, জ্বালা কমেনি, বেশীর ভাগ রুগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে ডাক্তার বললেন, নির্ভরযোগ্য, তথ্যবহুল একটা রিপোর্ট লিখতে হলে কাল শিলিগুড়ি থেকে একটা প্রাইভেট গাড়ী ভাড়া করে মালদহে চলে যান। সেখান থেকে গাড়ী নিয়ে বীরভূম। বীরভূমে গিয়ে যদি শোনেন রোগটা বর্ধমানে চলে গেছে, তাহলে আপনিও গাড়ি নিয়ে সেখানে তাড়া করুন, ছাড়বেন না, শেষ পর্যন্ত ফলো করবেন, ফলো করে হয়ত কলকাতা পৌঁছে যাবেন....।

কথাটা বলে ডাক্তার হাসলেন। সৃজনের বুকটা কেন ’খন হঠাৎ ধক করে উঠল।

ডাক্তার সেন বললেন, বীরেন দত্তর মুখে শুনলাম, বীরভূমে এই রোগটার নাম জুজুফাইটিস্‌। সেখানে রোগের হেকিমি চিকিৎসা হচ্ছে। কে একজন হুঁদে হেকিম বলেছে, যে নাকের ডগা আর দু'কানের লতিতে সাতদিন, রোজ সকাল, সন্ধে চুনের ফোঁটা লাগালে রোগটা ঘেঁসবে না। ব্যস, এমন মোক্ষম দাওয়াই পেয়ে সকলে চুন চিকিৎসায় মেতে উঠেছে। বীরভূমের শতকরা আশিজন স্ত্রী পুরুষ এখন নাকে, কানে চুন লাগিয়ে ঘুরছে।

ডাঃ সেন পাঁপড় চিবোচ্ছেন। পাঁপড়ের তেলে ভিজে চকচক করছে তাঁর দুটো ঠোঁট। সাংবাদিক জীবনের এমন কোনো গল্প কমল শোনাচ্ছে, যা খুব উঁচু গলায় বলা যায় না। কমলের গলায় ফিস্‌ফিস্‌, চাপা আওয়াজ, তিন শ্রোতার উৎকর্ণ, সজাগ ভঙ্গী দেখে সৃজন বুঝল, গল্পের বোমা এখনি ফাটবে।

গাড়ী ভাড়া নিয়ে রোগটাকে তাড়া করার পরামর্শ, যা একটু আগে হাল্কাভাবে ডাঃ সেন দিয়েছিলেন, সেটা সৃজনের মনে ধরেছে। পরশুর পরের দিন থেকে চেম্বারঅবকমার্সের জরুরী বৈঠক। সেখানে সৃজনকে থাকতে হবে। চুলোয় যাক চেম্বারঅবকমার্স। এই রোগটার উৎস এবং কার্যকারণ খুঁজে বার করা আরো বেশী দরকার। এখান থেকে একটা গাড়ী ভাড়া করে মালদা, বীরভূম হয়ে বর্ধমান যেতে খুব বেশী টাকা লাগবে না। লাগলেও অসুবিধে নেই, অফিসে গিয়ে বিল করে দিলেই টাকাটা পাওয়া যাবে।

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে সৃজন হিসেব করল, এটা তার চতুর্থ পেগ, মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। আর নয়। কাল সকালে গাড়ী ভাড়া করে বেরিয়ে পড়তে হলে এখানেই থামা উচিত। তা না হলে আজকের মতো কালও সব কাজ পণ্ড হবে। নিচু গলায় ডাক্তার বললেন, রোগের ভয়ে শিউড়ি, রামপুরহাটের অল্পবয়সী মানুষেরা গ্রামের দিকে, সুদূর সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ে, জঙ্গলে পালিয়ে যাচ্ছে।

ডাঃ সেনের কথার মধ্যেই সৃজন ঠিক করে ফেলল, কাল সকালে মালদহ ছুঁয়ে সে শিউড়ি যাবে। চতুর্থ পেগ শেষ করে, আর একটা হুইস্কি ঢেলে সৃজন মনে মনে বলল, এই শেষ, আর নয়, কাল ভোরে উঠে কমলকে নিয়ে মালদায় যেতেই হবে।

আজকের দিনটা একদম নিষ্ফল গেছে, কোনো কাজই সৃজন করতে পারেনি। বেশ বেলায় ঘুম থেকে উঠে সৃজন টের পেয়েছিল, দারুণ মাথা ধরেছে। বাইরে কটকটে রোদ, তাকানো যাচ্ছে না। জগদীশের সঙ্গে অমূল্য গুঁই-এর বাড়ী যাওয়ার সব উৎসাহ উবে গিয়েছিল। একবার ভেবেছিল, এখনই বেরোনো উচিত, জগদীশ অপেক্ষা করবে। একটা গুরু দায়িত্ব নিয়ে হেলাফেলা করা ঠিক নয়। কলকাতা ছাড়ার আগের দিন সন্ধেবেলায়, অফিসে, সহযোগী সম্পাদক শঙ্কর গুপ্ত বলেছিল, আমার মনে হচ্ছে, এটা কোনো মামুলি রোগ নয়, এ রোগের পেছনে কোনো রহস্যময়, গোপন কারণ আছে। সেটা খুঁজে বার করতে পারলে তোমার সুনাম হবে।

শঙ্কর গুপ্তের কথাগুলো মনে হতে বুকের গভীরে দায়িত্ববোধ রিনরিন করলেও বিছানা ছেড়ে সৃজন উঠতে পারল না। পাশের বিছানায় কমলও ঘুমোচ্ছে। সৃজনও আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিক্রমের ডাকাডাকিতে এগারোটা নাগাদ সৃজনের ঘুম ভেঙেছিল। সৃজন বিছানার ওপর উঠে বসতে বিক্রম বলেছিল, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে। কালিঝোড়ায় যাচ্ছি। তোদের জন্যেই প্রোগ্রামটা করলাম। ওখানকার ডাকাবাংলোয় দুপুরের লাঞ্চ সেরে সন্ধের আগেই শিলিগুড়ি ফিরে আসবো।

কথাটা শেষ করে কমলের খালি বিছানার দিকে তাকিয়ে বিক্রম প্রশ্ন করেছিল, কমল কোথায়?

চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে দিনের রুম্‌বেয়ারা দ্বিজনাথ ঘরে ঢুকল। চায়ের হুকুম বিক্রমই দিয়ে এসেছিল। টেবিলের ওপর দুটো কাপ, চায়ের পট, চিনি, দুধ নামিয়ে রেখে দ্বিজনাথ জানাল, ঘণ্টাখানেক আগে কমল বেরিয়েছে, ফিরতে দুপুর বারোটা, একটা হবে, কোথায় যাবে বলেনি।

চানটান করে সৃজন তৈরী হওয়ার পরও কমল না ফেরায় সৃজনকে নিয়েই বিক্রম গাড়ীতে স্টার্ট দিল। আজ যে কোনো কাজ হবে না, চলন্ত গাড়ীতে বসে এটা ভেবে সৃজনের মনে তীব্র অনুতাপ হয়েছিল। কিন্তু কালিঝোরার রূপ, রঙ, সৃজনের মনের সব গ্লানি, অনুতাপ মুছে দিয়েছিল। শেষ বিকেলে কালিঝোরা থেকে হোটেলে ফিরে সৃজন দেখল, বিছানায় শুয়ে কমল পা নাচাচ্ছে। কমলকে দেখে সৃজন বলল, কালিঝোরা থেকে ঘুরে এলাম।

কমল কোনো কথা বলল না। সৃজন প্রশ্ন করেছিল, তুই কোথায় গিয়েছিলি?

হাসপাতালে, কমল জবাব দিয়েছিল, হাসপাতাল, ডাক্তার, রুগী, সকলের কিছু ছবি তুলে নিয়েছি। আমার কাজ মোটামুটি শেষ।

কমলের কথা শুনে সৃজনের মনে আবার অস্বস্তি অনুতাপ ঘন হয়ে উঠেছিল। তিস্তা নদী, বিস্তৃত, সবুজ অরণ্যভূমি, দুপুরের ভূরিভোজ, সারাদিনের বিনোদন, সবকিছু ভারী বিস্বাদ, তেঁতো হয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার সেন এক পেগ হুইস্কি নিলেন। কটা পেগ খেলেন, ডাক্তারের হিসেব নেই। রাঘব হিসেব করে মদ খাওয়া পছন্দ করে না। আজ দময়ন্তীর শাসনে সে খুব একটা বাড়াবাড়ি করতে পারছে না। আরো প্রায় আধঘণ্টা পরে দময়ন্তী বলল, আর নয়, এবার সকলে খেতে বসুন।

খাওয়ার আর কী বাকী আছে, বিক্রম বলল।

ডাক্তার বললেন, ভদ্রলোকেরা সবসময়ে তৃষ্ণার্ত থাকেন, তাঁদের খিদে পায় না।

রাত প্রায় একটার সময়ে বিক্রমের গাড়ীতে সৃজন আর কমল যখন হোটেলে ফিরল, তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিক্রম আজ তার ড্রাইভারকে আটকে দিয়েছিল। শব্দহীন, নিঝুম শহর। সৃজনের মাথার মধ্যে গভীর কুয়াশা, চারপাশ কাঁপছে। কমল আজ অনেক চটপটে, স্বাভাবিক। বিক্রমের গাড়ী থেকে নেমে কমল বলল, কাল কলকাতায় ফিরবো, আমার কাজ শেষ।

সৃজন বলল, আর একদিন। কাল একটা গাড়ী ভাড়া করে মালদা, বীরভূম ঘুরে পরশু কলকাতায় যাব।

দেরী হয়ে যাবে না, একটু অবাক হয়ে কমল প্রশ্ন করল।

দেরী হলেও উপায় নেই, জড়ানো গলায় সৃজন বলল।

অনেক রাত। হোটেলের রিসেপশনে একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে। কাউণ্টার আগলে কে যেন জেগে বসে আছে। রিসেপশনের সামনে সৃজন আসতে কাউণ্টারে বসা জগদীশ গোলাপী রঙের ভাঁজ করা একটা কাগজ সৃজনকে এগিয়ে দিল। সৃজন দেখল, টেলিগ্রাম, কলকাতা থেকে এসেছে।

টেলিগ্রাম দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল সৃজনের বুক। ভাঁজ করা কাগজটা খুলে টাইপ করা টেলিগ্রামের ওপর সৃজন চোখ রাখল। আবছা আলোয় ইংরিজী হরফে লেখা খবরটা তার মাথায় দ্রুত অনূদিত হয়ে গেল, বালকের প্রবল জ্বর, গায়ে ব্যথা, তড়কা, আরো সব অদ্ভুত দৈহিক পরিবর্তন, ডাক্তার অসহায়, তাড়াতাড়ি এসো, নন্দিনী।

অন্ধকারে বৃষ্টির শব্দ। সৃজন আর দাঁড়াতে পারছে না। কমলও টেলিগ্রামটা পড়েছিল। সৃজনকে প্রায় আগলে কমল দাঁড়িয়ে আছে। সৃজনের মনে হলো, প্রতিবেদন লেখার জন্যে কাল সকালে গাড়ী নিয়ে তাকে আর দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না। সেই ভয়ংকর রোগটা কলকাতায় তার বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তার অমোঘ থাবা। বাড়ীতে মুমূর্ষু সন্তানের বিছানার পাশে বসে চাকরীজীবনের সবচেয়ে কঠিন, নিষ্ঠুর প্রতিবেনটা সৃজনকে লিখতে হবে। অজানা, ভয়ংকর রোগটার উৎস, কারণ খুঁজে বার না করা পর্যন্ত সৃজনের রেহাই নেই॥

অবলম্বন

হালচাল দেখে সৌগতর মতো যুক্তিবাদী ছেলেও কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। তীর্থনারায়ণকে ঘিরে এক অলৌকিক, দৈবী পরিবেশ ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠছে। নানা বয়সী নারী, পুরুষ, তারা সকলেই তীর্থনারায়ণের ভক্ত, দলে দলে ঘরে ঢুকে তীর্থনারায়ণের পায়ে লুটিয়ে পড়ছে। গেরুয়া পাঞ্জাবি আর কোরা ধুতি পরা, বলিষ্ঠ, ঋজু শরীর, তীর্থনারায়ণ স্থির হয়ে একটা তক্তাপোষের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। মুখে গাম্ভীর্য এবং আবছা হাসি। তীর্থনারায়ণের আতুল পা দুটো ধরে কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, ভাবাবেগে চুমু খাচ্ছে কেউ। তীর্থনারায়ণের কোনো বিকার নেই, যেন এমনই হয়, এমনই হওয়া উচিত! এতো হাসি, কান্না, বিহ্বলতার মধ্যেও ভক্তদের সঙ্গে তীর্থনারায়ণ সহজভাবে কথা বলছেন। কথা মানে, কুশল প্রশ্ন, কেমন আছো? তোমার বাবা? ছেলে কোন ক্লাসে পড়ছে? চাষবাসের কি অবস্থা?

ঘরের সামনে লম্বা, টানা সিমেন্টের রক, তার সামনে উঠোন। রক আর উঠোনেও থিকথিক করছে মানুষ, তারা সকলেই তীর্থনারায়ণের ভক্ত। সাবেক আমলের একতলা, পুরোনো বাড়ী। রকের ওপর, গায়ে গায়ে পাঁচ, ছটা ঘর, ঘরের দেওয়ালগুলো পুরু, নোনাধরা, সবকটা ঘরই বেশ জীর্ণ, ভেতরটা অন্ধকার। সারাবছর বেশীরভাগ ঘর তালামারা, বন্ধ, মেলা আর উৎসবের জন্যে ঘরগুলো এখন মানুষজনে ভর্তি।

অন্ধকার ঘরে, তক্তাপোষের ওপর, তীর্থনারায়ণের পাশে বসে কী এক প্রহেলিকায় সৌগতর মাথাটা ছমছম করছিল, স্নায়ু, শিরায় এক বিস্মিত শিহরণ! তীর্থনারায়ণের যে এতো শিষ্য, এতো ক্ষমতা এবং প্রভাব, কলকাতা থেকে আসার সময়ে সৌগত ভাবতেও পারেনি। চেনাজানা, অতি সাধারণ তীর্থনারায়ণ হঠাৎ যেন এক লোকোত্তর মহামানব হয়ে উঠেছেন। অথচ, গত বুধবারই গড়পারের মহাকালী রেষ্টুরেন্টে সৌগতর পাশে বসে তীর্থনারায়ণ চা আর ওমলেট খেয়েছেন। শুধু বুধবার কেন, মহাকালী রেষ্টুরেন্টে গত বিশ, ত্রিশ বছর ধরে তীর্থনারায়ণের যাতায়াত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা না দিলেও দু'দশ মিনিট তীর্থনারায়ণ সেখানে বসেন, ওমলেট, চপ, চা খান, রেষ্টুরেন্টের সামনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানেন। শেষ বিকেলের ধূসর আলোয় ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা তীর্থনারায়ণকে, মাঝে মাঝে, খুব একা আর অসহায় মনে

হয়। দু-আঙুলের ফাঁকে জলন্ত সিগারেট, সেটা টানার কথা ভুলে শূন্য চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে তীর্থনারায়ণ কি যেন ভাবেন, সিগারেট দুআঙুলে পুড়ে যায়। সৌগত জানে, তীর্থনারায়ণের মাথায় অনেক দায়িত্ব, বাড়ীতে ঝামেলার শেষ নেই। তীর্থনারায়ণের ছোট ছেলেটা মৃগী রুগী, প্রায়ই বেহুঁশ হয়ে যায়। এক অবিবাহিতা, উন্মাদ বোন আছে বাড়ীতে। মাঝে মাঝে তার ক্যাপামি বাড়ে। তখন তার হৈচৈ, চীৎকার, গালমন্দ শুনে রাস্তার লোক চমকে ওঠে। আর আছে, তীর্থনারায়ণের বিধবা মা, পঙ্গু, শয্যাশায়ী। পারিবারিক সূত্রে তীর্থনারায়ণ এই ধর্মস্থানে সেবায়েত, বছরে একবার তিনি এখানে আসেন। এই একবারের রোজগারেই তাঁর রুটি, রুজি, ইত্যাদি, সারাবছর এই আয়েই তাঁর সংসার চলে।

মাঝবয়সী এক বৌ, তীর্থনারায়ণের পায়ের তলায় মুখ রেখে ফুলে ফুলে কাঁদছে। কী হলো তোমার, প্রশ্ন করলেন তীর্থনারায়ণ।

আমার বোবা ছেলেটার কী হবে দেবতা, বৌটা ডুকরে উঠল।

সোনালি ফ্রেমের রিমলেস্ চশমায় মোটা কাচের আড়ালে তীর্থনারায়ণের দুচোখে অসহায় দৃষ্টি, এক মুহূর্ত মাত্র।

তীর্থনারায়ণ বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আশীর্বাদ করো দেবতা।

কথাটা বলে পাশে বসা বছর দশেকের বোবা ছেলেটার নড়া ধরে সে তীর্থ-নারায়ণের পায়ের তলায় টেনে আনল। ছেলেটার মাথায় হাত রেখে তীর্থনারায়ণ চোখ বোজেন।

পৃথিবীতে একটা দিন শেষ হয়ে আসছে। ঘরের মধ্যে জমাট হচ্ছে অন্ধকার। অদূরে মেলাপ্রাঙ্গণ, সেখানে উড়ছে নানা কথা, শব্দ, বিকিকিনির গুঞ্জন। ঘরের জানলায় চোখ রেখে অনেক ভক্ত, অপলক, মুগ্ধ, তীর্থনারায়ণকে দেখে তাদের আশ যেন মিটছে না। ধুতি, শার্টপরা, বছর পঁয়ত্রিশের এক জোয়ান মানুষ ঘরে ঢুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল তীর্থনারায়ণকে। লোকটা নিচু গলায় কিছু বলতে তীর্থনারায়ণ বললেন, ডাকো।

পিসী, ও পিসী, বাইরের ভীড় লক্ষ্য করে লোকটা হাঁক দিল। ভীড় ঠেলে ঘরে ঢুকল, বছর পঞ্চাশের এক মহিলা, সঙ্গে একজন যুবতী বৌ। বিধবার চোখে, মুখে অভাব, ক্লান্তি, হতাশা, বৌটির মুখে লজ্জা আর সংকোচ। মাটিতে লুটিয়ে দুজনে প্রণাম করতে তীর্থনারায়ণ বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিধবা করুণ গলায় প্রশ্ন করল, এই হতভাগীর স্বামী কবে ফিরবে দেবতা? বিয়ের তিন বছর পরে ছেলে না হলে বৌয়ের কী দোষ? সময় তো চলে

যায়নি। রাগ করে বৌকে ছেড়ে স্বামী পালাবে? এ কোথায় মেয়ের বিয়ে দিলাম গো?

তীর্থনারায়ণের দুচোখে সেই পলকের অসহায়তা আবার ফুটে উঠল।

হে দেবতা, হতভাগীর কোল কবে ভরবে, মা প্রশ্ন করল।

ভরবে, তীর্থনারায়ণ বললেন, এখানে, মায়ের বাড়ীতে যখন এসে পড়েছো, আর ভয় নেই, সন্তানের দুঃখ না মিটিয়ে কী মায়ের উপায় আছে?

কথাটা বলে সৌগতর দিকে তাকিয়ে তীর্থনারায়ণ হাসলেন, গভীর, স্নিগ্ধ হাসি। লজ্জিত, বিহ্বল চোখে নিঃসন্তান বৌটি তাকিয়ে আছে তীর্থনারায়ণের দিকে। এবার সে তাকাল সৌগতর দিকে। মা এবং মেয়ের দুজোড়া চোখ সৌগতর মুখ থেকে একটা অমোঘ দৈববানী শোনার জন্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল। সৌগত কী বলবে? শ্যামবর্ণা মেয়েটির মুখশ্রী ভারী স্নিগ্ধ। তার দুটো আয়ত, গভীর চোখের ওপর চোখ পড়তে সৌগত কেঁপে উঠল।

এ আমার খুব প্রিয়জন, সৌগতকে দেখিয়ে তীর্থনারায়ণ বললেন, আমার ভাগনে, ওর মাকে আমি দিদি বলি।

উঠোনের ওপাশে ডালিমতলায় তখন সমবেত গলায় গান শুরু হয়েছে, সহজ সংগীত। হারমোনিয়াম, খোল, করতালের সঙ্গে গানের কথাগুলো শোনা যাচ্ছে,

> রসরাজ সহজ অতি সহজরূপে আসিয়ে
> বন্দিনী হইয়ে থেক মম হৃদয়ে
> লুকাইয়ে রাখিব হে তোমায়
> কখন যেন কেহ দেখিতে না পায়।

মেলার মাঠে ডায়নামোর ফটফট শব্দ শুরু হওয়ার কয়েক সেকেণ্ড পরেই ঘরের আলো জ্বলে উঠল। আলোর তেজ কম। তবু সে আলোতেই ঘরের সকলকে দেখা যাচ্ছে। কারো চোখে জল, কারো দৃষ্টি রহস্যময়, ভাবাবিষ্ট। ঘরের এক কোনে তীর্থনারায়ণের স্ত্রী আর মেয়ে তনু, নানা কাজে ব্যস্ত। প্রণামীর শাড়ী, পয়সা লোহার ট্রাঙ্কে ভরে রাখছে। ফল আর মিষ্টি জমেছে প্রচুর। কাঁচের প্লেট ভরে ফল আর মিষ্টি সৌগতর সামনে রেখে তনু বলল, খাও, জল দিচ্ছি।

এ্যাতো?

এ্যাতো কোথায়? খুব পারবে।

ডালিমতলায় একটানা কীর্তন চলেছে। ঘরের ভেতরে ভক্তদের আসা যাওয়ার বিরাম নেই। দক্ষিনা আর প্রণামীতে ঘরের একটা কোণ ভরে উঠছে। লালপেড়ে শাড়ি আর কোরা ধুতির পাহাড়, খুচরো পয়সার স্তুপ। তনু আর তার মা নিপুণ হাতে গুণে, গুছিয়ে রাখছে সব।

সেই কোন সকালে বাড়ী থেকে ভাত খেয়ে সৌগত বেরিয়েছিল। তারপর ট্রেনে, বাসে, পায়ে হেঁটে, এই গরমে এতোটা পথ আসতে তার বেশ ধকল গেছে। বিকেলেও চনমনে খিদে ছিল পেটে। তারপর তিন ঘণ্টা এই ঘরে বসে নানা জিনিষ দেখে খিদেটা একদম মরে গেছে। প্লেট থেকে তুলে সৌগত দুটো মিষ্টি খেল। মাথার মধ্যে বিরামহীন ভোঁ ভোঁ, তার যুক্তি, বুদ্ধি গুলিয়ে গেছে। সৌগতর মনে হচ্ছিল, যুক্তি, বুদ্ধি শেষ কথা নয়, তর্ক আর জ্ঞানের জগতের বাইরেও এক রহস্যময়, অলৌকিক জগৎ আছে। কী এক রুদ্ধ আবেগে সৌগতর বুক আলোড়িত, বুকফাটা কান্নায় তীর্থনারায়ণের পায়ে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। একটু আগে কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি এসেছেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম না করলেও দুহাত বুকের ওপর জুড়ে বিচারক অনেকক্ষণ হলো তীর্থনারায়ণের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ধুতি, পাঞ্জাবীপরা মাঝবয়সী দুই অধ্যাপক ঘরে ঢুকে পরপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল তীর্থনারায়ণকে। বিচারক আর অধ্যাপক দুজনকে খুব খাতির করে তীর্থনারায়ণ নিজের পাশে বসালেন।

সঙ্কোচে লজ্জায় সৌগত মাথা তুলতে পারছিল না। মনের মধ্যে কী এক গ্লানি আর পাপবোধ! জেনেশুনে সে যেন একটা মহা অপরাধ করে ফেলেছে। তীর্থনারায়ণ তাদের বহুদিনের প্রতিবেশী, মেজমামার বন্ধু, সেই সুবাদে মামা পারিবারিক বন্ধু, অথচ আজ পর্যন্ত একবারও, এমন কী বিজয়াদশমীর পরেও সৌগত প্রণাম করেনি তীর্থনারায়ণকে। অবশ্য কাকেই বা সে প্রণাম করে? বছর দু'তিন হলো, দশমীর পর, বাবা মাকে প্রণাম করা শুরু করেছে। তার আগে কাউকে, এমনকি মা, বাবাকেও প্রণাম করতো না। কেউ প্রশ্ন করলে সৌগত বেয়াড়াভাবে পাল্টা প্রশ্ন করতো, কাকে প্রণাম করবো? সেরকম একজন মানুষও দেখতে পাইনা।

বাইরের ঘরের ভীড়টা নড়ে উঠল। একটু ঠেলাঠেলি, চাপচাপির পর ভীড়ের মাঝখান দিয়ে সরু সিঁথির মতো একটা পথ তৈরী হলো। সৌগত দেখল, অল্পবয়সী এক বধূ, ধুলোমাখা ভিজে শাড়ী, কপাল কেটে রক্ত ঝরছে, সিঁথির তেল, সিঁদুর রক্তের সঙ্গে মিশে মেয়েটার মুখে মাখামাখি, মনে হচ্ছে কপাল ফেটে গেছে, দণ্ডী কেটে সেই রক্তাক্ত নারী এগিয়ে আসছে। তীর্থনারায়ণের পায়ের ওপর কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল এক বুড়ি। বলল, হে ঠাকুর, আমার ছেলেটাকে সারিয়ে দাও। বিয়ের পর মাত্তর দু'মাস না যেতেই ছেলেটা পাগল হয়ে গেল। সারাদিন হাটেমাঠে, শ্মশানে, ভাগাড়ে ঘুরে বেড়ায়। কতো রাতে বাড়ীও ফেরে না। এই একরত্তি বৌ নিয়ে ফাঁকা ভিটেতে আমি একা ভয়ে মরি। ছেলে নেই, মেয়ে নেই, আমি মরে গেলে এই বৌটার কী হবে?

দণ্ডী কেটে বুড়ীর পুত্রবধূ ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। আবছা আলোয় মেয়েটার চোখ দুটো দেখে সৌগতর মনে হলো, মেয়েটা যেন সম্মোহিত, কী এক মন্ত্রে বিভোর হয়ে আছে!

তীর্থনারায়ণ বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর দুচোখ বুজে কী যেন ভাবতে লাগলেন। মাটিতে লুটিয়ে বুড়ি কাঁদছে। মড়ার মতো পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দণ্ডীকাটা পুত্রবধূ।

ডালিমতলা থেকে ভেসে আসে গানের কলি, আমার জন্মের অনেক আগে আমার বাপ হইলো গর্ভবতী!

অন্ধকারে ধ্বনি উঠল, হরি....হরি....হরি।

অবাক চোখে সকলে দেখছে তীর্থনারায়ণকে। তীর্থনারায়ণের পায়ের তলায় এক অসহায়, গ্রাম্য বধূ, বয়স, আঠারো উনিশের বেশী নয়। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ভিজে শাড়ী ঢাকা পুষ্ট নিতম্ব, নিতম্বের ওপরে পিঠ ওঠানামা করছে। পুত্রবধূর রক্তমাখা ভিজে শরীরের পাশে শাশুড়ি বসে আছে। সৌগত ভাবে, এখনি হয়তো তীর্থনারায়ণের মাথার চারপাশে এক জ্যোতির্বলয়, মহাপুরুষদের যেমন হয়, জেগে উঠবে। কিন্তু এমন একজন মহাপুরুষ হাতের কাছে থাকতেও সৌগত এতোদিন চিনতে পারেনি। ছাইচাপা আগুনের ছাইটুকুই সে দেখেছে। সে একটা আস্তো গাড়োল, আহাম্মক। কলকাতার আটপৌরে, সংসারী তীর্থনারায়ণও যে অলৌকিক ক্ষমতাবান একজন মহাপুরুষ হতে পারে, তারও যে অনেক গুণ আর মহিমা থাকতে পারে, এটা সৌগত ধরতে পারেনি। নিজের বোকামির জন্যে সৌগতর আপশোষ হয়, মনে অনুশোচনা জাগে। তীর্থনারায়ণের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে তার বলতে ইচ্ছে করে, তীর্থমামা মাপ করো, কৃপা করো আমাকে।

তক্তাপোষ ছেড়ে সৌগত একসময় চুপচাপ উঠে দাঁড়ায়। আকাশের নিচে, খোলা জায়গায় গিয়ে সে সবকিছু খতিয়ে ভাবতে চায়।

বাড়ীর উঠোন আর ডালিমতলা পেরিয়ে মেলার মাঠে এসে সৌগত বুক ভরে শ্বাস টানল। এখানেও ভীড়, মানুষের মিছিল, সারিসারি দোকান, হাওয়ায় মিষ্টি, মণ্ডা আর তেলেভাজার গন্ধ। হ্যাজাকের আলোয় ঝিলমিল করছে দোকানের রঙীন কাচের চুড়ি। মেলার বাইরে এসে হিমসাগরের বাঁধানো ঘাটে সৌগত বসল। হিমসাগর একটা ছোট দীঘি, দীঘির জলের দৈবশক্তি, এখানে স্নান করলে মানুষের সব মনস্কামনা পূর্ণ হয়। অন্ধ, কালা, বোবা, নুলোরাও সহজ স্বাভাবিক মানুষের মতো হয়ে ওঠে। দীঘির তিন দিকে খোলা মাঠ, মাঠের মধ্যে আম, কাঁঠালের গাছ, তিনদিকের খোলা মাঠের ঘন অন্ধকারে দপদপ করে আগুন জ্বলছে। আগুনগুলো আসলে কাঠের চুলো, প্রতিটা চুলোর পাশে একটা করে ছাউনি পড়েছে। এসব ছাউনিতে আছে মায়ের ভক্ত,

শিষ্যের দল। গত দু'তিন দিন ধরে তারা সপরিবারে এখানে বাস করছে। ভক্তদের সকলেই ধনী ব্যবসায়ী, বিত্তবান, অভিজাত মানুষ, পাশাপাশি আছে দেহোপজীবিনীর দল। জ্বলন্ত উনুনের পাশে মানুষের আবছা মূর্তি, ফিসফাস কথার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

হিমসাগরের জলে অনেকে স্নানে নেমেছে। ঘাটে রাখা হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোয় তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে, দীঘির কালো জলে মানুষের ঘাই তোলার শব্দ। ঘাটের কাছের জল, এরমধ্যে বেশ ঘোলা দেখাচ্ছে। ঠাণ্ডা, সিরসিরে হাওয়া বইছিল। মাথায় হাওয়া লাগতে সৌগত একটু সুস্থ বোধ করল।

শেষ দুপুরে, মাথার ওপর যখন দাউদাউ সূর্য, মাঠের খররোদে চারপাশ ঝলসে যাচ্ছে, ঠিক তখন, মেলার মাঠের বাইরে সৌগত এসে পৌঁচেছিল। তারপর অনেকটা সময় গড়িয়ে গেছে। সৌগতর এখন মনে হচ্ছে, তার যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান, সব কিছু ভীষণ পলকা, টলমল করছে পুরুষকার, যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। সে বড়ো একা, অসহায়। তারও একটা আশ্রয় দরকার। আশ্রয় মানে ঘর, সংসার, চাকরী নয়, একটা অবলম্বন, বিশ্বাস করার মতো একটা মূর্তি, বেদী বা পীঠস্থান, যা সে অন্ধের মতো আঁকড়ে ধরতে পারে। আঁকড়ে ধরার একটা কিছু না থাকলে মানুষ বড়ো দুর্বিনীত, অবাধ্য হয়ে ওঠে। বারবার আগুনে হাত দেয়। সারা শরীরে পোড়ার চিহ্ন, ক্ষত আর ঘা নিয়ে সৌগত ভাবে, এতোদিনে একটা আশ্রয়ের হদিশ মিলেছে। আর ভুল হবে না। তীর্থনারায়ণের মুখটা মনে পড়তেই সৌগতর ভেতর থেকে কে যেন বলল, তুমি হেরে যেতে চাইছো, তোমার দম ফুরিয়ে গেছে। এতোদিন জ্ঞান এবং যুক্তির পথে থেকে এবার তুমি নতজানু হবে। এটাই হয়। জ্ঞান এবং যুক্তির রাস্তা ধরে শেষ পর্যন্ত দৌড়োতে অনেক সাহস আর কলিজার জোর দরকার। সাহসী, জ্ঞানী মানুষই সে পথে শেষ পর্যন্ত যাওয়ার অধিকার পায়। সে পথ বড়ো দুঃখের, দুর্গম আর কঠিন।

ঘাটে মানুষজন আসছে, কেউ বসছে, স্নান সেরে চলে যাচ্ছে কেউ। মনের আচ্ছন্ন ভাবটা কাটাবার জন্যে, যুক্তি বনাম ভাবাবেগের বিতর্ক নিয়ে সৌগত একটা শব্দহীন আলোচনা চালাচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে সৌগত সিদ্ধান্ত করল, যে, এই মেলায় সে একা হলেও হাজার হাজার মানুষের কুসংস্কারের চেয়ে তার যুক্তি এবং জ্ঞানের জোর অনেক বেশী। বিজ্ঞাপন, প্রচার আর জয়ধ্বনি শুনে সে যুক্তিকে ভাসিয়ে দেবে না।

চোখ তুলে সৌগত দেখল, আকাশে একটা ঢাউস চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় ঝিকিক ফুটছে চারপাশে। অন্ধকার মাঠ, গাছপালা, হিমসাগরের মানুষগুলো

ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পিঠের ঠিক ওপরে, ঘাড়ের কাছে অনেকক্ষন, একটা তির তির অনুভূতি, পেছন থেকে কে যেন লক্ষ্য করছে, নিমেষহীন চোখে তাকে দেখছে, পেছনে না তাকিয়েও সে বায়বীয় দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা সৌগত টের পাচ্ছিল। ঘাড় ফেরাতেই সৌগত তাদের দেখতে পেল, মা আর মেয়ে, সন্তানহীনা সেই মেয়েটি, যার স্বামী নিখোঁজ, পাশে মা, ঘাটের শান বাঁধানো চাতালের ওপর দুজনে বসে আছে। মেলার চারপাশ একটু ঘুরে ফিরে দেখার জন্যে সৌগত উঠে দাঁড়াল। তীর্থনারায়ণের ডেরায় আবার ফিরতে হবে। সেখানেই সে খাবে, রাতে থাকবে। করুণ, ব্যগ্র চোখে মেয়েটি দেখছে সৌগতকে। তাদের পাশ দিয়েই সৌগতকে যেতে হবে। সিঁড়ি ভেঙে কাছাকাছি আসতেই মেয়েটির শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, প্রত্যাশার বিদ্যুৎ। ভাগ্যহীনা মেয়েটি যেন নিঃশব্দে সৌগতর করুণা চাইছে। তাড়াতাড়ি তাদের পাশ কাটিয়ে সৌগত ঘাটের বাইরে এসে দাঁড়াল।

ঘাট ছেড়ে সামান্য দূরে হিমসাগরের পাড় জুড়েও বেশ ভীড়। ঘাটের বাইরেও বহু লোক স্নান করছে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারপাশ, অথচ জলের রঙ কালো। কুটকুটে কালো রঙের জলে মানুষ ডুব দিচ্ছে, মুখে জল ভরে কুলকুচো করছে। সামান্য দূরে একগলা জলে বছর দশ, বারোর একটা ছেলেকে কয়েকজন যুবক বেকসুর চোবাচ্ছে। হ্যারিকেনের আবছা আলোয় সেই কিশোরটির অসহায়, করুণ মুখটা সৌগত দেখতে পেল। সেই বোবা ছেলেটা, আজই বিকেলে একে মায়ের সঙ্গে তীর্থনারায়ণের ঘরে সৌগত দেখেছে। কিন্তু ছেলেটার মা কোথায়? একটু নজর চালিয়েই সৌগত খুঁজে পেল মাকে। বোবা ছেলের ওপর অমানুষিক, নিষ্ঠুর পীড়ন না দেখার জন্যে দীঘির উল্টো দিকে মুখ করে মা দাঁড়িয়ে আছে। বোবা ছেলেটা হঠাৎ গোঙাতে শুরু করল। হাতের বেতটা ছেলেটার সামনে নাচাতে নাচাতে যুবকদের একজন বলল, মা বল, মা বল।

বেত হাতে সঙ্গীর দিকে বোবা ছেলেটা এমনভাবে তাকাল যেন, এ পৃথিবীতে পথ ভুলে সে চলে এসেছে। অদ্ভুত পৃথিবী, এখানকার কিছুই সে জানে না, চেনে না। দীঘির তলা থেকে আলকাতরার মতো একদলা পাঁক তুলে ছেলেটার মুখে গুঁজে দিল একজন। খা, খা, প্রায় গলা টিপে বোবা ছেলেটাকে পাঁক গেলাতে সে চেষ্টা করছে। এই পাঁকও অলৌকিক, খেলে বোবার মুখে ভাষা ফুটবে।

সৌগতর হৃৎপিণ্ড কুঁকড়ে ওঠে। মুখে আঁচল চেপে মা ফুলেফুলে কাঁদছে। বোবা ছেলেটাকে একবার মা বলাবার জন্যে বাক্যশিক্ষকদের একজন বেত চালাচ্ছে। কলে পড়া জন্তুর মতো ছেলেটা গোঙাচ্ছে, আর অবোধ চোখে

পাড়ের দিকে তাকিয়ে মাকে খুঁজছে। পারদের মতো থকথকে পঙ্কিল জলে চাঁদের আলো পড়েছে। এই গোঙানি, নির্যাতন সৌগতর সহ্য হলো না, সে সরে গেল। হঠাৎ তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে কে যেন প্রণাম করল। একজন নয়, পরপর দু'জন। সামনে একটা ঝাঁকড়া আমগাছ, তলায় ছায়া পড়েছে। চাঁদের আলোয় গাছের দশাসই ছায়া। গাছের ওপর পাখিরা ডাকাডাকি করছে। সৌগত দেখল, সেই মা আর নিঃসন্তান মেয়ে, দুজনেই তার পায়ের কাছে লুটিয়ে আছে। সৌগত বিব্রত, দু'পা পিছিয়ে গেল। মেয়েটি মুখ তুলে তাকাতে সৌগত দেখল, মেয়েটির দুচোখে জল, সে কাঁদছে। বুকে দুহাত জুড়ে মা বলল, হে ঠাকুর, আমার মেয়েকে একটু দয়া করো।

আমি ঠাকুর নই, সৌগত জানাল।

একটু আগেই তক্তাপোষে দেবতার পাশে তুমি বসেছিলে, আমাদের চিনতে ভুল হয়নি। তাছাড়া গত দু'রাত আমার মেয়ে স্বপ্নে তোমাকে দেখেছে।

সে কী, সৌগত চমকে উঠল।

হ্যাঁ ঠাকুর, মায়ের পুজো দেবে বলে, বাড়ী ছাড়ার পর, আজ তিনদিন, দু'রাত হলো আমার মেয়ে উপোস করে আছে, দাঁতে কুটো কাটে নি। কাল জালিমতলায় মায়ের পুজো দিয়ে ও জল খাবে। দেবতা তুমি ওকে দয়া করো।

অন্ধকার মাঠ দিয়ে দু'চারজন মানুষ যাতায়াত করছে। তারা ঘুরে দেখছে সৌগতকে। বেশ ঘাবড়ে গিয়ে সৌগত বলল, খালি পেটে থাকার জন্যেই আপনার মেয়ে আবোলতাবোল স্বপ্ন দেখেছে। ওকে এখনি কিছু খেতে দিন। আর না দাঁড়িয়ে হনহন করে সৌগত মেলার দিকে চলে এলো। জলে ভেজা ডাগর চোখে মেয়েটা যে তাকে এখনও দেখছে, সৌগত বুঝতে পারে। ঘুরে-ঘুরে মেলা দেখে রাতের খাওয়া সেরে, সৌগতর বিছানায় যেতে রাত বারোটা, সওয়া বারোটা বাজল। তণু খুব যত্ন করে লুচি, তরকারি, ক্ষীর দিয়ে রাতের খাবার সাজিয়ে দিয়েছিল। তীর্থনারায়ণের ঘরে, পাশাপাশি, দুটো সিঙ্গল-খাটে, তীর্থনারায়ণ আর সৌগতর শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। ব্যবস্থা স্বয়ং তীর্থ-নারায়ণই করেছিলেন। দোতালার ওপর এই একটাই ঘর। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনে একচিলতে বারান্দা, তারপর ঘর, ঘরের পেছনে অনেকটা ছাত, ন্যাড়া, পাঁচিল নেই।

সৌগত খুব ক্লান্ত. ঘুমে জড়িয়ে আসছিল দুচোখ। কিন্তু ঘরে পা দিয়ে, ঘরের চেহারা দেখে, সৌগতর ঘুম ছুটে গেল। ফুল, মালা, চালচিত্র আর নানা রঙের কাগজের শিকলে ঘরটাকে মন্দিরের মতো সাজানো হয়েছে। তখনো সাজানো শেষ হয়নি। রঙীন কাগজ আর কাঁচি নিয়ে কাজ চলেছে। পাগুলা,

রঙীন কাগজ কাঁচিতে কেটে কিছু ইঙ্গিতময় হরফ ফুটিয়ে' তোলা হয়েছে। সৌগত পড়ল, একটা কাগজে লেখা, যুগদেবতা, ঘরে বসে কী ভাবছো ?'

ঘরের মধ্যে ষাট পাওয়ারের আলো জলছে। এই আলো আজ নিশ্চয়ই সারারাত জলবে। বালিশে মাথা রেখে তীর্থনারায়ণ শুয়ে আছেন। দুচোখ বোজা. জেগে না ঘুমিয়ে বোঝা যাচ্ছে না। দু'জন লোক খুব সতর্কভাবে, সযত্নে, ধীরে ধীরে তীর্থনারায়ণের পা টিপছে। দেখেই বোঝা যায়, লোক দু'জন তীর্থনারায়ণের ভক্ত, শিষ্য। ঘরের দরজায়, বারান্দার দিকের খোলা জানলার গরাদের বাইরে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ, তীর্থনারায়ণকে এক পলক দেখার জন্যে তারা আসছে আর যাচ্ছে। এতো মানুষের দৃষ্টি, চাপা কথা, হাঁটাচলার শব্দের মধ্যে কীভাবে যে ঘুমোবে সৌগত ভেবে পেল না। সারারাত এই চলবে, দর্শনার্থীরা আসবে, তারা শুধু তীর্থনারায়ণ নয়, সৌগতকেও দেখবে। তীর্থনারায়ণের পা টিপতে টিপতে একজন লোক অঝোরে কাঁদছে। দ্বিতীয় জনেরও ছলছল করছে দুচোখ। আবার সেই সম্মোহন আর ভাবাবেগ কুয়াশার মতো ধীরে ধীরে সৌগতর মাথায় জমতে থাকে। পাশের খাটে শোয়া, রক্ত-মাংসের তীর্থনারায়ণকে অচেনা, অলৌকিক লাগে। বাইরের দরজা, জানলায় ভীড় যতো বাড়ে, এক অজাগতিক কুহক ততো বেশী সৌগতকে আচ্ছন্ন করে। আবছা তন্দ্রা আসে আর ছুটে যায়। ঘরে এবং বাইরে মানুষের আসা যাওয়া চলতেই থাকে। খোলা জানলার পাশে হঠাৎ সেই দুটো মুখ, মা আর মেয়েকে দেখে সৌগত চমকে উঠল। মায়ের পেছনে মেয়ে, দুজনের চোখেই জল, মা কাঁদছে তীর্থনারায়ণকে দেখে, আর সৌগতর দিকে তাকিয়ে মেয়ের চোখে অঝোর ধারা। দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে সৌগত শুয়ে থাকল। চোখ খুলতে সাহস হলো না।

রাত প্রায় দুটোর সময় কী এক কোলাহলে হাঠা' ঘুম ভেঙে সৌগত জেগে ওঠে। চারপাশে কাঁসর ঘণ্টা, শাঁখ বাজছে। ঢাক ঢোলের শব্দ ছাপিয়ে জেগে উঠছে হুলুধ্বনি, পূর্ণিমা পড়ল। পাশের বিছানায় তীর্থনারায়ণ অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। পদসেবা করতে করতে তীর্থনারায়ণের পায়ের ওপর মাথা রেখে এক ভক্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। আর একজন নেই, হয়তো কোনো কাজে বাইরে গেছে। বাইরের দরজা, জানলায় এখনো দু'চারজন দর্শনার্থী যাতায়াত করছে। সৌগতর ঘুম ছুটে গেল, বালিসে মুখ গুঁজে সে ভাবছে তীর্থনারায়ণের কথা। কেন এই লোকটার পায়ে এতো মানুষ লুটিয়ে পড়ছে ? সবটাই কী অন্ধভক্তি, কুসংস্কার ? চারপাশে অসংখ্য সাধু, সন্ন্যাসী, সর্বত্যাগী মহারাজদের সকলের তো এতো সম্মান, জনপ্রিয়তা, আকর্ষণ নেই। অথচ এই সরল, সাধারণ, গৃহী তীর্থনারায়ণকে ঘিরে এতো ভীড় কেন ? কীভাবে তীর্থনারায়ণ এই জনতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করল ? আছে, কিছু একটা আছে। সেটা

কী? সৌগতর কপালের দুপাশ দপদপ করতে থাকে। ঘিলুর ভেতর চিড়বিড় জ্বালা।' বিছানা ছেড়ে সৌগত ছাদে এসে দাঁড়াল। অন্ধকার, ফাঁকা ছাত। পূর্ণিমার চাঁদ পুবআকাশে সরে গেছে। ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টার আওয়াজ থেমে গিয়ে চারপাশ মৌন, নীরব। একটা আশ্রয়, অবলম্বনের কথা সৌগতর আবার মনে পড়ল। গভীর চিন্তায় বুঁদ হয়ে অন্ধকার ছাতে সৌগত দাঁড়িয়ে থাকে। কে একজন পাশে এসে দাঁড়াতে সৌগত সজাগ হ'লো। দেখল, তীর্থনারায়ণ। তীর্থনারায়ণ একা, সঙ্গে কোনো ভক্ত বা সেবক নেই। গেরুয়া পাঞ্জাবি আর কোরা ধুতি পরা মানুষটার মুখে চাঁদের আলো পড়েছে। সৌগত দেখল, চশমার কাঁচের আড়ালে তীর্থনারায়ণের দুচোখে জল, তীর্থনারায়ণ কাঁদছে। এক মুহূর্ত অবাক চোখে তীর্থনারায়ণকে দেখে সৌগত চোখ ঘুরিয়ে নিল।

চাপা গলায় তীর্থনারায়ণ বলল, বাড়ির কথা ভেবে ভারী অস্থির লাগছে। ছোট ছেলেটার শরীর ভালো নেই। বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ও দেখে এসেছি তার খুব জ্বর। কতো ডাক্তার দেখল, বিস্তর ওষুধ, ইঞ্জেকশন হ'লো, তবু ছেলেটা সারছে না। বোনটাও আবার ক্ষেপে উঠেছে। গরম পড়লেই তার ক্ষ্যাপামি বাড়ে। কী যে করি।

অসহায়, ভিজে চোখে তীর্থনারায়ণ তাকাল সৌগতর দিকে। তীর্থনারায়ণের চোখ দুটো দেখে ধক করে উঠল সৌগতর বুক। এতো সেই একই দৃষ্টি! বিকেল থেকে দেখা কয়েক হাজার আর্ত, আতুর মানুষের মতো তীর্থনারায়ণও আঁকড়ে ধরতে চাইছে সৌগতকে, যে তীর্থনারায়ণের সামান্য করুণা পাওয়ার জন্যে সকলে ব্যাকুল, সেই মানুষই সৌগতর করুণা চাইছে।

রক্তমাংসের তীর্থনারায়ণকে চিনে নিতে সৌগতর আর অসুবিধে হলো না ॥

জেলখানা থেকে মাকে

কবিকে বাদ দিয়ে বিপ্লব হবে না

মা,

গত দু'বছরের বন্দীজীবনে জেলখানা থেকে তোমাকে এই প্রথম আমার চিঠি লেখা, চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই তুমি খুব অবাক হবে, ভাববে, এতোদিনে তাহলে মিলুর সুমতি হয়েছে ! গত দু'বছরে চিঠি লেখার জন্যে তোমার শত অনুরোধ, বারবার আমি উপেক্ষা করেছি। প্রথম প্রথম বলতাম, আমি লিখতে পারি না।

বছরখানেক পরে খোলাখুলি বললাম, চিঠি লেখায় আমি বিশ্বাস করি না, চিঠি লেখালিখি মধ্যবিত্ত ভাববিলাস, বিপ্লবী চেতনাকে দুর্বল করে।

আমি জানি, আমার কথা শুনে তুমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলে, উদ্বেগভরা তোমার দুচোখের ক্লান্ত, করুণ দৃষ্টি দেখেই তোমার মনের খবর আমি টের পেয়েছিলাম।

আমার জবাব শুনে তুমি নিশ্চুপ হয়ে যেতে। এটাই তোমার স্বভাব, যুক্তি নয়, তর্ক নয়, আঘাত পেলে এরকম বিপন্ন, গভীর চোখে একপলক তাকিয়ে তুমি নীরব হয়ে যাও। তোমার ওই দৃষ্টি, আমি ভয় পাই, ভুলতে পারি না। তবু নিজের বিশ্বাস এবং আদর্শে আমি অটল, অচল ছিলাম। গত দু'বছরে শুধু তোমাকে নয়, কাউকে একটা চিঠি লিখিনি। শুধু চিঠি লেখা নয়, গান, কবিতা এবং এই ধরণের আরো নানা বিষয়, যা মনকে নরম করে, উদাস, আতুর করে, আমি ভাবতাম, এখন সেগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। এখন, এই যুদ্ধক্ষেত্রে, যন্ত্রের মতো কঠিন, কঠোর, দুর্জয় থাকতে হবে।

নিজের আদর্শ, বিশ্বাসকে বাঁচানোর তাগিদের পাশাপাশি আমার মনের ভেতর আরো একটা ভয় ছিল। চিঠি লিখলেই এই জেলখানা এবং ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে এমন অনেক কথা এসে যাবে, যেগুলো নিষ্ঠুর, অমানবিক, যন্ত্রণা আর দুঃখ ভরা টসটসে, পাকা ঘায়ের মতো, সেগুলো পড়ে তুমি কষ্ট পাবে, চোখের জল ফেলবে, এটা আমি চাইনি। তাই আমি চিঠি না লেখায় তুমি কষ্ট পেয়েছো, আমাকে নির্দয়, নিষ্ঠুর ভেবেছো, হয়তো আমি তাই, তবু সেই

নিষ্ঠুরতার আড়ালে আরো একটা মানসিকতা কাজ করেছে, তা হলো, মায়ের প্রতি ছেলের ভালোবাসা, সত্যি মা, আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি।

জেল পালানোর ঘটনার পর থেকে গত তিনমাস, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। দুশ্চিন্তায়, উদ্বেগে তুমি যে কীরকম ছটফট করছো, তা আমি চোখে না দেখেও বুঝতে পারছি। জেলভাঙার ঘটনার পর কর্তৃপক্ষ সব রাজবন্দীর দেখাসাক্ষাৎ, ইন্টারভিউ, সেই যে বন্ধ করে দিয়েছে, তা আবার কবে চালু হবে, কবে ফের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বন্দীদের দেখা হবে, জেল-জীবন সহজ, স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, তা আমি জানি না। খুব তাড়াতাড়ি এমন কিছু যে ঘটবে, জেলের হালচাল দেখে তা মনে হয় না। যারা পালিয়েছিল, তাদের অনেকে ধরা পড়লেও এই জেলে তাদের আর আনেনি। কিন্তু এখানে গত তিনমাস, আমাদের, রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর, নিয়মিত হামলা চলছে। সকালে মাত্র একঘণ্টা স্নান ইত্যাদির জন্যে সেলের দরজা খোলা হয়, তারপর সারাদিন লক্‌আপ্, ছোট অন্ধকার সেলের মধ্যে, যেখানে, একজন থাকার কথা, এখন দুজন বা তিনজন থাকে, সারাদিন রাত আমরা আটক থাকি। সামান্য অজুহাতে লাঠিধারী ওয়ার্ডার আর সশস্ত্র সি. আর. পি, গত তিনমাসে আমাদের ওপর সাতবার হামলা করেছে। মেরে হাত পা ভেঙে দিয়েছে অনেকের। আমার কলেজের বন্ধু ত্রিদিবকে তো তুমি চেনো, দিন দশেক আগে বেয়োনেট খুঁচিয়ে তার গাল ফুটো করে দিয়েছে। আচমকা বেয়োনেটের খোঁচা খেয়ে প্রথমে ত্রিদিব কিছুই বুঝতে পারেনি। গালের ভেতর নোনতা স্বাদ পেয়ে জিভটা বুলোতে গিয়ে টের পেল যে, জিভের ডগাটা গালের ফুটো দিয়ে প্রায় কানের কাছে বেরিয়ে এসেছে। ত্রিদিব খুব সাহসী, এমন একটা আঘাত পেয়েও ঘাবড়ায়নি, পাশে দাঁড়ানো বিরাজকে বলেছিল, ভাগ্যিস, বুকটা ফুটো হয়ে যায়নি!

কিন্তু বেশিক্ষণ ত্রিদিব কথা বলার বা বিরাজ শোনার সুযোগ পায়নি। মাথায় লাঠির ঘা খেয়ে দুজনেই বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। ত্রিদিবের বিরুদ্ধে বেআইনী অস্ত্র রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগটা শুধু মিথ্যে নয়, হাস্যকর। নিজের ভাত খাওয়ার এ্যালুমিনিয়ামের থালার, ভাঙা কানার টুকরো দিয়ে ত্রিদিব একটা ছুরি বানিয়েছিল, ছোট্ট ভোঁতা ছুরি। মানুষ মারার জন্যে নয়, আম কাটার জন্যে ত্রিদিব ছুরিটা তৈরি করেছিল। আমাদের এগারো নম্বর ওয়ার্ডের সামনে একটা আম গাছ, এবছর আমের গুটিতে প্রায় ভেঙে পড়েছিল। সেই ফলন দেখেই ত্রিদিবের এই ছুরির পরিকল্পনা এবং দুর্গতি!

এখন কি হপ্তাতেই এক দু'বার আমাদের ত্রিশটা সেলে তল্লাশী হয়।

ত্রিশটা সেলের চুয়াত্তর জন বন্দীর দু'চারজনকে প্রায়ই ফাঁসির সেলের পাশে কনডেমনড সেলে সাত, দশদিন অকারণে কয়েদ করা হয়। নির্জন, নিঃসঙ্গ সেই কনডেমনড সেলে ইতিমধ্যে আমিও একদফা থেকে এসেছি। আমাদের সেলগুলোতে তল্লাশীর কোনো সময় নেই। সকাল, দুপুর, সন্ধে, যখনতখন একটা বিশাল বাহিনী, ওয়ার্ডের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। একতলা, দোতলার ত্রিশটা সেলের লোহার দরজা পরপর খুলে যায়, এলোপাথাড়ি তল্লাশী চলে। গোপন, নিষিদ্ধ কিছু পাওয়া যায় না বলেই যারা তল্লাশীতে আসে, তারা খুব রেগে যায়। বিছানা, বালিশ, বইখাতা ছড়িয়ে, ছিঁড়ে, তছনছ, লণ্ডভণ্ড করে দেয়। তারা চলে গেলে বিষন্ন, অন্ধকার সেলের মধ্যে দশ, বিশজন অজ্ঞান, আধমরা হয়ে পড়ে থাকে।

মা, আমি বুঝতে পারছি, যে এই চিঠি পড়ে তোমার বুকের মধ্যে তোলপাড় হবে, ছেলের অমঙ্গলের আশঙ্কায় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে তোমার, আতঙ্কে তুমি দুচোখ বুজে ফেলবে। কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আজ এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, যা শুনে তোমার বুক ভরে যাবে, মনে হবে নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও এ পৃথিবী ভারী সুন্দর, এখানে গান আছে, কবিতা আছে, এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার চেয়ে বড়ো আনন্দ আর কিছু নেই।

আজ দুপুরেও, ঠিক দুপুর নয়, শেষদুপুরে আমাদের ওয়ার্ডে তল্লাশী হয়েছে। একতলায় তিন নম্বর সেলে এখন আমি আর ধ্রুপদ থাকি।

ধ্রুপদকে তুমি জেল গেটে ইণ্টারভ্যুর সময় নিশ্চয়ই দেখেছো। আগে ধ্রুপদ ছিল দোতলার সতেরো নম্বর সেলে। জেল ভাঙার ঘটনার পর ওকে একতলায় আমার সেলে আনা হয়েছে। ইণ্টারভ্যুর সময়ে সহবন্দীদের অনেকের বিষয়ে তোমাকে বললেও ধ্রুপদের নাম কোনোদিন করিনি। আসলে, ধ্রুপদকে আমি খুব একটা পছন্দ করতাম না, উল্লেখযোগ্য বলেও তাকে মনে হয়নি কোনোদিন। শুধু আমি নই, এগারো নম্বর ওয়ার্ডের বেশির ভাগ বন্দীই ধ্রুপদকে পাত্তা দেয় না, তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। হাসাহাসি করার কারণ হল, ধ্রুপদ কবিতা লেখে, রোজ দু'চারখানা কবিতা না লিখলে ও ঘুমোতে পারে না। কিন্তু শুধু লিখে ওর শান্তি নেই, ও শ্রোতা খোঁজে। সকালবেলায় হাত, মুখ ধোয়া আর স্নানের জন্যে যে এক ঘণ্টা সময় লকআপের বাইরে থাকার সুযোগ মেলে, তার মধ্যেই দু'একজনকে ও কবিতা শুনিয়ে দেয়। ফলে আমাদের ওয়ার্ডের অনেকেই ওকে এড়িয়ে চলে, কেউ কেউ দূর থেকে ওকে দেখেই পালিয়ে যায়। যারা ঠোঁটকাটা, মুখের ওপর তারা ধ্রুপদকে অপমান করে।

অবহেলা, উদাসীনতা, অপমান, ধ্রুপদ কিন্তু কিছুই গায়ে মাখে না। কবিতা

শোনাবার জন্যে আবার কাউকে পাকড়াও করে। মাসখানেক আগে পৃথ্বীশ একবার মারতে গিয়েছিল ধ্রুপদকে। বলেছিল, আমার কানের কাছে ফের কবিতা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করলে তোকে পুঁতে ফেলবো।

কেমন যেন বিহ্বল চোখে পৃথ্বীশের মুখের দিকে ধ্রুপদ তাকিয়েছিল। কবিতার ওপর পৃথ্বীশের কেন যে এত রাগ, ধ্রুপদ বুঝতে পারেনি।

পৃথ্বীশ বলেছিল, কবিতা মানে ন্যাকামি, ছিঁচকাদুনি, মাতাল আর লম্পটেরা কবিতা লেখে।

মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছিল ধ্রুপদ। বারোটার পর খাওয়া দাওয়া শেষ হলে সেদিন নির্জন দুপুরে সেলের মধ্যে হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা, কবিতা ছাড়া বিপ্লব হবে কী করে?

- আমার দুচোখে তখন ঘুম, জড়ানো গলায় বললাম, এই মুহূর্তে কবিতার চেয়ে বিপ্লব অনেক বেশি জরুরি।

তাহলে কি আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দেবো, জানতে চেয়েছিল ধ্রুপদ।

আপাতত, আধো ঘুমের মধ্যে আমি বললাম, বিপ্লবের পর কবিতা লেখার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

চোখ না খুলেও ধ্রুপদের বিষণ্ণ, আর্ত দৃষ্টি আমি দেখতে পাচ্ছিলাম

কবিতা ছাড়াই বিপ্লব হয়ে যাবে?

ধ্রুপদ আবার প্রশ্নটা করাতে আমি বেশ বিরক্ত হয়ে জবাব না দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকলাম। একই ঘরে, ধ্রুপদের পাশাপাশি, দিনের পর দিন ওর কবিতার অত্যাচারে আমি জেরবার হচ্ছিলাম। রোজ পাঁচ, সাতটা কবিতা ও আমাকে শোনাতো। না শোনার চেষ্টা করে, অমনোযোগী থেকেও দু'চারটে লাইন, কিছু শব্দ, রূপকল্প কানে ঢুকে যেত, ঠেকাতে পারতাম না। শুনতাম আর ভয় পেতাম। যে কারণে আমি চিঠি লিখি না, সে কারণেই আমি গান আর কবিতা শোনার বিরোধী। গান, কবিতা হয়তো আমার ক্রোধ, তেজ আর প্রতিজ্ঞাকে কোমল, পেলব করে দেবে। কোমলতা আমিও চাই, তবে এখন নয়, বিপ্লবের পরে। পৃথ্বীশের মতো কবিদের মাতাল, লম্পট না ভাবলেও কবিদের অকেজো, অপদার্থ, আধপাগলের বেশি আমিও কিছু মনে করতাম না।

আজ দুপুরে হাল্কা ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখছিলাম, কাগজ কলম নিয়ে বন্ধ গরাদের বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ধ্রুপদ বসে আছে। আমার মুখ থেকে সেদিন কবিতাবিরোধী কথা শোনার জন্যে ধ্রুপদ তৈরি ছিল না। ওর ধারনা ছিল, কট্টর বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও শিল্প সাহিত্যের মর্যাদা আর গুরুত্ব আমি বুঝি। ধ্রুপদের মতো আমিও মনে করি, বিপ্লব আর কবিতা অবিচ্ছেদ্য, একাকার।

আমার মুখে অন্তকথা শুনে ধ্রুপদ আঘাত পেয়েছিল।

ধ্রুপদের মুখ দেখে আজ আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। পৃথিবীতে আর একটা দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। সেলের বন্ধ দরজার ওপাশে সিমেন্টের চাতালের ওপর ছায়া ঘনাচ্ছে। দুটো শালিকপাখি চাতালের ছায়ায় মিশে ডাকাডাকি করে কয়েক সেকেণ্ড পরেই ফুরুৎ করে উড়ে গেল। ধ্রুপদের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই যাতে ওর সঙ্গে চোখাচোখি না হয়, সেজন্যে আমি চোখ বুজে ফেলছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, একটা ঐতিহ্যময় সাম্যবাদী পরিবারের ছেলে হয়েও ধ্রুপদ এতো কবিতা পাগল কেন? ধ্রুপদের গোটা পরিবারটাই ভারতবর্ষের সাম্যবাদী আন্দোলনে নিজেদের উৎসর্গ করেছিল। হুগলী জেলার পার্টির নেতৃস্থানীয় ছিলেন ধ্রুপদের বাবা। আটচল্লিশ সালের সেই ভয়ংকর দিনগুলোতে শ্রমজীবী আন্দোলনের তিনি ছিলেন সংগঠক এবং পুরোধা। বেশ কয়েক বছর কারাবাস আর নির্যাতনের পরে, জেল থেকে যখন বেরোলেন, তখন তিনি প্রায় পঙ্গু, বিকলাঙ্গ। তবু সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রবাহ থেকে তিনি সরে যাননি। ধ্রুপদের মাও কমুনিস্ট আন্দোলনের কর্মী, নারী আন্দোলন করেছেন দীর্ঘদিন, এখনও প্রাদেশিক মহিলা সংগঠনের একজন নেত্রী। ধ্রুপদের ভাইবোনেরাও সাম্যবাদী আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন স্রোতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। শ্রীরামপুরে ধ্রুপদের বাড়িতে বছর পাঁচেক আগে আমি একবার গিয়েছিলাম। সেই প্রথম এবং শেষ। বাড়ির সকলের সঙ্গে সেদিন আমার আলাপ হয়েছিল। নোনাধরা, জীর্ণ, পুরোনো বাড়িটার ভেতরে পা দিয়েই ধ্রুপদদের সংসারের প্রকট অভাব আর দারিদ্র আমি টের পেয়েছিলাম। ধ্রুপদ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস. সির ছাত্র। ওর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে অবাক লেগেছিল, একবারও মনে হয়নি যে, গোটা পরিবার ভবিষ্যৎ স্বাচ্ছন্দের আশায় ধ্রুপদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বরং উল্টোটাই মনে হয়েছিল। ধ্রুপদের বাবা বলেছিলেন, মতে না মিললেও আমার ছেলে যদি পেশাদার বিপ্লবী হয়, আমি খুশি হব।

ধ্রুপদের মা বলেছিলেন, তোমাদের রাজনীতি যে ভুল, এবিষয়ে আমার সন্দেহ নেই, তবু আমি চাই, ধ্রুপদ শেষ পর্যন্ত লড়াই করুক, নিজের অভিজ্ঞতায় যাচাই করে নিক সত্যকে।

ধ্রুপদের ছোট চার ভাইবোনের মধ্যে তিনজনেই সমর্থন করেছিল ধ্রুপদকে। এক ভাই জড়বুদ্ধি, বছর পনের বয়স, সে হাঁ করে তাকিয়েছিল। দু কস বেয়ে লালা পড়ছিল তার। মোটা লাল চালের ভাত, পাতলা ছ্যাঁচড়ার ডাল আর শাকের তরকারি দিয়ে ভাইবোনসহ ধ্রুপদের সঙ্গে সেদিন দুপুরে ওদের বাড়িতেই আমি খেয়েছিলাম। তুমি জানো, এতো নিচু মানের খাবারে আমার অভ্যেস নেই, তবু ভারী তৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে সেদিন ভেবেছিলাম, এমন একটা বিপ্লবী পরিবারের ছেলে হওয়া মহা ভাগ্যের ব্যাপার!

কবিতার জন্যে ধ্রুপদ তখনও এরকম খ্যাপামি করতো। যে কোনো সভা সমিতির আগে বা পরে কবিতা পড়ার জন্যে ওর জেদাজেদি অনেকের কাছেই খারাপ লাগতো। কিন্তু ওকে দমাতে পারতো না কেউ। আমিও তখন কবিতার উৎকট বিরোধী ছিলাম না, কবিতা লেখায় ধ্রুপদকে উৎসাহ আর মদত দিতাম। একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অনেক সভাসমিতিতেই বক্তৃতা আর আলোচনার চেয়ে ধ্রুপদের কবিতা বেশি সমাদর পেতো। রাজনীতির জটিল আবহাওয়ায় সব সভাসমিতি একদিন বন্ধ হয়ে গেল। বলা যায়, আমরাই বন্ধ করে দিলাম। নতুন রাজনীতি, যা গোপন, বেআইনী, তার সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়লাম যে, সভাসমিতি, কবিতার কথা ভুলেই গেলাম। এই পর্বেও ধ্রুপদ আমাদের ছাড়েনি। কিন্তু আমরা যতো বেশি শিল্প, সাহিত্য, কবিতাবিদ্বেষী হয়ে উঠলাম, ধ্রুপদের কবিতাপ্রেম, ততো গাঢ়, গভীর আর আন্তরিক হ'লো। রোজ একটার জায়গায় পাঁচটা কবিতা লিখে সহকর্মী, বন্ধুদের শোনাবার জন্যেও ব্যাকুল হয়ে পড়তো। কেউ শুনতো, কেউ খেদিয়ে দিত। তা সত্ত্বেও কারো সঙ্গে দেখা হলেই ধ্রুপদ বলতো, একটা নতুন কবিতা লিখেছি, শুনবে ?

বছর দুয়েক আগে খতম সংক্রান্ত একটা গোপন, উত্তপ্ত, আলোচনা সভার শেষে ধ্রুপদ বলল, আমি একটা কবিতা পড়বো।

সভার সকলে ধ্রুপদের কথা শুনে হতবাক। দু'একজন এমন চোখে তাকিয়েছিল, যে আমার মনে হয়েছিল, তারা হয়তো এখনি ধ্রুপদকেই খতম করে দেবে।

সেই অসমাপ্ত বিতর্কসভার পর, আমার মাথাতেও দাউদাউ আগুন জ্বলছিল। বেজায় চটে গিয়েছিলাম ধ্রুপদের ওপর। তখন থেকেই ধ্রুপদ সম্পর্কে আমার বিরক্তি এবং অপছন্দ, একই সেলে পাশাপাশি থেকেও ধ্রুপদ আমার কাছে তাৎপর্যহীন, অপ্রাসঙ্গিক।

আজ দুপুরে বন্ধ লকআপের মধ্যে খবরের কাগজটা মুখের সামনে ধরে শুয়েছিলাম। কাগজটা সকালে পড়া হয়ে গেলেও ওটা তখন ঢালের কাজ করছিল। আমাকে কাগজ পড়তে দেখে ধ্রুপদ কবিতা শোনাতে চাইবে না, ওর কবিতার উৎপাত থেকে আমি রেহাই পাবো। দুচোখে ঘুম নামছিল ধীরে ধীরে। প্রথম শরতের দীর্ঘ, গুমোট দুপুর। কী একঘেঁয়ে আর ক্লান্তিকর। একগোছা কবিতা, আটটার কম নয়, হাত নিয়ে, নিজের কম্বলের বিছানার ওপর বসে কাটাকুটি, যোগবিয়োগ, সংশোধন করছিল ধ্রুপদ। খুশি, আনন্দ, বিষণ্ণতার নানা অভিব্যক্তি ফুটে উঠছিল তার মুখে। নিজের লেখা কবিতা পড়ে ও নিজেই মুগ্ধ, আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কবিতাগুলো সংশোধন করার ফাঁকে ফাঁকে আমার দিকে তাকিয়ে, আমি জেগে আছি কিনা, ধ্রুপদ যাচাই করছিল। ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হলেও জেলখানায় এখনও পর্যন্ত আমিই ধ্রুপদের ভদ্র শ্রোতা। ভদ্র মানে, কবিতার কড়া সমালোচক হলেও

কবিতা লেখার জন্যে আর পাঁচজন সহবন্দীর মতো অশ্লীল ভাষায় আমি কোনো-দিন ধ্রুপদকে গালাগাল করিনি। কবিতা নিয়ে ওর মাতামাতির সমালোচনা করেছি, সংযত, মার্জিত সমালোচনা। তাই জেলখানার এই ভয়ংকর, ক্ষিপ্ত, রক্তাক্ত পরিবেশের মধ্যে বন্ধুদের কাছে বারবার অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়েও, কোনঠাসা ধ্রুপদ আজও আমাকেই নতুন কবিতাগুলো শোনাবার কথা নিশ্চয়ই ভাবছিল। ওর চোখের দৃষ্টিতে সেই ভাবনা লক্ষ্য করেই আমি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে চাইছিলাম। সেলের ভেতর আবছা অন্ধকার, এক কোণে রাখা টিনের টুকরি থেকে ফিনাইলের গন্ধ মিশে যাচ্ছে সেলের বদ্ধ ভারি বাতাসে। এক ঝাঁক কালো মাছি মুখের উপর ভনভন করছে। চোখ বুজলেই কপাল, নাক ঠোঁটের ওপর দল বেঁধে বসছে। শরীরের অন্য সব জায়গার চেয়ে বসার জন্যে মাছিরা মানুষের মুখটাই বেশি পছন্দ করে। মাছিরা বোধ হয় সব মানুষকেই মরা মানুষ ভাবে। মাছিদের জ্বালাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই খবরের কাগজে মুখটা ঢেকে নিলাম। মাছিদের হাত থেকে রেহাই পেলেও ধ্রুপদ কিন্তু আমাকে ছাড়ল না। ওর ডাকে তন্দ্রার ঘোরটা কেটে গেল। ধ্রুপদ বলল, কয়েকটা নতুন কবিতা লিখেছি, শুনবে?

বলতে চাইলাম, তুমি গোল্লায় যাও, কিন্তু পারলাম না, বললাম পড়ো, আমি শুনছি।

ধ্রুপদ শুরু করল। খবরের কাগজে আমার মুখ ঢাকা। ওর কণ্ঠস্বর, কবিতার টুকরো শব্দ, আবছা ঘুমের মধ্যে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। কবিতা শোনার ইচ্ছে না থাকাতে অন্য কিছু ভাবনা যা কবিতাকে আড়াল করবে, আমি ভাবার চেষ্টা করছিলাম।

গত বছর, ঠিক এই সময়ে, একতলায় ১৩ নম্বর সেলে সিমেন্টের মেঝে খুঁড়ে আমরা একটা সাতফুট টানেল বানিয়ে ছিলাম। হিসেব মতো, আটনম্বর সেল থেকে রাস্তার দূরত্ব চল্লিশ ফুট। রাস্তার পাশেই খাল, লোকে বলে আদিগঙ্গা। একবার রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালে, কে আমাদের আটকায়? অনেক চেষ্টায় একটা শাবল আর একটা কোদাল জোগাড় করে টানেল তৈরির কাজ বেশ ভালোভাবেই এগোচ্ছিল। সতর্ক পাহারা রেখে, দিনের বেলায় পালা করে আমরা টানেল খুঁড়তাম। তখনও সারাদিন সেলে আটক রাখার হুকুম হয়নি। মাটি খোঁড়ার চেয়ে সে মাটি লুকিয়ে ফেলাটাই ছিল বেশি কঠিন। ডিউটি সিপাইয়ের চোখ এড়িয়ে সে মাটিও আমরা নিয়মিত নানাভাবে উধাও করে দিয়েছি। টানেলের মুখটা কম্বল দিয়ে আমরা ঢেকে রাখতাম। টানেল যত গভীর হচ্ছিল, আমাদের উত্তেজনা, রোমাঞ্চ, ভয় তত বাড়ছিল। অন্ধকার সেই টানেলে নেমে ইঁদুরের মতো নিঃশব্দে মাটি তোলার কাজে আমিও হাত লাগিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। জানাজানি হয়ে গেল। তারপর...?

'কেমন লাগল, দুটো কবিতা পড়ে ধ্রুপদ প্রশ্নটা করতে একটু চমকে উঠে আমি বললাম, ভালো।

ধ্রুপদের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আরো সাত, আটটা বাকি। সেলের বন্ধ লোহার ফটকের বাইরে চোখ পড়তে দেখলাম, ওয়ার্ডার কুঞ্জ নস্কর বেশ মন দিয়ে ধ্রুপদের কবিতা শুনছে।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে একটু লজ্জা পেয়েই কুঞ্জ বলল, ভারী সুন্দর।

খুশিতে ঝলসে ওঠা মুখে কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে ধ্রুপদ প্রশ্ন করল, আপনার ভালো লাগছে?

খু-উ-ব, কুঞ্জ জানাল। তারপর একটু সংকোচের সঙ্গে বলল, আমিও কবিতা লিখি, আপনার লেখার পাশে সেগুলো কিছুই নয়, তবু যদি একটু দেখে দ্যান, মানে, ভুল টুল শুধরে........।

কুঞ্জকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ধ্রুপদ বলল, কী আশ্চর্য, আপনিও কবি। নিশ্চয়ই পড়বো আপনার কবিতা।

কৃতজ্ঞতায় কুঞ্জ গলে গেল। তৃতীয় কবিতাটা ধ্রুপদ পড়তে শুরু করল। কুঞ্জর কবিতা শোনা, কবিতা লেখা এবং ধ্রুপদকে পড়ানোর ইচ্ছে, কোনোটাই আমার পছন্দ হল না। খবরের কাগজে মুখ ঢেকে বিষয়টা নিয়ে আমি ভাবতে থাকি। কি মতলব কুঞ্জর? জেলখানার পাহারাদার, বন্দী পেটানোই যার কাজ, তার সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক কি?

একটা করে কবিতা শেষ হতে ধ্রুপদ প্রশ্ন করছিল, কেমন হয়েছে?

নিরুত্তাপ গলায় আমি বলছিলাম, ভালো, অথবা মন্দ নয়।

শব্দহীন জেল, দুপুর শেষ হয়ে আসছে, একটু পরেই মনখারাপকরা এক ছায়া পৃথিবীতে নেমে আসবে। তন্দ্রায় আমার দুচোখ আবার বুজে আসছিল। ধ্রুপদের কবিতা নিয়ে কুঞ্জর দু'একটা প্রশংসাসূচক কথা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম।

সেলের বন্ধ লোহার গরাদটা হঠাৎ ঘড়ঘড শব্দে খুলে গেল। চমকে উঠে মুখের ওপর থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে দেখলাম, অনেকবার দেখা সেই হিংস্র, নিষ্ঠুর মুখগুলো, সেই সশস্ত্র তল্লাশীদল। নিমেষে বুঝে গেলাম, আজ অনেক দুর্ভোগ আছে। পাশাপাশি দু' তিনটে সেলের বন্ধ কপাট খুলে তখন তল্লাশী শুরু হয়ে গেছে। লাথি, চড়, কিলঘুঁসির সঙ্গে পাকা বেতের লাঠির আঘাতের আওয়াজ, আর্তগলার অসহায় যন্ত্রণার শব্দ ভেসে আসছে। বিশাল তল্লাশীবাহিনী, পাঁচ, সাতজন করে এক একটা সেলে ঢুকে পড়েছে। বিছানার ওপর কখন যেন আমি উঠে বসেছি। ভয়ার্ত, শীতল এক অনুভূতিতে আমার শরীর শক্ত হয়ে গেছে। ধ্রুপদের দিকে চোখ পড়তে বিস্ময়ে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। গেট খোলা, হৈচৈ, কান্না, কিছুই সে খেয়াল করে নি। কবিতায় সে মগ্ন, বুঁদ হয়ে সে স্বরচিত কবিতা পড়ছে। গেটের বাইরে,

ওয়ার্ডার কুঞ্জ, তার দুচোখে ধ্রুপদের জন্যে একরাশ সহানুভূতি, কিছু একটা বলার জন্যে কপালের দুপাশের দু'টো নীল শিরা ফুলে উঠেছে।

ধ্রুপদের আচরণে তল্লাশীদলের লোকেরা প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র! পরমুহূর্তেই তারা ভাবল, যে ধ্রুপদ অপমান করছে তাদের। তাই লাঠির প্রথম ঘা পড়ল ধ্রুপদের ঘাড়ে, দ্বিতীয়টা পড়ল তার মাথায়। আমি দেখলাম, ধ্রুপদের কপাল বেয়ে নামছে একঝলক রক্ত, কবিতার কাগজগুলো শক্ত মুঠোয় ও চেপে ধরল। এবার তাদের নজর পড়ল আমার দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি জ্ঞান হারালাম।

শেষ বিকেলের আলোয় পৃথিবী যখন ধূসর, এগার নম্বর ওয়ার্ডের বাইরে, গাছগুলোতে, ঘরে ফেরা পাখিদের তুমুল ডাকাডাকি, আমার তখন জ্ঞান হলো। মাথার ভেতরটা কেমন ঝাপসা, বাঁ পাশের দু'নম্বর সেলে কে যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে, সেলের মেঝেতে বালিশ, বইখাতা, জামা, গামছা এলোমেলো ছড়িয়ে আছে, আমার সব কথা মনে পড়ে গেল। তখনই পাশের কম্বলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ধ্রুপদ ধীরে ধীরে উঠে বসল। আমি বেহুঁশ হলেও আমার শরীর থেকে ধ্রুপদের মতো এত রক্ত বেরোয়নি। আমি দেখলাম, ধ্রুপদের কপাল, গলা, গেঞ্জির বুক, কবিতার পাণ্ডুলিপি রক্তে ভিজে গেছে। রক্তভেজা গেঞ্জির ওপর চোখ পড়তে ধ্রুপদ হাসল। তারপর মুঠোয় ধরা কবিতার কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল, আরো তিনটে কবিতা বাকি, পড়বো?

ধ্রুপদের প্রশ্নে, তার গলার নিস্পৃহ, শান্ত ভঙ্গিতে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একটু আগের নিষ্ঠুর আক্রমণ পেটাই, রক্ত…ও যেন ধুলোর কণার মতো টোকা মেরে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। পৃথিবীর কে.না শক্তিই ওকে আঘাত করতে পারে না। আমি বললাম, পড়ো।

ধ্রুপদ পড়তে লাগল, ওর কবিতার প্রতিটা লাইন, প্রতিটা শব্দ, গভীর, গম্ভীর মন্ত্রধ্বনির মতো আমার রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। খরায় জ্বলে যাওয়া রুক্ষ, তৃষ্ণার্ত মাটির ওপর এ যেন প্রথম বর্ষার বৃষ্টিপাত। শুকনো, কঠিন মাটি সোঁ সোঁ করে প্রত্যেকটি জলকণা শুষে নিচ্ছে। মারের যন্ত্রণা, কষ্ট মুছে গিয়ে শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে স্নিগ্ধ আবেশ আর প্রশান্তি। মা-ঠিক তখনই তোমার মুখ, অনেকদিন বাদে আমার মনে পড়ল, জল এসে গেল আমার দুচোখে।

পুনশ্চঃ এখন রাত প্রায় নটা। আমাদের রাতের খাওয়া শেষ হয়েছে। হ্যারিকেনের আবছা আলোয় কাগজে মুখ গুঁজে কবিতা লিখছে ধ্রুপদ। আমার শরীরে, মনে কী দারুণ উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ! পৃথিবীর সব ভালো কবিতা, গান, গল্প আমাকে শুনতে হবে, পড়তে হবে। ধ্রুপদের লেখা নতুন কবিতা শোনার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি॥

ক্লীবযুগ

অরিন্দমের ড্রইংরুমে রোববারের সন্ধ্যায় জমাট আড্ডা বসেছিল। ফি-রবিবারেই বন্ধুদের সঙ্গে অরিন্দমের আড্ডা হয়। নরমে গরমে রাগে রসে তুমুল আড্ডা! তবে অরিন্দমের বাড়িতে আড্ডা বসে কদাচিত। কেননা অরিন্দমের বসার ঘরটা সাজানো গোছানো হলেও বড় রাস্তা থেকে বাড়িটা বেশ কিছু দূরে। তার ওপর সে রাস্তায় ট্রাম চলে না, বাসের সংখ্যা কম সম্প্রতি অরিন্দমের প.ড়ায় আবার নানা অশান্তি শুরু হয়েছে। ঘন ঘন বোমা পড়ে, ছোরাছুরি চলে। সন্ধ্যের পর রাস্তায় মানুষজন বেরোতে ভয় পায়। আড্ডা দেওয়ার জন্যে অরিন্দমের বন্ধুরা তাই সুকুমারের বাড়িটা বেশি পছন্দ করে। সুকুমারের ঘরটা পুরনো, জানলাগুলো ছোটোখাটো, কিন্তু জায়গাটা ভালো। হাজরা রোডের গা ঘেঁষে সুকুমারের বাসা। যাতায়াতের জন্য অঢেল ট্রাম, বাস, মিনি। খোশগল্পে রাত বাড়লেও বাড়ি ফেরার দুশ্চিন্তা থাকে না। বাড়ি ফেরার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হয়ে আজকাল কেউ বাড়ি থেকে বেরোয় না।

এই রবিবার অরিন্দমের বাড়িতে বন্ধুদের আসার একটা বিশেষ কারণ আছে। অরিন্দমের স্ত্রী পিয়াসা সন্তানসম্ভবা, যে কোনও দিন সে মা হবে। তাই অরিন্দমের বন্ধুরা, সস্ত্রীক এই রবিবারটায় অরিন্দম এবং পিয়াসাকে সঙ্গ দিচ্ছে! একটু তাড়াতাড়ি, বিকেলের আলো থাকতেই তারা অরিন্দমের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। অরিন্দমের শাশুড়ী স্নেহলতা, গত একমাস মেয়ের বাড়িতে আছেন। জামাই এবং জামাইয়ের বন্ধুদের জন্য আজ তিনি ফিশফ্রাই আর পাউরুটির পুডিং বানিয়েছিলেন। সন্ধ্যা নামতেই কফির সঙ্গে মুখরোচক খাবার দেওয়া হলো! শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি থেকে আলোচনা তখন জ্যোতিষশাস্ত্রে এসে পৌঁচেছে। এ বিষয়ে অরিন্দমের ছেলেবেলার বন্ধু পূর্ণেন্দু অনেক খবর রাখে। বহু ভবিষ্যৎবক্তা জ্যোতিষীর সঙ্গ করেছে পূর্ণেন্দু। গ্রহমণ্ডলীর অবস্থান ও রাশিচক্র সে তৈরি করতে পারে। জ্যোতিষ থেকে এলো হাত দেখার প্রসঙ্গ। পূর্ণেন্দুর স্ত্রী ছাড়া ঘরের বাকী মহিলারা, এমনকি অরিন্দমের শাশুড়ী স্নেহলতা পর্যন্ত পূর্ণেন্দুর সামনে হাত বাড়িয়ে দিলেন। মন-রাখা দু'চারকথা পূর্ণেন্দু শোনাল সকলকে। জয়ন্তর স্ত্রী রুমি হঠাৎ প্রশ্ন করল, পিয়াসার ছেলে হবে, না মেয়ে?

এমন যুৎসই, সময়ানুগ প্রশ্নে ঘরের সকলে হৈচৈ করে উঠল। লজ্জায় পিয়াসার মুখ লাল, তবু জানার জন্যে দু'চোখ চকচকে, উৎসুক। পিয়াসার হাত দেখে মিনিটখানেক চোখ বুজে থেকে পূর্ণেন্দু বলল, ছেলে হবে।

এমা কী বাজে, আক্ষেপ করল পিয়াসা। পিয়াসার পছন্দ মেয়ে।

ওকথা বলিসনি, স্নেহলতা মেয়েকে বললেন, ছেলে কিছু খারাপ নয়।

স্নেহলতাকে অভয় দিয়ে রুমি বলল, আপনি ঘাবড়াবেন না মাসিমা, প্রথমটা মেয়ে হলে পরেরটা অথবা তারপরেরটা ছেলে হবে।

আবার একচোট হাসাহাসি শুরু হলো। আধুনিক ছেলেমেয়েদের লজ্জাহীনতা দেখে স্নেহলতা একসময় চুপচাপ ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু দু'চারদিনের মধ্যে যে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হতে যাচ্ছে, সে ছেলে না মেয়ে, এ প্রশ্নের সমাধান হলো না। ছেলে এবং মেয়ের সপক্ষে মতামত প্রায় দুটো সমান ভাগে ভাগ হয়ে গেলে ব্যাপারটার মধ্যে জুয়ার গন্ধ পেয়ে প্রণবেশ নাক গলাল। বলল, ছেলে এবং মেয়ের ওপর আমি একটাকায় পাঁচটাকা বাজি ধরছি।

দর যখন ক্রমশঃ চড়ছে তখন পূর্ণেন্দুর বৌ সান্ত্বনা বলল, রাত হচ্ছে, এবার ওঠা উচিত।

ঠিক কথা, সায় দিল রুমি, বেচারী পিয়াসাকেও খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ওর এখন বিশ্রাম দরকার।

বৌদের কথাতে কিন্তু স্বামীরা টলল না। তখনও আড্ডার উত্তেজনা, আগ্রহ তাদের কমেনি। আরও এক দফা হৈহৈ করে তবু তারা যে যার জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঠিক তখনই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল কল্পনাথ। কল্পনাথের মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে আধ ময়লা পাজামা পাঞ্জাবী, মুখে জটপাকানো দাড়িগোঁফ। কল্পনাথ ওদের সকলের পরিচিত, পুরনো বন্ধু হলেও এসময় অরিন্দমের ড্রইংরুমে কল্পনাথকে কেউ আশা করেনি। আশা করার কথাও নয়। বারাসতের পাগলাগারদে কল্পনাথের এখন থাকার কথা। সেখানে মাস দু'য়েক আগে উন্মাদ কল্পনাথকে ভর্তি করা হয়েছিল। কল্পনাথ যে কেন পাগল হয়ে গেলো, সে খবর তার বন্ধুরা জানে না। তবে লোকমুখে শুনেছে, যে কল্পনাথ সাধারণ, নিরীহ পাগল নয়, তার পাগলামি মারমুখী, হিংস্র, ভায়োলেণ্ট্ টাইপ্। সেই কল্পনাথ হঠাৎ এখানে এলো কোথা থেকে? পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে আসেনিতো?

অরিন্দমই প্রশ্ন করল, কেমন আছিস কল্প?

কল্পনাথ হাসল, উজ্জ্বল স্বাভাবিক হাসি। তার চোখ মুখ দেখে পাগলামির কোন লক্ষণ কেউ টের পেলো না। কাচের প্লেটে তখনও একটা ফিশফ্রাই

পড়ছিল। সেটা তুলে একটা কামড় দিয়ে সহজ গলায় কল্পনাথ প্রশ্ন করল, কি আলোচনা হচ্ছিল ?

বন্ধুদের মুখ চাওয়াচাওয়ির মধ্যে প্রণবেশ মুচকি হেসে বলল, অরিন্দমের স্ত্রী পিয়াসার ছেলে না মেয়ে হবে, এই নিয়ে আমরা বাজী ধরছিলাম। ইচ্ছে করলে তুই টাকা লাগাতে পারিস।

ফিশফ্রাই চিবোতে চিবোতে কল্পনাথ বলল, আমি ওসবে নেই।

কেন, প্রণবেশ জানতে চাইল।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কল্পনাথ বলল, পিয়াসার ছেলে বা মেয়ে কিছুই হবে না।

মানে, বিস্মিত অরিন্দম প্রশ্ন করল।

হিজড়ে হবে, সাবলীল গলায় কল্পনাথ বলল, এখন পৃথিবীতে ছেলে বা মেয়ে জন্মাচ্ছে না। নবজাত সব শিশুই ক্লীবলিঙ্গ, হিজড়ে।

কল্পনাথের কথায় ঘরের ভেতরকার চাপা হাসাহাসি, ধীরে ধীরে কথা নিমেষে থেমে গিয়ে সূচীভেদ্য স্তব্ধতা নামল। অরিন্দম, প্রণবেশ, পূর্ণেন্দু, সুকুমার কিছু একটা করা বা বলার জন্যে নিশপিশ করছে। ঠিক সেইসময় অন্ধকার কাঁপিয়ে সামনের রাস্তায় পরপর দুটো বোমা ফাটল। বাড়ির উত্তরদিকে দ্রুত ছুটে গেল কয়েকটা পায়ের শব্দ। অন্ধকারে আর্তগলায় কে যেন গোঙাচ্ছে। ঘরের মধ্যে মেয়েদের মুখ ছাইবর্ণ। কি করা উচিত, ঘরের দরজায় খিল লাগাবে কিনা, পুরুষেরা ভাবছে।

ভেজানো দরজা খুলে ঠিক তখনই রাস্তায় নামার জন্য কল্পনাথ পা বাড়ালে সুকুমার বলল, কল্প যাসনি, মারা পড়বি।

আমি তো মরেই আছি, কল্পনাথ বলল।

ঘন অন্ধকার থেকে কষ্টকর কাতরানির শব্দ একটানা ভেসে আসছে। কান খাড়া করে শব্দটা শুনে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে কল্পনাথ বলল, তোরা কেউ আয়। বাইরে একজন বড় কষ্ট পাচ্ছে।

কিন্তু কে যাবে ? সকলেরই চাকরিবাকরি, বৌ, ছেলেমেয়ে আর সংসার আছে। সকলেই মাইনে পায়, এবং পৌরুষের প্রমাণ হিসেবে স্ত্রীকে গর্ভবতী করে। কিন্তু তারা জানে না যে, আজকাল নপুংসক পুরুষেরাও স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার কবতে পারে, এবং তা দিয়ে তাদের পৌরুষ প্রমাণিত হয় না। উন্মুখ দৃষ্টি মেলে বন্ধুদের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে অন্ধকার রাস্তায় নেমে কল্পনাথ মিলিয়ে গেল।

আলোকিত ড্রইংরুমে একদল সুসজ্জিত নরনারী, শব্দহীন, পাথরের মূর্তি, কেউ কারো দিকে তাকাতে পারল না।

কামড়

অন্ধকার, সরু গলির শেষ মাথায় একটা অন্ধকার বাড়ী। ওই বাড়ীর দোতলার একটা ফ্ল্যাটে আমি থাকি। সকালে যখন বাড়ী থেকে অফিসে বেরোলুম, বাড়ীতে তখন আলো, পাখা ছিল না। অফিসে গিয়ে দেখলুম, সেখানেও তাই, আলো, পাখা নেই। অন্ধকার, গুমোট ঘরে রাশিরাশি শুকনো কাগজ আর ফাইলের মধ্যে বসে আট ঘণ্টা সমানে ঘেমেছি। গত রাত জেগে কাটানোয় মাথার মধ্যে ঝিমঝিম ঘুম, হাই উঠছিল ঘন ঘন, ফাইলে মন দিতে পারছিলুম না। আজকাল হপ্তায় তিনরাত ঘুমোই, চার রাত জাগা। এই চার রাত, রোজ দশটা থেকে দুটো পর্য্যন্ত লোডশেডিং থাকে। অন্ধকার বিছানার ওপর ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের পাখা করি। দু' ঘণ্টা আমি, দু' ঘণ্টা আমার স্ত্রী অর্পণা। তারপর একসময় বিদ্যুৎ আসে, পাখা ঘোরে। তখন অন্ধকার ফিকে হয়ে যায়, কাক ডাকে, রাস্তায় দু' একজন মানুষের গলা, কথার শব্দ ভেসে ওঠে, আমার ঘুম ছুটে যায়।

অফিসে বসে প্রায়ই ভাবি, এখন বাড়িতে লোডশেডিং হলে মন্দ হয় না। তাহলে রাতে পাখা ঘুরবে। আমি আরামে ঘুমোতে পারবো। দিনে যারা বাড়ীতে আছে, তাদের কথা অফিসে বসে ভাবি না। বুঝতে পারি, রোজই হিংসুটে, স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি। অনেক রাতে হাতপাখা চালাতে চালাতে তিরিক্ষি রাগে মনটা বিষিয়ে ওঠে। শিথিল মুঠো থেকে হাতপাখা মেয়ের বুকের ওপর খসে পড়লে সে চমকে জেগে ওঠে।

বাস থেকে নেমে, সরু গলির কাছে এসে বুঝলুম, বাড়ী ফিরেও রেহাই নেই। আবার অন্ধকার, গরম। অন্ধকার বাড়ীর দরজায় পা দিয়ে মনে হলো, দোতলায়, আমার ফ্ল্যাটে কিছু ঝামেলা হয়েছে। অন্ধকারে চড়া গলায় অর্পণা কাকে যেন ধমকাচ্ছে। ছোট মেয়ে রিঙ্কু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তাড়া-তাড়ি ওপরে উঠে এলুম।

অর্পণা বলল, একটু আগে শিয়াল কামড়ে দিয়েছে রিঙ্কুকে।

আমাদের পোষা স্প্যানিয়াল কুকুরের নাম হলো শিয়াল। পোষা বেড়ালটাকে আমরা ইঁদুর বলে ডাকি। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে ভালো-মানুষের মতো শিয়াল সামনে এসে দাঁড়াল। গরমে জিভ বার করে বেচারী হাঁপাচ্ছে।

হ্যারিকেনের আবছা আলোয় রিঙ্কুর পায়ের ব্যাণ্ডেজ আমার চোখে পড়ল। বারান্দায় চেয়ারে বসে বড়ো ছেলে অভি পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করছে। সামনে টেবিলের ওপর একটা জ্বলন্ত মোমবাতি। হাওয়া নেই, স্থির জ্বলছে। অর্পণাকে খুব বিষণ্ণ, চিন্তিত দেখাচ্ছে। অর্পণা বলল, আবার তেরোটা ইঞ্জেকশন নিতে হবে।

শিয়ালের দাঁতে বিষ নেই, পড়া থামিয়ে অভি জানাল।

আমি বললুম, বিষ থাকলেই বা ক্ষতি কি? রিঙ্কুর শরীরে একটু বিষ ঢুকলে ভালোই হবে। রাগতে আর কামড়াতে শিখবে।

কান্না ভুলে জলে ধোয়া দুচোখ তুলে রিঙ্কু বলল, আমি কামড়াতে পারি। এই দ্যাখো, আমার দাঁত.. ।

হাঁ করে ঝকঝকে সাদা, খুদে খুদে দু'পাটি দাঁত দেখিয়ে মেয়েটা আমাকে বলল, বাপী, তোমার দাঁত দেখাও।

এক পলক রিঙ্কুকে দেখে বললুম, আমার সব দাঁত গলে গেছে। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। এখন শুধু খেতে পারি, কামড়াতে পারি না।

আমি পারি, রিঙ্কু বলল, তারপর প্রশ্ন করল, কাকে কামড়াবো?

আমি বললুম, অন্ধকারকে..

তখনই আলো জ্বলে উঠল, পাখা ঘুরল।